

ସିନିନାତୁକ

ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟତା

କଳ୍ପନା ଏକାଧାରୀ । କଳ୍ପନାତା-୨



প্রথম প্রকাশ

আব্দ—১৩৪৯

প্রকাশক

স্বামীচরণ মুখোপাধ্যায়

কল্যাণ প্রকাশনী

১৮-এ, টেমার লেন

কলকাতা-৯

মুদ্রাকর

স্বামীচরণ মুখোপাধ্যায়

কল্যাণ প্রিন্টার্স

১৩৮ বিধান সরণী

কলকাতা-৪

প্রচ্ছদশিল্পী

খালেদ চৌধুরী

ডিং-ডং...ডিং ডং...

মিউজিক্যাল কল বেল। আওয়াজটি প্রতিমধুর। সেটা অবশ্য কোনও মানুষনা নয়। বেজার হবার পক্ষে কর্কশ-নিমাদী 'বাজার'-এর সঙ্গে কোনও কারাক নেই তার। উঠে বসল ডক্টর বহু। পাশের খাটেই শুয়ে আছে বন্দনা। চোখ পিটপিট করে বন্দনাকেই প্রশ্নটা পেশ করে : সাত সকালে কে এল জালাতে? দুধওয়ালা?

বন্দনা পাশ ফিরে শোয়। পাশ-বালিশটা আঁকড়ে ধরে। ঘুম-জড়ানো কণ্ঠে কোনমতে জবাব দেয়, দুধওয়ালা বোতল রেখে চলে যায়। দেখ গে, তোমার কোন পাওনাদার!

পাওনাদার? পাওনাদার কেন হতে যাবে? কগীও তো হতে পারে। স্লিপারটা পায়ে গলাতে গলাতে স্বগতোক্তি করে, রোকারেও যে মেজাজে ঘুমাতে তার জো নেই...

বন্দনা চোখ খোলে না। নিম্নলিখিত নেত্রে বলে, চটছ কেন? কগীপত্বরও তো পথ ভুলে আসতে পারে!

কুনাল জবাব দেয় না। বন্দনা ওর মনের কথাটাই বলেছে, কিন্তু 'পথ ভুলে' কথাটার খোঁচ দিতেও ছাড়েনি। ডক্টর কুনাল বহুর পসারটা জমেনি এখনও। বছরখানেক বিয়ে করেছে, চেয়ার খুলে বসেছে, কিন্তু আশানুরূপ পসার জমাতে পারে নি এই নতুন পাড়ায়।

ঘরের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত লম্বা প্লাষ্টিকের পর্দাটা টেনে দেয়—অর্থাৎ তার এক-কামরা ফ্ল্যাটকে দ্বিখণ্ডিত করে।

হ্যাঁ, এক কামরার ফ্ল্যাট। না একতলা, না দোতলা। মাঝামাঝি। মেজানাইন তবে ঘরটা বড়। সংলগ্ন বাধক্রমও আছে। নিচেটা গ্যারেজ নয়, ডাক্তারবাবুর ডিসপেনসারি। পর্দাটা টেনে দেওয়ার দরজার দিকে এক-চিলতে একটা ড্রয়িং-রুম পদদা হল। খান দুই সোফা, একটা সোফা-কাম-বেড আর সেন্টার টেবিল কোনার একটা পুতুলের আলমারি, তার উপর ট্রান্সিস্টার। পর্দার ওপাশে বন্দনা যে শুয়ে আছে, পর্দা টেনে দেওয়ায় সেটা আর নজর হয় না।

ডিং-ডং...ডিং-ডং!

নবাব খাজা গাঁ। সবুর মইছে না...স্বগতোক্তি করে আবার। দরজাটা খুলে দিতেই একগাল হাসির মুখোমুখি হল কুনাল বহু। বাঁ বগলে চাটা, ডান হাতে

একটা চুবড়ি, উর্ধ্বাঙ্গে হাফ-হাতা পেরুয়া পাঞ্জাবি, নিম্নাঙ্গে টিবিও-ফিবুলার মাঝামাঝি-তক্ খেটো ধুতি, একগাল খোঁচা-খোঁচা দাড়ি, কপালে আধুলির মাপে সিঁহরের টিপ এবং এক মুখ হাসি।

ক্র কুণ্ঠিত হল ডক্টর বোসের, ও আপনি ! কি ব্যাপার এত সকালে ?

—সকাল আর কোথায় বাবাজী ? বেলা সাতটা বাজে যে !

—তা বাজুক। কিন্তু আপনি কি মনে করে ? এ মাসের চেক পান নি ?

হাঁ হাঁ করে ওঠেন বৃদ্ধ, একো কথা বাবাজী ! মেঘলা হলে সূর্যিও কাজে কীকি দেয়। কিন্তু তোমার মাসান্তের চেক প্রথম হুণ্ডা পেরয় না...

—তা হলে ?—দ্বারপথ প্রায় রুদ্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকে কুনাল।

বৃদ্ধ বোধকরি একটু অপমানিত বোধ করেন। তাঁর কণ্ঠস্বরে ক্ষুদ্রতার আভাস, তোমার সঙ্গে আমার কি শুধু টাকারই সম্পর্ক ? তোমার বাবা আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। তত্ত্বতাল্লাশ নিতেও তো আসতে পারি ? না কি ?

কুনাল এবার দরজা থেকে সরে দাঁড়ায়। বলে, তাহলে বহন ঐ চেয়ারে। একটু মুখে-চোখে জল দিয়ে আসি—

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক আছে। আমি বসছি। তুমি মুখ হাত ধুয়ে এস। আমার ভাড়া নেই।

মসৃণ মোজাইক মেজেতে ক্যাথিস জুতোর কর্দম-আলিঙ্গন রচনা করতে করতে করালীচরণ গিয়ে বসলেন গদি-আঁটা সোফায়।

এ ঘরে ফিরে আসতেই বন্দনা ফিসফিস করে প্রশ্ন করে, কে গো ? পাওনাদার না রুগী ?

টুথব্রাশে পেস্টের প্রলেপ লাগিয়ে বাথরুমে ঢুকতে ঢুকতে কুনাল জবাব দেয়, ছুটোর একটাও নয়। কুটুম। তত্ত্বতাল্লাশ নিতে এসেছেন।

—কুটুম ! কে গো ?

—নামটা আর করব না। তোমার হিঙালিয়াম-হাঁড়িও হাঁ হয়ে যেতে পারে !

—বুঝেছি ! মন্সিচুস ! দিনটা আজ ভালয় ভালয় কাটলে হয়।

করালীকিঙ্কর সাহার ঐ রকম একটা বদনাম আছে বটে। সকালে তাঁর মুখদর্শন করলে সারাটা দিনে একটা-না-একটা অবটন ঘটবেই। করালীকিঙ্কর কুনালের পিতৃবন্ধু। বাবা স্বর্গে গেছেন, কিন্তু বন্ধুত্বের নাগপাশ এখনও জড়ানো—বন্ধুপুত্রের মজ্জায় মজ্জায়। রুগু, মানে কুনালের বোনের বিবাহের সময় রানাঘাটের পৈতৃক বাড়িটা বন্ধক দিয়ে কুনালের বাবা করালীর কাছে কিছু

কৰ্ম কৰেছিলেন। জীবদ্দশায় সে ঋণ শোধ হয়নি—কুনালের যেডিকেল কলেজে পড়ানোর খরচ যোগাতে ঋণভার বরং বেড়েই গেছে। পিতার মৃত্যুর পর ঐ কুশীদজীবীর সঙ্গে সে একটা রফা করেছে। স্বদে-আসলে মিশিয়ে মাসে সে চারশ' টাকা করে শোধ দিয়ে যাচ্ছে। অ্যানুইটির হিসাব মতো আরও এক বছর—না এক বছর নয়, তের মাস এই ঋণেব বোঝা ওকে টেনে যেতে হবে। তারপর মুক্তি। এবং তারপরেই পৈতৃক ভিটার দলিল ও দখল ফেরত পাবার আশা। কুনাল পাস করে রেপিয়েছে আজ মাত্র বছর দেড়েক। পসার এমন কিছু জমেনি। এ অঞ্চলে বেশ কয়েকজন পসারওয়ালা ডাক্তার আছেন। এটা ওর কর্মক্ষেত্র নয়, পর ভাষায় জাম্পিং বোর্ড! কুনালের বাবা ছিলেন বানাদাটের নামকরা ডাক্তার। সেখানেই ও পাকাপাকি গিয়ে বসবে। কিন্তু যতদিন না ঐ পৈতৃক ভিটার দখল পাচ্ছে ততদিন সে মোলাসেস্-এ স্যাও! ঋণ শোধ করাটাই এখন ওর মূল লক্ষ্য। ঐ ঋণ সম্বন্ধে একটা রহস্য ওকে নিরন্তর পীড়িত করে—অনেক গবেষণা করেও রহস্যটার কোন কিনারা হয়নি। বাবা মৃত্যুশয্যায় ওকে বলে গিয়েছিলেন—করালীর কাছে তাঁর সাত হাজার টাকার ঋণ আছে—হিসাবের খাতাও তাই বলে, কিন্তু শ্রদ্ধ-শাস্তি মিটে যাবার পর করালী যে বন্ধকী ভবনস্থলানা বার করলেন, তাতে স্পষ্টাক্ষরে লেখা ছিল ঋণের পরিমাণ বিশ হাজার টাকা! না, কোন কাটাকুটি নেই, কোন কারচুপির ইঙ্গিতমাত্র নেই—বাবার সইটাও সন্দেহাতীত। সাক্ষী হিসাবে যে দুজনের নাম আছে তার একজন স্বর্গতঃ অপরজন নগেন মজুমদার। তিনিও জানালেন, তার যতদূর স্মরণ হয় করালী নগদে বিশ হাজার টাকাই দিয়েছিলেন। অগত্যা মেনে নিতে হয়েছিল কুনালকে। সেই ঋণভাবে কুনাল কুজপৃষ্ঠ। তার জীবনের প্রভাতকালটাই পঙ্গু হয়ে পড়েছে। এক কামরার এই মেজানাইন ঘরে দিন গুজরান করে চলেছে কোনক্রমে। দিবারাত্র পরিশ্রম করে। সকাল আটটা থেকে দশটা পর্যন্ত নিচের ভিল্পেনসারিতে রুগী দেখে। দশটা থেকে চারটে পর্যন্ত কাজ করে 'ওরিয়েন্টাল ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটোরিতে।' কুনাল মূলতঃ প্যাথলজিস্ট। বীক্ষণ-গানের অমুবোক্ষণ-যন্ত্রে রোগনির্ণয়েই তার পারদর্শিতা। তবে প্র্যাক্টিসটাও বেখেছে। তাই বিকালে বাড়ি ফিরে আবার রুগী দেখতে বের হয়—সন্ধ্যা সাতটা থেকে নয়টা। একটা পুরানো মরিস মাইনব গাড়ি কিনেছে। নিজেই চালায় দিবারাত্র মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যা রোজগার করে তার একটা বরকোদরভাগ তাকে পাঠিয়ে দিতে হয় ঐ কুশীদজীবীকে। আরও তের মাস তাকে ঐ কুচ্ছসাধন করে যেতে হবে। তারপর সধ-আহ্লাদের কথা। তাও

কি হবে ? তারপরই এখানকার পাট চুকিয়ে নতুন করে বসতে হবে রান্নাঘাটে, ওর পৈতৃক ডিসপেনসারিতে। তারও একটা মোটা খরচ আছে। বন্দনা অনেকদিন ধরেই বলছে ইস্টলমেন্টে একটা ফ্রিজ কিনতে। রান্নাঘাটের বাড়িটা মেরামত কষারও দরকার। চুনবাঁলি খসে খসে পড়েছে জানলা দরজার অনেকগুলো পাল্লা অনেককাল না-পাল্লা। বুড়ো ভায় একটা পয়সাও খরচ করে না মেরামত বাবদ। কেন করবে ? গচ্ছিত ধন-বইতো নয় !

আধঘণ্টা পরে। ঠিকে কি এসে গেছে। বন্দনা মুখ-হাত ধুয়ে জনতা স্টোভে চায়ের জল বসিয়েছে। কতদিন ধরে বন্দনা বলছে একটা পোর্টেবল গ্যাসের ব্যবস্থা করতে। তা ওর কর্তা কানেই তোলে না। গ্যাসে কত সুবিধা কেরোসিন পাওয়া কি সোজা ? অথচ গ্যাসের সিলিণ্ডার এখন নাকি সহজেই পাওয়া যাচ্ছে। ফোন করে দেওয়ার দিন তিনেকের মধ্যেই—নমিতাদি বলছিল। অবশ্য কুনালকেও দোষ দেয় না বন্দনা—ঐ করালীবুড়োর করাল গ্রাস থেকে মাথা গোঁজার আশ্রয়টুকু সবার আগে উদ্ধার করা চাই। বন্দনা তার সব সখ-আহ্লাদ আপাতত শিকের তুলে রেখেছে। এখনও সংসাবে তৃতীয় প্রাণী আসেনি। সে এসে পড়ার আগেই...হে ঠাকুর। দেখ, যেন ঐ করাল করালী এসে তারও মুখের গ্রাস কেড়ে না নেয়।

গোপালের মা ?—বন্দনা ডাকে এ-ঘর থেকে।

যাই মা—ঠিকে কি সাড়া দেয়। ঘর মুছছিল সে। ন্যাতাটা বালতিতে ডুবিয়ে এগিয়ে এসে ফিস্‌ফিস্‌ করে বললে, ডাকলে ?

ফিস্‌ফিস্‌ কণ্ঠস্বর গোপালের মায়েরও বশ হয়ে গেছে। কুলে একখানি তো মাত্র ঘর, পর্দা দিয়ে ভাগাভাগি করা। এ-প্রান্তের আলাপচারি ও-প্রান্তে বসে সহজেই শোনা যায়। তাই কণ্ঠস্বর খাদে নামানো সকলেরই অভ্যাস হয়ে গেছে। বন্দনা বললে, হ্যাঁ। এই এক কাপ চা বাইরের ঘরে দিয়ে এস তো। একজন বুড়ো মতন...

গোপালের মা হাসি চাপে। বাইরের ঘর। যা এমন ভাব দেখায় যেন তিন-কামরার ফেলাট-বাড়ির ভাড়াটে। নল্‌চের আড়ালে যে বুড়ো মতন বাবু বসে আছেন তা যেন গোপালের মায়ের জানতে বাকি। সে শুধু বলে, উনি কে মা ? বাবুর কোন আত্মীয় ?

কুগী যে নয় তা গোপালের মা বুঝেছে। কুগীরা উপরে আসে না, এলেও তাদের চা খাওয়ানোর রেওয়াজ নেই। গৃহকর্ত্রীর আত্মীয় নয়—গোপালের মা জানে—গিন্নিমায়ের কোন আত্মীয় কামিনকালেও পথভুলে আসে না। শুনেছে

গিন্নিমায়ের বাপ-মা নেই, থাকার মত আছে এক দিদি, আর এক মামা। তাদের সঙ্গে গিন্নি মায়ের নাকি বনিবনাও নেই। তাছাড়া গিন্নিমায়ের আত্মীয় হলে পর্দার ওপারে অমন উবু হয়ে বসে থাকত না। সুতরাং ডাকারনাবুর আত্মীয় হওয়াই স্বাভাবিক।

বন্দনা ওর কৌতূহল চরিতার্থ করে না। প্রতিশ্রুতি করে, বাবু তা ক্রম থেকে বেরিয়েছেন?

এই এক শুকামি! আবার মনে মনে হাসে গোপালের মা। যেন কলঘর বাড়ির—হুই ও-শ্রান্তে! কলঘর থেকে মানুষটা বেরলে তুমি দেখতে পেতে না? মায়ের ভাবখানা যেন সাতমহলা বাড়ির কোথায় কি ঘটছে তার খবরাদি করতে গিন্নি-মা হিম্মিসিম পাচ্ছেন। গম্ভীরভাবে বললে, না তো।

কুনালের ধরনই ঐ রকম, ভাবে বন্দনা। শ্রীবিষ্ট বলে একবার বাধকমে চুকতে পারলে হল। অবশ্য দিনে ঐ একবার। দাঁত মাজা, দাড়ি কামানো, স্নান-সব কিছু একবারেই সেয়ে নেয়। খডাচুড়া একসার শ্রীঅঙ্গে ওঠালে সেই বাতের আগে খোলে না।

একটু পরে গোপালের মা পর্দা সরিয়ে এ ঘর ফিরে আসে। তার হাতে একটি চুবড়ি। তারে ডাকুল, বেগপাতা এবং সাতায়াসি চিনি সন্দেশ বললে, বুড়ো বাবু এইটা তোমারে দিতে বললেন। মায়ের খানে গেছিলেন পেমাদ। এই এক বখেদা জুটল কালোঘাটের প্রমাদ। না যাবে মুখে দেওয়া, না যাবে ফেলা। কেললে মায়ের অভিশাপ, মুখে দিলে ফুড-পয়জন। বন্দনা চুবড়িটা মাথায় ঠেকিয়ে বললে, তুমিই এটা নিয়ে যাও গোপালের মা। ছেলের পিলেকে দিও।

—আব বুড়োবাবু বললে, দু খানা বিস্কুট দিতে। বললে, সাতমকালে বাসি মুখে কালোবাড়ি গেছিল। বাসি পেটে চা খাবে না।

বন্দনা বিনা বাক্যব্যয়ে একটি প্লেটে খানচারেক বিস্কুট এবং দুটি সন্দেশ—ঐ প্রসাদীসন্দেশই, ধরিয়ে দিল গোপালের মায়ের হাতে।

আরও আধঘণ্টা পরে কুনাল এসে বসল বৃদ্ধের মুখোমুখি। বললে, এবার বলুন?

বৃদ্ধ একগাল হাসলেন। বলেন; এস বাবাজী, বস! তারপর? পসার কেমন জমছে? বোঁয়ার শরীর-গতিক ভালো তো?

কুনাল পুরো দশ সেকেন্ড অনিবেশ নেত্রে তাকিয়ে রইল বৃদ্ধের দিকে। তারপর পুনরাবৃত্তি করল, এবার বলুন?

টোক গিললেন করালী। গলকণ্ঠটা ওঠানামা করল বায় কতক। বললেন,

তা বটে, তুমি ব্যস্ত মানুষ, কুশল আলোচনার সময় কোথা? তোমার কাছে একটা ডাক্তারী পরামর্শই নিতে এসেছি বাবা।

—বলুন? তবে একটা কথা বলে রাখি। বাড়িতে আমি কন্সালটেশন ফি নিই চার টাকা।

বৃদ্ধ শুধু বাঙলা স্বরবর্ণ মালার আদ্যাক্ষরটা শুনিয়ে দিলেন।

তারপর যেন সামলে নিয়ে বলেন, তা তো বটেই। তা দেব। আমার যেমন তেজারতী কারবার তোমার তেমনি ডাক্তারী কারবার—

কুনাল একটা সিগ্রেট ধরালো। করালীর সামনে সে ইতিপূর্বে সিগারেট খায়নি, আজ ইচ্ছে করেই খেল। আজ করালী তার পিছুবন্ধু নন, ক্লায়েন্ট। কাঠিটা ছাইদানিতে রাখতে রাখতে বললে, আজ্ঞে না। আপনার তেজারতী কারবার ছাড়া আরও পাঁচটা রোজগারের ব্যবস্থা আছে—কাটচেরাইয়ের কল আছে জঙ্গল ইজারা নেওয়া আছে, কোণ্ঠীবিচার, শাস্তি-ব্যত্যয়ন আছে—আমার শুধু এই একটিই উপার্জনের রাস্তা।

বৃদ্ধ নিবিকারভাবে কোঁচার খুঁটটা খুললেন। একটু কাত হয়ে বসলেন। তারপর চারখানি একটাকার মলিন নোট বের করে সেন্টার-টেবিলে কাগজচাপার তলায় চাপা দিয়ে বললেন, এবার তাহলে কাজের কথায় আসি?

কুনাল নোট চারখানি পকেটস্থ করে বসলে, আস্থন।

—‘লিউকেমিয়া’ কাকে বলে বাবা?

ধণ্ড মুহূর্তের জন্ত কুনালের মনে হল সে বুঝি আজও ডিগ্রি পায়নি। তাই তা-বোর্ডের সামনে এগেছে মৌখিক পরীক্ষা দিতে। সামলে নিয়ে বলে, Leukemia, whether acute or chronic, is a type of blood-cancer when the leucocytes or white blood cells in the blood becomes abnormally high. There are two types, according to the kind of white blood cells affected, namely polymorphs or lymphocytes. In the former case...

কুনালকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে করালী কোঁচার খুঁটে মুখটা মুছে নিয়ে বললেন, সাদা বাঙলায় একটু বুঝিয়ে বলবে বাবাজী?

—বলব। যদি সাদা বাঙলায় প্রস্রাব পেশ করেন। হঠাৎ ঐ উৎকট রোগট সন্দেহ এমন অসুস্থকিৎস্থ হয়ে পড়লেন কেন? রুগী কে? তার ঐ রোগ হয়েছে? কী করে বুঝলেন?

করালীকিঙ্কর কিন্তু অত সহজে তাঁর হাতের তাল দেখাতে রাজী হলেন না।

ফি যখন দিয়েছেন, তখন ইচ্ছা মতো প্রদান করার হক তাঁর বর্তেছে, তাবখানা এই রকম। বলেন, ও রোগের কি চিকিৎসা নেই? শিবের অসাধ্য?

কুনাল আত্মসংবরণ করল। করণীকিৎসার যে কী জাতের মানুষ তা ভাল-মন্দই জানা আছে ওর। তিনি নানান বিচার্য পাত্রদর্শী। বহু রকম বিভূতি পেয়েছেন। খালি হাতে পদ্মগন্ধ আনতে পারেন। সাদা জলের গেলাস নামাবলী চাপা দিয়ে মুহূর্তে তা শরবতে রূপান্তরিত করতে পারেন। শোনা যায়, যাগ-যজ্ঞ করলে নাকি দশ টাকার নোট একশ টাকাতে রূপান্তরিত করাও সম্ভব। কুনালের অবস্থা সবই শোনা কথা, তবে প্রত্যক্ষদর্শীকে বলতে শুনেছে। সাত হাজার টাকার বঙ্কী-তাম্বুলকটা বিশ হাজার টাকায় রূপান্তরিত হওয়া যদি 'বিভূতি' না হয়! কুনালের বাবা ডামতারণ বহু একবার তাঁর বন্ধুর প্রসঙ্গে বলেছিলেন, কয়ালী যদি ভুলে একথা পেরেক খেয়ে ফেলে তাহলে ওর পেট চিরে পাওয়া যাবে জু! তাই কুনাল জবাবে বললে, লিউকেমিয়া অনেক জাতের হতে পারে। কোনটা সারানো যায়, কোন-কোনটা বিদেশে সারানো যায় বলে শুনেছি, ভারতবর্ষে যায় না। কোনটা সত্যই শিবের অসাধ্য।

—অম্বুখটা কেমন করে ধরা যায়?

—রক্ত পরীক্ষা করালে।

—না হলে নয়? নাড়ি টিপে, বুক দেখে, বাইরে থেকে বোঝা যায় না?

কুনাল অসম্মৈশ্বৰ্য্যে বললে, না!

—ধর আমি যদি একজন লিউকেমিয়ার রোগীকে নিয়ে আসি, তুমি তার রক্ত পরীক্ষা করে বলে দিতে পারবে তার কোন জাতের 'লিউকেমিয়া' হয়েছে? জানে ঐ শিবের অসাধ্য ব্যাঘো কি না?

—পারব। কিন্তু কেন বলুন তো? কার কী হয়েছে?

—একেবারে হাণ্ডেড-পাসেন্ট গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারব—লোকটা কদিন বাঁচবে?

কুনাল তার ক্লায়েন্টকে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বলল, মিস্টার সাহা! আপনার সঙ্গে এভাবে সারাদিন বকবক করবার সময় আমার নেই। আপনি এদার 'আনতে' পারেন। আপনার কনসাল্টেশান শেষ হয়েছে!

ধক করে জলে উঠল বুকের দুটি কোটরগত চোখ। মুহূর্তে সামলে নিলেন নিজেকে। তারপর পাঞ্জাবির পকেট থেকে প্যাকেট-বাঁধা একটা পুলিঙ্গা বার করে রাখলেন টেবিলে। ধীরে স্নেহে খুঁট খুলে তার গর্ত থেকে বার করলেন দুখানি কাগজ। বললেন, কুনাল, তুমি কাজের মানুষ। বডলোক। আমিও

কিন্তু গাঁয়ের গরীব চাষী নই। ইনকাম্‌ট্যাকসো দিয়ে থাকি। এই কাগজ দুটো চিনতে পার ? এখানা তোমার বাস্তবতাটার দলিল আর এখানা সেই বন্ধকী তমস্ক।

কুনাল শুরু বিষয়ে শুধু তাকিয়ে থাকে।

আমার প্রশ্নের ঠিক মতো জবাব দিলে, আমি যা চাইছি তাতে সাহায্য করলে আমি এই কাগজখানা তোমাকে ফেরত দেব, আর এই তমস্কখানা তোমার সামনেই পুড়িয়ে ফেলব। আমি সাত সকালে তোমার সঙ্গে রঙ্গ-রসিকতা করতে আসিনি বাবাজী !

কুনাল সামলে নিল নিজেেকে। বললে, এবার বলুন, রুগী কে ?

বুড় সে প্রশ্ন শুনেতে পেলেন কি না বোঝা গেল না। ফিরে গেলেন তাঁর পূর্ব প্রশ্নে, রক্ত পরীক্ষা করে তুমি বলতে পারবে—লোকটা কতদিন বাঁচবে ?

কুনাল ভিন্ন পথ ধরে। বোঝে এ বুড়কে প্যাথলজি নোঝানোর চেষ্টা পণ্ডশ্রম। শকুনিটা কিছু একটা মতলব নিয়ে এসেছে। বোধকরি কোনও অধর্ষ কতদিন বাঁচবে সেটা নিশ্চিত জানতে চায়। অথবা কোনও শাঁশালো যজ্ঞমানের

উইল-ঘটিত কোনও ব্যাপার। কোঁতুহলই জয়ী হল। শুধু কোঁতুহল নয়, ওর চোখের লামনে লোভনীয় দুখানা কাগজও পড়ে আছে। কুনাল সজ্ঞান মিথ্যা ভাষণ করল, রক্ত পরীক্ষা করলে বলতে পারব।

—ঠিক কত মাস বাঁচবে ?

—ঠিক কত সপ্তাহ বাঁচবে !

—কত 'ফি' দিও হবে ?

—চুয়ায় ঢাক।

—ঠিক আছে। তাই দেব। কালকেই তোমাকে নিয়ে যাব রুগীর কাছে। কখন আসব বল ?

—রুগীকে ল্যাবরেটোরিতে আনতে পারেন না ?

—কী দরকার ? জ্বরটা নেই, তবু দুর্বল আছে এখনও। আর জানাজানিটা যত কম হয় ততই ভাল।

—ঠিক আছে, কাল বিকাল চারটের সময় আসুন। বাড়িতে নয়, আমার ল্যাবরেটোরিতে। ঠিকানাটা লিখে দিচ্ছি—

—ঠিকানা দিতে হবে না বাবাজী। আমি চিনি। কিন্তু একটা সতর্ক আছে। এসব কথা তুমি কাউকে বলতে পারবে না। রুগীকে বা তার আত্মীয়স্বজনকে তো নয়ই, এমন কি বোমাকে পর্যন্ত নয়।

—বোমা ! বোমা কে ?

—রামতারণের পুত্রবধু ।

—ও ! কিন্তু মানে ..আপনার মতলবটা কি খুলে বলুন তো ?

বুদ্ধ উঠে দাঁড়িয়েছেন ততক্ষণে । বলেন, মতলব আবার কিসের ?

কুনাল গম্ভীর হয়ে বলে, বন্ধুন । দেখুন মিস্টার সাহা । আমি খোলা কথা বলছি । আপনি তিন জাতের স্ট্যাণ্ড নিতে পারেন । এক নম্বর, খোলা-মেলা ব্যাপার । আপনি আমাকে প্রফেশনালি এনগেজ করেছেন । আমি তাতে রাজী । সে-ক্ষেত্রে আগামীকাল আপনি আমাকে যে রুগীর কাছে নিয়ে যাবেন, যার জন্য আপনি আমাকে প্রফেশনালি ফি দিচ্ছেন তাকে আমি দেখব, কিন্তু আপনিই বলুন মিস্টার সাহা, সেক্ষেত্রে রুগীকে দেখে আমি যা বুঝলাম তা আমি তাঁর আত্মীয়স্বজনকে বলে আসতে পারি । পারি না ? আমার প্রপ্নসিস্টা আমার জীবন কাছ থেকেও গোপন রাখব কেন ? আপনি চুয়াত টাকা কি দিয়েছেন বলে ? বুদ্ধ নির্বাক, কিন্তু ধীরে ধীরে পুনরাবৃত্তি বসে পড়েন ।

—দ্বিতীয়ত, যে জন্য আপনি ঐ দলিল দুটি আমাকে দেখালেন এবং বললেন যে, আমি সহযোগিতা করলে আপনি আমার রক্ত শোধন থেকে বিবৃত হবেন—যার বিনিময়ে আমি আমার ধর্মপত্নীর কাছ থেকেই কথাটা গোপন রাখব—আপনি সে পথেও চলতে পারেন । পারেন না ?

বুদ্ধ এখনও নির্বাক ।

—তৃতীয়, আপনার হাত ধুয়ে কেলে অন্য কোনও ডাক্তারের ব্যবস্থা হতে পারেন । তাতেও আমার আপত্তি নেই । এবার বিবেচনা করে বলুন মিস্টার সাহা, আমাদের সম্পর্কটা কোন জাতের । অর্থাৎ কোন পথে আপনি চলতে চান ?

বুদ্ধ এর পরেও অনেকক্ষণ কথা বললেন না । তারপর মুখ তুলে বললেন, তার আগে আমাকে একটা কথা বলতে বাবাজী । তুমি কি এল. আই. মে-র লাইসেন্স ডাক্তার ?

কুনাল এই অসঙ্গত প্রশ্নের ধরকাঁটা ধরতে পারেন না । একটু অবাক হয়ে বলে, হ্যাঁ । কিন্তু কেন বলুন তে ? আপনি কি আজকাল ইন্সিওরেন্স-এর দালালীও করছেন নাকি ?

হঠাৎ আবার উঠে দাঁড়ালেন কুনাল । গুছিয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি জবাব দিয়ে গেলেন, আজ নয় বাবাজী । কাল বলব ।

বিহ্বাস্পৃষ্টের মত চমকে উঠল কুনাল । হঠাৎ একটা চিন্তা খেলে গেল তার মাথায় । ডেকে ওঠে, দাঁড়ান ।

বুকে ঘুরে দাঁড়ালেন ঘরের কাছে ।

কুনাল বললে, আপনার পরিকল্পনাটা আমি বুঝতে পেরেছি করালী কাকা !
কিন্তু না !... আমি ওর মধ্যে নেই ! এ অসম্ভব ! এ তো সর্বনেশে কথা !

বুদ্ধের চোখ দুটি ছোট ছোট হয়ে গেল । তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তিনি তাকিয়ে
রইলেন কয়েকটা মুহূর্ত । তারপর বললেন, আজ নয় । কাল সবটা বলব ।
তোমার কোনও রিস্ক থাকবে না । আর প্রাপ্তিটাও তো বড় কম নয় । প্রায়
সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা । মোটকথা, কালকের আগে একদম মুখ খুলবে না
কুনাল । আমার প্রস্তাবটা শুনে দেখ, বাজিয়ে দেখ । তোমার কোনও বিপদের
আশঙ্কা থাকলে তোমাকেই বা আমি জড়াব কেন বাবাজী ? তুমি তো আমার
বন্ধু রামতাতাঃগেরই ছেলে ।

॥ ২ ॥

—অফিসে যাবার আগে আমাকে গোটা কুড়ি টাকা দিয়ে যাস্তো বড় খুকি ।

অতসী জামাকাপড় নিয়ে বাথরুমে যাচ্ছিল । সাড়ে আটটা বেজে গেছে ।
নটা পর্যন্তিশের বাসটা ধরতে না পারলে অফিসে পৌঁছাতে দেরি হয়ে যাবে ।
সওদাগরি অফিস—হাজরিটার দিকে কড়া নজর । সকালের এই সময়টা অতসী
ডানে-ব্যায়ে তাকাবার অবকাশ পায় না । তবু তাকাতে হল । ওর বড় মামা
বলাই গাঙ্গুলী বারান্দার ও-প্রান্তে বসে বাঁ হাতে দাড়ি কামাচ্ছে । আগে দৈনিক
ক্ষৌরি করত, এখন হাওয়ায় ছুদিন । কামানোর সরঞ্জাম আর হাত-আয়না নিয়ে
সে বসেছে আসন পেতে । সেখান থেকেই কথাটা ছুঁড়ে দিয়েছে ।

অতসী দড়িতে টাঙানো গামছাটা পেড়ে নিয়ে বললে, টাকা । কি হবে ?

সেক্টি রেজাব,—নাহনে রক্তারক্তি কাণ্ডই ঘটে যেত একটা । চড়াং করে
ঘুরে বসেছে বলাই । চোখ পাকিয়ে বলে, কি হবে মানে ? টাকা দিয়ে লোকে
আবার কী করে ? খরচ করে ।

—তা তো জানি, কিন্তু কিসে খরচ হবে ?—চলতে চলতে প্রশ্ন করে অতসী ।

—তুই কি আমার কৈকিয়ৎ চাইছিস ? আমার হাত-খরচা বলে কিছু
থাকতে নেই ।

থেকে পড়ে অতসী । ঘুরে দাঁড়ায় বাথরুমের দোরগোড়ায়, বলে, কী আশ্চর্য !
চটছ কেন বড়মামা ? হাত-খরচা তো তোমাকে মাসের প্রথমেই দিয়েছি ।
মাসের এই শেষ শনিবারে হঠাৎ বেমকা কুড়িটা টাকা—

ওর মুখের কথাটা কেড়ে নিয়ে বলাই বললে, চটি কিনব। চটি জোড়া একেরে কাংলাকাই হয়ে গেছে। আর তাগ্নি দেওয়া চলছে না।

—ওঃ চটি। তা বেশ তো, পায়ের মাপটা দিও, অক্লিন থেকে ফেরার সময় কিনে আনব।

বলাই ছম করে উঠে দাঁড়ায়, কেন? তুই কিনবি কেন? আমার চটি আমি কিনব। চিরকাল কিনিনি? তুই বাজারের কী জানিস?

অতসী জবাব দেয় না। বাথরুমের দ্বার পথে দাঁড়িয়ে মিটি মিটি হাসে। মা যেমন হাসে, শুল-গালানোর ইচ্ছা নিয়ে ছেলে যখন বলে, মা, পেট কামড়াচ্ছে।

—কী? হাসাচ্ছিস যে? হাসির কি হল এতে!

অতসী জবাব দেয় না। শাড়ি-মায়া নিয়ে স্নানঘরে ঢুকে যায়।

মামা-ভাগীর ছোট্ট সংসার। দেড় কামরার। অতসী এহ মামার কাছে মানুষ। মামী মারা যাবার পর সেই এখন সংসারের কজী। শুধু তাই নয়, তারই উপার্জনে চলছে এই দুজনের ছোট্ট সংসার। আজ বছর পাঁচেক। বলাই বর্তমানে বেকার। তার ডান হাতখানা কনুই থেকে কাটা। ক্রান্ত-কলে এক দুর্ঘটনায় সে আজ পঙ্গু—অতসীর উপার্জনের ভাগিদার, কিন্তু সেজন্য বলাই সঙ্কোচ করে না কিছু। কারণ বাপ-মরা ঐ অতসীকে সেই মানুষ করেছে—শুধু অতসীকে নয়, তার ছোট বোন বন্দনাকেও। বন্দনার বিয়ে দিয়েছে—ভাল ঘরেই বিয়ে হয়েছে তার। নির্ঝগাট সংসার, বন্দনার বর পাসকরা ডাক্তার। প্যাথলজিস্ট। দীর্ঘা পসার জমাচ্ছে। অতসীটা অবশ্য বিয়ে করেনি। ভালই করেছে—না হলে আজ ঐ পঙ্গু মানুষটাকে কে দেখভাল করত? কারখানা থেকে বলাই অবশ্য মাসে বিশ টাকা করে পেনশন পায়। পেনশন নয়, খেমারতি। পেত না, পাচ্ছে শুধু ঠাকুর মশায়ের সহদয়তায়। নগেন মজুমদার একটি হারামজাদ ব্যক্তি! তোর কারখানার ক্রান্তকলে একটা মানুষ তার ডান হাতখানা খুইয়ে এল তবু দয়া হল না তোর? প্রমাণ ক্রান্তে চাইলি—বলাই গাঙ্গুলী নিজের দোষেই হাতটা খুইয়েছে। সে মন্ত অবস্থায় ছিল! হয়তো তাই প্রমাণিত হয়ে যেত, হয়তো একটি পদ্মাও আদায় হতো না। ইউনিয়ন অবশ্য মামলা ঠুকে দিয়েছিল—কিন্তু মালিকের সঙ্গে মামলা করে শ্রমিক আবার কবে জেতে? ভাগ্যে ঠাকুরমশাই মধ্যস্থ হয়ে ব্যাপারটার ফয়সালা করে দিলেন, তাই তো বলাই আজও মাস-মাস বিশ টাকা করে খেমারতি পায়। যতদিন বাঁচবে কোম্পানি তাকে এ টাকা যুগিয়ে যাবে। ঠাকুরমশাই অদ্ভুত করিৎকর্মী মানুষ। সিন্ধু পুরুষ! নানান জাতের বিভূতি পেয়েছেন! পূজা-আর্চা, সাধন-

ভজন নিয়ে আছেন—কিন্তু তনিয়ার মানুষের উপকার করে বেড়ান। কার মেয়ের পাত্র জুটছে না, কার ছেলের চাকরি জুটছে না, কোথায় কার অস্থখ করেছে—ঠাকুরমশাই হুমড়ি খেয়ে পড়েন। নগেন মজুমদারের স্ত্রী—সেই সুল-কায়া ভদ্রমহিলা—কি যেন নাম, বলাইয়ের মনে থাকে না—সে নাকি ঠাকুর-মশায়ের কাছে মন্ত্রদীক্ষা নিয়েছে। সেই হিসাবে উনি হলেন মজুমদার পরিবারের কুলগুরু। তাছাড়া ব্যবসায় সংক্রান্তও কী সী লটঘট আছে। ঠাকুরমশাই জন্মের ইজারা নেন, কাঠ চালান আসে নগেন মজুমদারের কাঠচেরাই করে। তা সে যাই হোক ঐ ঠাকুরমশায়ের কৃপাতেই বলাই মাসান্তে কুড়িটা টাকা খেসরাত পায়। ঠাকুরমশাই দেবতা।

অতসী আর বন্দনা। পিঠোপিঠি দুই বোন, ভাই নেই ওদের। না, ঠিক পিঠোপিঠি নয়, বন্দনা ওর চেয়ে চার বছরের ছোট। মাকে অতসীর মনে পড়ে না, তা বন্দনার কোথা থেকে পড়বে? বাবা মারা যাবার পর ওরা দু-বোন যখন মামাবাড়িতে আশ্রয় পেয়েছিল তখন অতসীর বয়স নয়, আর বন্দনার পাঁচ। দিদিমা বলত ‘উম্নি-বুম্নি’। বলত, ‘দু-বোনকে একসাথে এক বুড়ো বরের গলায় গাঁথে দেন।’ অতসীকে ভয় দেখাতো, বুড়ো-বরের সঙ্গে বোন-সতীনের ঘর করতে কী স্থখ বুঝবি অনে।’

অতসী বুঝতো না। বঝবার বয়স তখন ছিল না। মা নেই ওদের, ছোট-বোনকে সে প্রাণের চেয়েও ভালোবাসতো। বন্দনাকে ফ্রক পরানো, চুলের জট ছাড়ানো, সাজানো-গোছানো টিপ টিপ করে কিলানো আর তারপর বুকে টেনে নিয়ে সোহাগ করা। সে যেন এক নতুন ধরনের পুতুলখেলা। বন্দনা ওর জ্যাক্স পুতুল। অমৃদি, শান্তিমাসীমাদের সে দেখেছে বিয়ের পর ভাইবোনদের ছেড়ে স্বস্তরবাড়ি চলে যেতে। সে বড় দুঃখের। সে বড় বেদনার। ভাই দিদিমা যখন বলত—একটু বরের সঙ্গে দু-বোনের বিয়ে দিয়ে দেবে তখন নবমবর্ষীয়া অতসী মনে মনে খুশিই হত। ভাবত—এটাতো ভালই; দিদিমা যেমন একপাশে অতসী, একপাশে বন্দনাকে নিয়ে শুয়ে থাকে তেমনিভাবে ওদের সেই বুড়ো বর দু-বোনকে দু-পাশে নিয়ে শোবে। কিন্তু বুড়ো কেন? স্ত্রীপদার মত চটপটে, গল্প-বলতে-পারা, সন্ত-গোঁফ ওঠা একটা ছোকরা বর হলেই হয়।

বন্দনা এত্রে ওর গলা জড়িয়ে ধরে বলত, এ্যাই দিদি, বোন-সতীন কাকে বলে রে?

অতসী কিছু না বুকেই তারাকি চালে বলত, ও-সব পাকা-পাকা কথা তোকে ভাবতে হবে না। নে, ঘুমো।

আজ সেসব কথা মান পড়লে অতসীর হাসি পায়। কী ছেলেমানুষ ছিল ওরা। ছোটখুকি, মানে বন্দনা ওকে এক মুহূর্ত না-দেখে থাকতে পারত না। ভোষণ ন্যাওটা ছিল দিদির। সারা দিন পায়ে পায়ে ঘুরত। তারপর ক্রমে দিন-বদলের পালা এল। দিদিমা স্বর্গে গেল। ছোটমামা নিবদ্দেশ হয়ে গেল। বড়মামা বিয়ে করল। বড় মামা কিন্তু লোক ভালো। নিজের সম্ভান হয়নি, ওদের দু-বোনকেই নিজের সম্ভানের মতো মানুষ করতে থাকে। স্কুলে ভরতি করে দিয়েছিল ওদের। ছোটখুকির অবস্থা একেবারেই পড়াশুনায় মন ছিল না। বকে বুঝিয়ে, মেরে অতসী তাকে বাগে আনতে পারেন। একই মায়ের পেটের বোন, একই সঙ্গে বেড়ে উঠেছে, তবু অতসী তিল তিল করে অনুভব করে বন্দনা স্বতন্ত্র হয়ে যাচ্ছে। ক্রক ছেড়ে শাড়ি ধরার পর থেকেই বন্দনার মনের একটা দিগন্ত ওর কাছে রহস্যঘন হয়ে গেল। আর সে দাঁদির গলা জড়িয়ে ধরে প্রাণের কথা বলে না। বোনকে যেন আর চেনাই যায় না। সে কী ভাবে, কী করে একদিন টের পেল স্কুল পালিয়ে বন্দনা লুকিয়ে ম্যাটিন-শে। সিনেমা দেখেছে। নিশ্চয়ই একা নয়, কিন্তু প্রচণ্ড প্রহার সঙ্গেও সে স্বীকার করল না--কে ছিল তার সঙ্গে, ছেলে না মেয়ে। পাড়ার এবং স্কুলের বখাটে মেয়েদের সঙ্গে ওব ভাবটা বেশি। কে জানে, বখাটে ছেলেদের সঙ্গেও কিনা। অতসীর মনে হত বন্দনা ভিন্ন-জগতের বাসিন্দা হয়ে পড়ছে ক্রমশ।

অবস্থাটা ঘোরালো হয়ে উঠল পরপর দুটি দুর্ঘটনায়। হঠাৎ ক'দিনের জবে ভুগে বড়মামী চোখ বুজল। আর ছয়মাস যেতে-না-যেতে একদিন কারখানায় বড়মামার ডান হাতখানা কাটা পড়ল। চোখে অন্ধকার দেখল অতসী। সে তখন খার্ড ইয়ারে পড়ে। বন্দনা ক্লাস-এইটে ঘষটাচ্ছে। সংসারের সব দায়-দায়িত্ব এসে পড়ল অতসীর ঘাড়ে। রান্নার দায়িত্বটা নিতে হয়েছিল বড়মামী মারা যাবার পর; এবার ঠিকে ঝি-টিকেও ছাড়াতে হল। বাসন মাজা, ঘন-কাঁট দেওয়া, কাপড় কাচা—সবই চাপল অতসীর ঘাড়ে। বন্দনা যে একেবারে লাহায্য করত না তা নয়, বরং অতসীই ওকে ভারী কাজ করতে দিত না। এমনতেই বন্দনা ছিল কিছু আয়েসী—তার উপর অতসী বলত, ওসব ভারি কাজ করতে হবে না তোকে। তোর হাতে কড়া পড়ে যাবে।

কুনালও ঠাট্টা করে বলত, সেই ভালো। ভিভিশন-অব-লেবার। অতসী বাসন-মাজুক, বাটনা বাটুক আর বন্দনা মশারি টাঙাক, ধোবার হিসেবে রাখুক। যদিও তাহলে মশারিটা হবে উটের গিঠ আর ধোবার খাতায় যোগের ভুল।

বন্দনা চোখ পাকিয়ে বলত, ভাল হবে না কিন্তু কুনালদা। কিন্তু খাবার ভণ্ডে
পিঠ স্ফুস্ফুড় করছে বুঝি ?

কুনাল বলত, তোমার কিন্তু তো পুষ্পবৃষ্টি। ভয় অতসীর কিলকে। হুঁ হুঁ
কাবা। রীতিমতো বাসন-মাজা মসলা-পেঁষা হাত।

কুনাল ততদিনে ঘরের মানুষ হয়ে গেছে। সে তখন ফোর্থ ইয়ারে পড়ে,
নীলরতন সরকারে। বডমামাকে ঐ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।
সেখানেই আলাপ। বডমামা হাসপাতাল থেকে ফিরে আসার পরেও যোগসূত্রটা
ছিন্ন হয়নি। কুনাল তার আগেই বাঁধা পড়েছে বিনি স্ত্রীর বন্ধনে। সপ্তাহে
দু-তিন দিন মামার তত্ত্ব তালিশ নিয়ে আসত। বন্দনা উপস্থিত না থাকলে দুজনে
বারান্দার একান্তে রোগীর সহ- গোপন আলোচনা করত। সেই বকম একটা
সন্ধ্যায় আধো-আলোর আবছারায় অতসীর ঐ কড়াপড়া হাতটাকে টেনে নিয়ে—
না, না, না। সেসব কথা অতসী আর ভাববে না। সে অধ্যায় ভুলে যেতে
হবে। ছোটখুঁকি আজ সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে গেছে—এ সংসারের সঙ্গে
কোন যোগসূত্রই রাখেনি ; কুনাল ওর স্মৃতিপটে আজ একটা আবছা স্মৃতি।

কী যেন ভাবছিল অতসী ? হ্যাঁ, সেই সবহারানোর দিনগুলোর কথা। কিন্তু
কুখুই কি সব হারানো ? ঐ সব খোয়ানোর পথ বেয়েই তো এসেছিল তার
প্রথম বসন্ত। অনাদৃত কুমারীর জীবনে প্রথম প্রেম। নাঃ! আবার ও
কথা কেন ?

কারখানার দুর্ঘটনার পর মাস-তিনেক বডমামাকে হাসপাতালে থাকতে হল।
রোজ বিকালে অতসী গিয়ে দেখা করত। বন্দনা যেত না, হাসপাতালের গছটা
সহ হত না তার। অগত্যা সংসারের যাবতীয় দায়ের সঙ্গে এই দায়িত্বটাও নিতে
হয়েছিল অতসীকে। ভালই হয়েছিল। বডমামার সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে
প্রায় প্রতিদিনই দেখা হয়ে যেত ঐ ছেলেটার সঙ্গে : কুনাল বহু। নিতান্ত
বাল্যকালে প্রতীপদাকে ওর ভালো লাগত। এ ছেলেটার রঙ প্রতীপদার মত
কর্সা নয়, অত সুন্দর নয়—কিন্তু ওর হাসিতে মুক্তো ঝরে। অতসী সমস্ত দিনমান
উৎকর্ষ হয়ে থাকত কখন বিকাল হবে। ভিজিটিং আওয়ার্স আসবে। কোন
কোনদিন ভিজিটিং আওয়ার্স শেষ হলে কুনাল ওকে বাস স্ট্যাণ্ড পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে
যেত। বলত, কাল আসছ তো ?

—আসব। আপনি থাকবেন তো ?

—কি মনে হয় ?

বডমামা হাসপাতাল থেকে ফিরে আসার পর বোঝা গেল অবস্থাটা। অর্থ-

নৈতিক অবস্থাটা। রোজগার বন্ধ, অথচ সংসারের আর পাঁচটা দাবী হাঁ করে আছে। তার চেয়েও বড় সমস্যা হল—হাসপাতাল থেকে ফিরে আমার পর বলাই গান্ধী কেমন যেন বদলে যেতে শুরু করল। একে তো জী-বিয়োগে লোকটা দিশেহারা পাগল-পাগল হয়েছিল, ডান হাতখানা খোয়ানোর পর যেন সে অস্ত্র মানুষ। মদ ধরল বেকার মানুষটা। আর ধরল রেস্-এর নেশা। মদ সে আগেও খেত—কখনও সখনও—মামীর সঙ্গে ঝগড়া হলে; অতসী টের পেত। এখন কিন্তু মদই মামাকে খেতে শুরু করল। রেসও খেলত আগে, তাও কালেভদ্রে, মেজাজ খুশ থাকলে। এখন সে উদ্দাম হয়ে উঠল। অতসী দেখেও চোখ বুজে ছিল—কে জানে, সেটাই তার ভুল হয়েছিল কিনা। তবু জীবন-সংগ্রামে পরাজিত ঐ সৈনিকটার প্রতি তার অনুকম্পাই হয়েছিল বেশি—আহা! ও-ভাবেই যদি মানুষটা ভুলে থাকতে পারে তো থাকুক না। বন্দনা অনেক বেশি সাবধানী, অনেক বেশি সংসারান্তিক—বারণ করত দিদিকে। বলত, বডমামাকে হাতে কাঁচা টাকা দিসনি দিদি। ও আমাদের কতুর করে ছাড়বে।

অতসী বুঝত, কিন্তু কথো দাঁড়াতে পারেনি। এটা বোহর ওর চরিত্রের একটা দুর্বলতা। অশ্রুয়ের প্রতিবাদে ও সোচ্চার হতে পারে না। চেষ্টা করে মানিয়ে নিতে। না পারলে, সব দুঃখকষ্ট নিজের মাথায় তুলে নেয়। তাছাড়া অতসী তো জানে—বডমামা চিরকাল এমন ছিল না। দুই ভাগ্নিকে সে নিজের মেয়ের মতই ভালবাসতো। তাদের লেখাপড়া শিখিয়েছে, মানুষ করেছে; বলত—আমার যা থাকবে তা তো ওদের দু বোনব জন্মই। আর টাকা? টাকা কার? এল কোথা থেকে? যদি ওড়ায় তবে বডমামা নিজের টাকাই ওডাচ্ছে। অতসী কি তার মালিক? ছোটখুকি বলত, তোর আদিখ্যেতা দেখলে গা জালা করে দিদি।

কুনালও বলত, বন্দনা তো ঠিকই বলছে অতসী। তুমি ওকে প্রশ্ন দাও কেন?

ছোটখুকি তার সমর্থক পেয়ে বলত, বলুন তো কুনালদা, এ দিদির আদিখ্যেতা নয়?

অতসী কোন প্রতিবাদ করত না। মনে মনে হাসত। সে তো জানে—ঐ পঙ্গু মানুষটা একদিনেই কিছু পাষণ্ড হয়ে ওঠেনি। তার পরিবর্তনটা এসেছে তিলে তিলে। একের পর একটা আঘাতে। প্রথমেই দিদিমার মৃত্যু। তা বুঝি মা আর চিরদিন কার সংসারে বেঁচে থাকে? কিন্তু ছোট ভাইটা? রাজনীতি

করত। একদিন বাঁরা যেন ডেকে নিয়ে গেল সন্ধ্যার ঝোঁকে। গেঞ্জি গায়ে, পায়জামা পরনে ছোটমামা দোর তুলে বেড়িয়ে গেল। যাবার সময় বলে গেল, অতু, আমার ভাতটা ঢেকে রাখিস, ফিরতে আমার রাত হবে। বাস! আর কোনদিনই ফিরে এল ন মনুষ্যটা। তারপর বড়মামীর মৃত্যু এবং তারপর নিজের হাতখানা গেল কাটা। তিল তিল করে একটা অতলম্পর্শী কালো গহবরের তলায় তলিয়ে যাচ্ছে বড়মামা—সব কিছু যদি সে তুলে থাকতে চায় মনের বিস্তৃতিতে, কিংবা রেস-এর মাদকতায় তাহলে অতসী আপত্তি করে কোন আকলে? অতসী তো জানে, এত এত আঘাতেও বড়মামা ম্রুদ্বিটা একেবারে জলাঞ্জলি দেয়নি। তাই না একদিন হঠাৎ বড়মামীর গহনার বাক্সটা অতসীর হাতে তুলে দিয়ে বড়মামা বলতে পেরেছিল, এগুলো যত্ন করে তুলে রাখ বড়খুকি, আর আলমারির চাবিটাও রাখ। আমার হাত খরচার টাকা যখন যা লাগবে তোর কাছে চেয়ে নেব।

অতসী প্রথমটায় রাজী হয়নি সে দায়িত্ব নিতে। বলেছিল, কেন বড়মামা? তোমার কাছেই থাক না?

—না রে। না। তোদের ছ-বোনের বিয়ের ব্যবস্থাও তো করতে হবে। আমার জিন্মায় থাকলে তোর বড়মামীর অত সাধের গহনাগুলো ঘোড়ার খুরে খুরে ধুলো হয়ে উড়ে যাবে।

অতসী তারপর নিছিন্দ্রায় গ্রহণ করেছিল সে দায়িত্ব। বড়মামীর বিয়ের গহনা। আলমারির চাবি বেঁধেছিল আঁচলে। গহনাগুলো অবশ্য শেষ পর্যন্ত বাঁচাতে পেরেনি। ঘোড়ার খুরে না হলেও সংসারের রথচক্রে বড়মামীর অত সাধের গহনাগুলো তিল তিল করে গুঁড়িয়ে ধুলো হয়ে গেছে। না, ছ বোনের বিয়ের প্রয়োজনে সেগুলো লাগেনি। অতসী এই আঠাল বছর বয়সেও অনুচা, বন্ধনার বিয়েতে এবটা পয়সাও খরচ করতে হয়নি; কিন্তু বিনা উপার্জনে সংসারটা তো আরও তিন বছর চলেছে। বড়মামার অ্যাক্সিডেন্টের সময় অতসী খার্ড-ইয়ারে পড়ে। আরও একটি বছর কলেজের মাইনে টানতে হয়েছে। বেকারীও দীর্ঘ বছর থাকে। তাই বড়মামীর সেই সৌখিন গহনার বাক্সটা আজ শূন্য। না, ভুল হল! একেবারে শূন্যগর্ভ নয়। তাই এই অথাস্থে আছে একটি নিঃশেষিত বিলাতি সেন্টের শিশি। এর জ'বনে প্রথম এগরোপহার—পচিশ বছরের জন্মদিনে। আর আছে রঙিন ঘিটে দিয়ে বাঁধা এববাতিল চিঠি। উত্তীর্ণ যৌবনা অনুচার জীবনেও যে একদিন বসন্ত এসেছিল এগুলি তার নীরব সাক্ষী। বন্ধনার বিয়ের পর বড়বার মনে মনে সংকল্প করেছে—একদিন

সব পুড়িয়ে ফেলবে। প্রাণে ধরে পারেনি। আজও মাঝে মাঝে ছুটির দিনে
কক্ষঘর অবকাশে সে খুলে বসে সেই চিঠির বাণ্ডিল।

যারা বলে, কোন মানুষ ভালো, কোন মানুষ কালো, তারা ভুল বলে। তারা
ছবি আঁকার কায়দাটাই ধরতে পারেনি। সব পোট্রেটই সাদা-কালোর সংমিশ্রণে ;
শুধু সাদা-কালোই বা হবে কেন? সাতটা রঙ মিলে-মিশেই আনে শুভ্রতা, সব
রঙ হারালেই চিত্রপট মসিবার্ণ। কিন্তু এর মাঝে মাঝেও আছে নানান রঙের
'শেড'—সে রঙ একা চিত্রকরই চাপায় না—চড়ায় যারা তার কাছের মানুষ।
কখনও তা কামনার রঙে রাঙা, কখনও তাকণ্যের রঙে সবুজ, কখনও প্রেমের
রঙে ময়ূরকণ্ঠি, কখনও বন্ধনার রঙে ধূসর! নিরুপায় চিত্রকর জীবন দর্পণে
দেখতে পায়—তার ছবির রঙ আপনি আপনিই বদলে যাচ্ছে : ভোরিয়ান থ্রে-র
ছবির মতো। তেমনি করেই বদলে গেছে অতসী।

শুধু অতসী? না, ওব বড়মামাও। এখন সে হাড়-পাঁজরা সর্বস্ব বৃদ্ধ।
দেখলে মনে হয় পঁয়ষট্টি-সত্তর। আসলে ওর বয়স মাত্র পঞ্চাশ। চুলগুলো বিল-
কুল সাদা। গেক্সি খুলে ফেললে পাঁজরার সব ক-খানা হাড় গোনা যায়। শুধু
পরিবর্তনটা ওর দেহের চেয়ে মনেই হয়েছে বেশি করে। অতসীর মনে হয়
ওর বড়মামার মনটা দুটো আলাদা টুকরো হয়ে গেছে। একটা 'মামুষের' মধ্যে
দুটো মন। দুটো ব্যক্তিসত্তা। একটা মন আজও অতসীকে ভালোবাসে। সে
ভালোবাসা কণ্ঠার প্রতি পিড়িয়েছে শুধু নয়, মায়ের প্রতি সন্তানের নির্ভরতা।
অতসী শুধু ওর কণ্ঠাই নয়, শৈশবের মা-ও। মনে পড়ে বন্ধনার স্মরণ।
বন্দনা চিরদিনের মত সম্পর্ক ঘুচিয়ে যখন কুণালের হাত ধরে চলে গেল কখন
অতসী উবুড হয়ে পড়েছিল তার বিছানার উপর তার বড়মামা তখন বাঁ
হাতখানা ওর পিঠে বুলিয়ে বলেছিল, কঁাদ অতু, কঁাদ! কেঁদে মনটা হালুদা
করে নে। ছনিয়া জানল না, হয়তো ছোটখুকিও জানে না—কিন্তু আশা
জানি, তুই বুকের একখানা পাঁজরা খুলে আজ তোর বোনের আঁচলে বেঁধে দিও।
আবার সেই বড়মামার অস্তরেই আছে তার দ্বিতীয় সত্তা। আঘাত পেয়ে পেয়ে
সে নির্মম, কঠোর, স্বার্থপর! অতসীকে হারাবার ভয়ে সে এমন সব কাণ্ড-
কারখানা করে যা চিন্তাই করা যায় না। জীবন-সংগ্রামে পরাজিত মানুষটা
এখন শুধুমাত্র অতসীর উপরেই নির্ভর করতে শিখেছে। বন্দনার উপর যে
ভরসা করতে নেই, সে যে তারসহ নয়, এ কথা ঐ মদো-মাতাল রেস্‌ডেটা কেমন
করে জানি বুঝে নিয়েছিল। তাই অতসীকে হারাবার ভয়ে মানুষটা সর্বদা কঁটা
হয়ে থাকে। হয়তো তাই বড়মামা চায় না অতসীর জীবনে বসন্ত সার্থক হয়ে

উঠুক, অতসী স্বামী-সন্তান-সংসার নিয়ে সুখী হোক ! অতসী কিছু আহা-মরি
সুন্দরী নয়—রঙ তার কালো, বন্দনা তার চেয়ে অনেক বেশী রূপণী। বন্দনার
আকর্ষণী ক্ষমতা তাই অনেক বেশি। তবু অতসী কিছু কুদর্শনাও নয়। আর
স্বরূপ-কুরূপ একটা কথার কথা। ওর কোন মানদণ্ড নেই। থাকুক, না থাকুক
এ কথা তো অস্বীকার করা চলবে না যে, তা সত্ত্বেও তার জীবনে এসে দাঁড়িয়ে
ছিল কল্ললোকের রাজপুত্র—

অতসী যখন বাথরুম থেকে বার হয়ে এল ততক্ষণে বলাইয়ের দাড়ি কামানো
শেষ হয়েছে। একটা হাতেই সে সব কাজ সারে—গুছিয়ে তুলে ফেলেছে দাড়ি
কামানোর সাজ-সরঞ্জাম। অতসী ঘরে এসে শাড়িটা ভালো করে পরে ; ভিজা-
কাপড় গামছা মেলে দেয়। রান্নাঘরে এসে ঢোকে। এক চিলতে রান্নাঘর। হু-
জন পাশাপাশি বসে খাওয়ার ঠাঁই নেই। অবশ্য বলাই এই সাত-সকালে ভাত
খাবে কেন ? তার শো অফিস-কাছারির বলাই নেই। ফলে অতসী একাই
ভাত বেড়ে খেতে বসল। বলাই মোড়াটা টেনে এনে রান্নাঘরের সামনে বারান্দায়
বসল। বলে, পুরো কুড়িটা টাকা অবশ্য লাগবে না—কি বলিস ? আমি তো
আর বাটার দোকানে ঢুকছি না।

অতসী ভাতের গ্রাসটা গলাধঃকরণ করে বললে, তুমি কোন দোকানেই ঢুকছ
না। না বাটা, না ফ্লেক্স, না ফুটপাথের দোকান। একটা কাগজে পায়ের মাপটা
আমাকে এনে দাও। আমি ফেরার পথে কিনে আনব।

ছিলে-খোলা ধনুকের মত লাক্ষিয়ে ওঠে বলাই ; বলে, তুই কী পেয়েছিল
আমাকে, এঁয়া ? ছেলেমানুষ ? না ! মাপ আমি দেব না। তুই কিনে আনলে
সে চটি পায়ের দেব না আমি।

অতসী নির্বিকারভাবে ভাত ভাঙে।

—কী ? চূপ করে আছিস যে ?

তবু কথা বলে না অতসী। যেন ব্রহ্মচারীর আহার। গণ্ডুষ করে খেতে বসেছে।
বলাই এক নাগাড়ে তড়পাতে থাকে—অতসীর নাকি বড় বাড় বেড়েছে ! এসব
আর সে লক্ষ্য করবে না। যেদিকে ছুচোখ যায় একদিন বেরিয়ে যাবে। তারির
হাতভোলার বেঁচে থাকার চেয়ে সন্ন্যাসী হয়ে যাওয়া ভালো, ভিক্ষা করা চেয়ে
ভালো।

নির্বিকার অতসী এঁটো কেল হাত ধুয়ে দড়িতে টাঙানো গামছার হাত
মোছে। চূপচাপ ঢুকে যায় মামীর ঘরে, এখন ওটাই অতসীর ঘর। মামীর

বিয়ের ড্রেসিং টেবিলটার সামনে বসে চুলটা ঠিক করে। পাউডারের কোঁটা খুলে দেখে সামান্য তলানী পড়ে আছে। পরের মাসের মাইনে পেলেই কিনতে হবে একটা। টুথপেস্টটাও ফুরিয়েছে। নেই, নেই—যেন এ সংসারের একটা বাঁধা গৎ। দিদিমা বলত, ‘নেই বলতে নেই রে, বলতে হয় বাড়ন্ত।’ তা সে যাই বল, ব্যাপারটা একই। পাউডারের পাক্‌টা আলতো করে মুখে বুলিয়ে নিল। কপালে একটা কুমকুমের সবুজ টিপ পরল; ব্লাউস আর শাড়ির পাড়ের সঙ্গে মশ্চ করে। পাউডারের অভাবটা আজ বেশি করে বোধ করছে। আজ শনিবার। সকাল-সকাল ছুটি এবং ছুটির পর সে আজ বাগুই আঁটি যাবে। রঞ্জনদের বাড়ি। সে লেট, মঙ্গলবার থেকে নাগাড কামাই করছে। পর পর দুটো রিহার্সালে আবেসেন্ট! আবার জরজরি বাধিয়ে বসেছে নিশ্চয়। এত জর হয় কেন ওর—এই বয়সে? কত বয়স হবে রঞ্জনের? অতসীর চেয়ে বছর দুয়েকের ছোট হবেই—তার মানে পঁচিশ ছাব্বিশ। পুরুষমানুষের পক্ষে তারুণ্যের মধ্যগগন; অথচ ছেলেটা অতীশকে বুকে জড়িয়ে ধরে কেমন।

—কী? টাকাটা দিবি, না দিবি না—সোজা কথা বলে দে।

ঘাড় ঘোরাতে হয় না! আশ্রনার মধ্যে দিয়েই দেখতে পায় বড়মামা এসে দাঁড়িয়েছে দ্বারপ্রান্তে। অতসী এবার উঠে যায়। তাকের উপর থেকে একখণ্ড কাগজ আর পেন্সিলটা নিয়ে আসে। মামার চরণপ্রান্তে রেখে দিয়ে বলে, মাপটা দাও।

বলাই ছোঁ-মেয়ে তুলে নেয় কাগজখানা। কুচি কুচি করে ছিঁড়ে ছড়িয়ে দেয় সারা ঘরময়। অতসী নির্বিকারভাবে তার ব্যাগে ভরে নিতে থাকে ক্রমাল, খুচরো পয়সা, ফাউন্টেন পেন।

—থাক। চাই না আমার চটি। দু-বেলা দু-মুঠো খেতে দিচ্ছিস এই আমার ভাগ্য। আমি তোমার সংসারে চাকর বই তো নই! চাকরের আবার জুতো পরার সখ কেন?

অতসী হাত ঘড়িটা একবার দেখে নেয়—না, দেয়ি হয়নি তার। মিষ্টি হেসে বললে, কেন সকাল থেকে খামোকা চেঁচামেচি করছ বড়মামা?

—খামোকা! তুই একে খামোকা বলছিস? এক জোড়া চটি কিনবার জন্য মান্তর কুড়িটা টাকা চেয়েছি—

—হ্যাঁ, কিন্তু আজ যে শনিবার, বড়মামা। শনিবারে যে চটি কিনতে নেই।

বলাই হঠাৎ হতচকিত হয়ে পড়ে। আমতা আমতা করে বলে, শনিবার গাই কী?

—শনিবার হচ্ছে রবিবারের আগের দিন, সেটা তুমিও জান, আমিও জানি। শোন, জালের আলমারিতে কুটি-তরকারি করা রইল। ও-বেলার। সন্ধ্যা রাতেই খেয়ে নিও, নাহলে তরকারিটা টকে যাবে। আর মনে করে জালের আলমারিটা বন্ধ করো বাপু, না-হলে কাল বিনা ছুধে চা খেতে হবে—

বলাইয়ের হতচকিত ভাবটা কেটে যায়। বলে, মানে? তুই রাতে খাবি না?
—না। আমার কিরতে দেরি হবে।

—দেরি হবে। কেন? আজ তো শনিবার, তোর তো সকাল সকাল ছুটি।

—ছুটির পর আমি অন্য এক জায়গায় যাব। নাও, সরো—

বলাই দোর ছেড়ে সরে দাঁড়ায় না। বলে, বুঝেছি! বাগুইআটি যাবি।

অতসী একবার আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখল। না, আকাশ নির্মেষ, ছাতা নেবার দরকার নেই। হাতঘড়িটা দেখে নিয়ে বলল, সরো বড়মামা আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে।

হঠাৎ মনোবল ফিরে পায় বলাই। তার অভিভাবক মামা চাড়া দিখে ওঠে। দৃষ্টিতে বলে, হোক দেরি! আমার কথার জবাব দে আগে। বলাই গাঙ্গুলী এখনও মরেন! বুঝলি? বন আবার এ শনিবারে বাগুইআটি যাচ্ছিস?

রীতিমতে পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে মামুষটা। অতসী করুণ স্বরে বললে, বললাম তো নেথানেই যাচ্ছি—ছেলেটা আজ পাঁচদিন কামাই করছে, নিশ্চয়ই জরজারি হয়েছে। কিন্তু এ কী শুরু করলে তুমি, পথ দাও?

—পথ দেব? তুই অধঃপতনের পথে নেমে যাচ্ছিস আর আমি বাধা দেব না?
রীতিমতে একখানা নাটকই আরম্ভ করে দিল বলাই: লজ্জা করে না তোর? এটা ঠাট্টা বয়সী ছেলেকে নিয়ে বেলেলাপনা করতে সরম হয় না এই বয়সে? তুই না ভেবোচ্ছিস? ঐ পুঁচকে ছোঁড়া তার মায়ের বয়সী ধুমসিকে বিয়ে করবে?

হঠাৎ চুপসে যায় অতসী। কীভাবে এই বিশ্রী অশ্লীল কথাটার প্রতিবাদ করবে বুঝে উঠতে পারে না। রঞ্জন ওর ছেলের বয়সী না হলেও, ছোট ভাইয়ের বয়সী—নাও সে-টাতে তো অতসী কোনদিন দেখেনি ছেলেটাকে। স্মৃতিবাজ প্রাণবন্ত এটি তরুণ, যার দেহ দুর্বল, আর মন সজীব—যাকে ছোট ভাইয়ের মতই ভালবেসে ফেলেছে অতসী। অথচ তার নাম জড়িয়ে—

—ছি ছি ছি আয়নায় নিজের বদনখানা দেখতে পাস না তুই? ঐটুকু পুঁচকে ছোঁড়ার পিছনে লেগেছি। মনেও ভাবিস না সে-কথা। কুনাল একদিন যেমন তোর নাকে কামা ঘষে দিয়ে কেটে পড়েছিল—

—বড়মামা! অশ্রুট একটা আর্তনাদ করে অতসী ততক্ষণে বসে পড়েছে ড্রেসিং টুলে। বলাই গাঙ্গুলীর লক্ষ্য হয় না। অতসীর সবচেয়ে বেদনার স্থানটা মাড়িয়ে দিয়েও যেন তার তৃপ্তি নেই। এক নাগাড়ে বলে চলে, তবু যদি ও ছোড়ার হুঁশ না হয় তবে তাকে দেখিয়ে দেব তোর কুষ্টিখানা। বুঝলি? শালা পালাবার পথ পাবে না! দেখব, কেমন করে তুই বিয়ের কনে সাজিস। হুঁ হুঁ বাবা। বিষকণ্ঠাকে বিয়ে করা অত সহজ নয়!

অতসী এতক্ষণ মাথা নিচু করে বসেছিল। ঐ ‘বিষকণ্ঠা’ কথাটায় মুখ তুলে তাকায়। বড়মামার সঙ্গে তার চোখাচোখি হয়ে গেল। আর তৎক্ষণাৎ আলপিন্ আহত বেলুনের মত চুপসে গেল বলাই গাঙ্গুলী। হঠাৎ খেয়াল হয়—সে মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। ও কথাটা উচ্চারণ করার নয়। ওটা নিতান্ত গোপন কথা। ছুরক উদ্বেজনায়ে সে মুখ ফসকে বলে ফেলেছে কথাটা। ধীরে ধীরে দরজা থেকে সে সরে দাঁড়ায়।

অতসী উঠে দাঁড়ায়। স্নান হাঙ্গে এতক্ষণে। হাতবট্টয়া খুলে দু-খানা দশ-টাকার নোট বার করে। একটু আগে যেভাবে কাগজ-পেন্সিলটা নামিয়ে রেখেছিল বড়মামার চরণপ্রান্তে সেই ভঙ্গিতেই নোট দুটো নামিয়ে রাখল ওর পদমূলে।

এবার অবাক হওয়ার পালা বলাইয়ের। অশ্রুট স্বরে বললে, ওটা কি হল?

এতক্ষণে বড়মামার চোখে চোখে তাকালো অতসী। হেসে বললে, ভাগ্যিকে খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করেছে; ‘বিষকণ্ঠা’ বলে আতুড়ঘরে মুখে হুন গুঁজে দাওনি—এতেই আমি কেনা হয়ে আছি বড়মামা। তার উপর আজ সকালে যে আশীর্বাদ করলে তার পর তোমাকে প্রণামী না দিয়ে থাকতে পারি? নাও—ঐ কুড়িটা টাকা দিয়ে গেলাম—দুটি নাকে মুখে গুঁজে এবার রেস কোর্সে যাও। কোন ঘোড়া ধরবে? লাস্ট হোপ?

অতসীর সামনে আর বাধা নেই। বলাই দেওয়ালের সঙ্গে একেবারে মিশে গেছে। হাতঘড়িটা দেখে নিরে অতসী পথে নামল।

বিষকণ্ঠা।

আশ্চর্য! কথাটা আজও পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারল না, অথচ অবিশ্বাস করে হেসে উড়িয়ে দিতেও পারে না আজকাল। দিন দিনই মনের জোর হারিয়ে যাচ্ছে তার। তবে নাকি কথাটা অনেকদিন ওঠেনি, তাই ভুলতে বসেছিল। একটা অপ্রিয় কুসংস্কার। ও ভুলে থাকাই ভাল। কিন্তু ভুলতে যে পারে না অতসী, সে ভুলে থাকতে চাইলেও ছুনিয়া ভুলবে না! তাকে ভুলতে দেবে না। অতসীর জন্মের পরেই ঠাকুরমশাই ওর কোণ্ঠী বিচার করেছিলেন। ঠাকুরমশাই ওদেরও কুলগুরু। অত্যাশ্চর্য নাকি তাঁর কোণ্ঠীবিচার! জন্মপত্রিকায় শনি-মঙ্গলের অবস্থান দেখে তিনি নিঃসন্দেহ হয়েছিলেন : জাতক বিষকণ্ঠা।

তার মানে? তার অর্থ—এ মেয়ে যাকে ভালবাসবে তার মৃত্যু অবধারিত। অচিরে।

এসব কথা অতসী জানতে পারে অনেক পরে। তখন ও ক্লাস এইট-নাইনে পাড়ে। প্রথম শুনছিল ছোটবোন বন্দনার কাছে। ছোটখুকি তখনও ফকের যুগে, কিন্তু পাকামিতে ওস্তাদ। রাত্রে দিদির গলা জড়িয়ে বলেছিল, এ্যাই দিদি, তুই আমার বরকে বিয়ে করবি না কিন্তু।

অতসী অবাক হয়ে বলেছিল, তার মানে? তোর বরকে বিয়ে করতে যাব কেন?

—ঐ যে দিদিমা বলে, এক বরের সঙ্গে দুজনকে গেঁথে দেব।

কৌতুক বোধ করেছিল অতসী। বলে, কেন তোর বরকে বিয়ে করলে কী হবে?

আমার বর পটাস করে পটল তুলবে।

—মরে যাবে? কেন মবে যাবে কেন?

—তুই যে বিষকণ্ঠা! তুই যাকে বিয়ে করবি ছ-মাসের মধ্যে সে পটল তুলবে। বুঝলি? ঠাকুরমশাই বলেছে।

—আমি কী?

—বিষকণ্ঠা।

—বিষকণ্ঠা। তার মানে?

—ঐ তো বললাম। তোর জন্মস্থানে কি বুঝি শনি-মঙ্গলের জন্ম আছে।
তুই যাকেই ভালবাসবি তার বুকেই ছোবল মারবি। ফৌস করে।

দিদির বুকে মুখ লুকিয়ে খিলখিল করে হেসে উঠেছিল ছোটখুঁকি।

প্রথমটার অতসীর কোনও ভাবান্তর হয়নি। বিশ্বাসই হয়নি কথাটা।
বলেছিল, কী বকছিঁ পাগলের মতো?

বন্দনা তখন বিছানার উপর উঠে বসে। বিষয়টা বুঝিয়ে বলে—

বড়মামা আর দিদিমার আলাপচারি গোপনে শুনে বন্দনা ব্যাপারটা জেনে
কেলেছে। অতসীর বিয়ের প্রসঙ্গ থেকেই নাকি আলোচনাটা শুরু হয়েছিল।
সবটা অবশ্য বন্দনা বুঝে উঠতে পারেনি; যেটুকু বুঝেছে তা ঐ। জন্মলগ্নে
অতসীর ভাগ্যবিধাতা নিদারুণ কৌতুকে ঐ সঙ্কেত রেখে গেছেন। আর কয়েক
ঘণ্টা আগে বা পরে জন্মালে অতসী এ বিড়ম্বনাকে এড়িয়ে যেতে পারত। কিন্তু
এখন আর উপায় নেই। গ্রহের চক্রান্তে অতসীর সমস্ত জীবনের উপর পড়েছে
এক ধুমকেতুর ছায়াপাত। সে যাকে নিবিড় করে ভালবাসবে তারই সর্বনাশ!

অতসীর বিষনিশ্বাসে তার আয়ুক্ষয় অনিবার্য।

সে রাতটার কথা অতসী ভুলতে পারবে না কোনদিন। খাটের উপর দিদিমা
অঘোরে ঘুমাচ্ছে। মেঝেতে বিছানা পেতে শুয়েছে দু বোন। পূর্বের জানালা
দিয়ে এক-পায়ে-খাড়া কর্পোরেশনের ঘোলাটে বাতিটার আলোর মশারির এক
প্রান্ত আলোকিত—বাদ বাকি, আলো-আধারিতে ঢাকা। একটা অজানা ভয়ে
অতীন্দ্রিয় আশঙ্কায় অবাক হয়ে গিয়েছিল অতসী। বন্দনা'র বোধ হয় ঘুম
আসছিল না, হঠাৎ ওর হাতটা টেনে বানে পড়েছিল। দিদিমা বেরে বলেছিল,
এ্যাঁই দিদি! তুই কি ভয় পেলি নাকি? দূর! ওসব বাজে কথায় কান দিস্ না।
আকাশের কোন কোনায় আছে শনি আর মঙ্গল গ্রহ, তার সঙ্গে তোরা কী সম্পর্ক!
যত্নসব! ঘুমো।

অতসী অশ্রুটে বলেছিল, কিন্তু একটা কথা ছোটখুঁকি। কথাটা বোধ হয়
মিথ্যে নয়! দ্যাখ, আমি বাবাকে ভালবাসতাম, মায়ের কথা আমার মনে নেই,
কিন্তু তাঁকেও ভালবাস গ্রাম নিশ্চয়, ওঁরা দুজনেই...

—দূর দূর দূর! কী পাগলাম শুরু করেছিঁ তুই! তুই আমাকে এ দারুণ
ভালবাসিস আমি কি মরে ভূত হয়ে গেছি?

অতসী সে-রাত্রে ও-কথার জবাব খুঁজে পাননি। জাননা যে বিয়ে'র
একমুঠো আকাশের মধ্যে সে জবাটা খুঁজ'ল- কথাটাকে সে বিশ্বাস করত
না হেসে উড়িয়ে দেবে। হঠাৎ বন্দনা আবার ওকে জড়িয়ে ধরে বলেছিল, দিদি!

খুব সাবধান ! বুড়ো বয়স কিছুতেই বিয়ে করবি না দিদিমার কথায়। বুড়ো মানুষ এমনিই পটল তুলবে আর দোষ হবে বিষকণ্ঠায় !

অতসী সে রসিকতার ও জবাব দিতে পারে নি।

পরে সে ব্যাপারটা জেনেছে। কিছুটা দিদিমার কাছে, কিছুটা মামীর কাছে। বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলায় দুলছে। না পেরেছে কথাটাকে উড়িয়ে দিতে, না মেনে নিতে। দিদিমাই পরে ওকে সাহসনা দেবার চেষ্টা করেছে, তুই ও নিয়ে কিছু ভাবিস্ না কম্‌নি। ঠাকুরমশায় বিধান দিয়েই রেখেছেন। সব দোষ ও'তই খণ্ডে যাবে।

হ্যাঁ, সে ব্যবস্থার কথাও জানতে পেরেছিল অতসী। ওর অনিবার্য-বৈধব্যের কাটান। অতসীর বিবাহ স্থির হয়ে গেলে প্রথমেই ওর সঙ্গে নারায়ণ-শিলার একটা বিবাহ অনুষ্ঠান হবে। নারায়ণ শিলার তো আর মৃছা নেই। ফলে ওর বৈধব্য-যোগ ওতেই কেটে যাবে।

—দিদি আপনার টিকিট হয়েছে ?

সম্মিলিত ফিরে পায় অতসী। চিন্তার জগৎ থেকে বাস্তবে ফিরে আসে। অফিস-যাত্রী বাসের গর্ভে একটি লেডিস্ সীটে বসে আছে সে। হাতঘড়ির দিকে এক নজর দেখে নেয়। নটা পঞ্চাশ। না, লেট হয়নি। হাত-বটুয়া খুলে খুচরো পয়সা বার করে বাড়িয়ে ধরে কণ্ঠাকটারের দিকে। বাসে প্রচণ্ড ভিড়। অফিস-টাগ্‌মে যেমন হয় আর কি। মানুষজন ঝুলছে হাতল ধরে। বাসটা দাঁড়িয়েছিল একটা স্টপে। ঐ ভিডের মধ্যেও এক বৃদ্ধা ভ্রমহিলা ঠেলে-ঠেলে উপরে উঠতে চাইছেন। কণ্ঠাক্টর যথারীতি দৈববাণী শুনিয়ে দিল, লেডেস সীট নেই কিন্তু বুড়িমা।

—না থাকে তো দাঁড়িয়েই যাব বাবা।

ভুজন লোক নামল। ঐ ফাঁকে হ্যাণ্ডেলটা চেপে ধরলেন বৃদ্ধা। তাঁর বাঁ হাতে আবার একটা পুঁটলি। ভিডের মধ্যে কে যেন বললে—এই অফিসটাইমটুকু বাদ দিয়ে যাতায়াত করতে পারেন না বুড়িমা ?

বৃদ্ধা কুণ্ঠিত হয়ে পড়েন। জবাব দেন না। ওরই মধ্যে আবার একজন হাত বাড়িয়ে বুড়িকে টেনে নিল। বাসটা ছাড়ল।

স্বয়ং কেটে গেছে। অতসী আর অতীতে নেই; বর্তমানে। বাসের গর্ভে। কিন্তু বর্তমান মানে কী ? আবার একটা দার্শনিক চিন্তা জাগল ওর মাথায়। বর্তমান মানে কি আজকের এই সকালটা ? তারও তো খানিকটা অতীত, খানিকটা ভবিষ্যৎ। আজ সকালবেলা বড়মামা যখন জুতোয় মাপের কাগজখানা

কুচিয়ে কুচিয়ে ছিঁড়ছিল সেটাও তো অতীত—অথচ তখন অতসী ছিল বড়-
মামার মায়ের ভূমিকায়। ছুঁ ছেলের দুঃসাগিতে মনে মনে হাসছিল সে।
এইমাত্র বড়িতে সে দেখেছে নটা পকাশ। এখন তো সেটাও অতীত। ভবিষ্যতের
পুঁজি থেকে মুঠো মুঠো মুহূর্তগুলি কুড়িয়ে নিয়ে অতীতের দিকে ছুঁড়ে ফেলার
নামই কি জীবন? এভাবে ছুঁড়তে ছুঁড়তে ফেলতে ফেলতে একদিন দেখা যাবে
পুঁজি গেছে নিঃশেষ হয়ে। তখন খরচের খাতায় একটা চ্যারা চিহ্ন দিয়ে সরে
পড়ার নামই দুনিয়াদারি?

কিছু ছি ছি ছি! ওটা বড়মামা কী বলল? রঞ্জু - রঞ্জন—

ছেলেটার সঙ্গে মাত্র মাসখানেক আগে পরিচয় হয়েছে। রমা ঘোষালের
লাভ-ভেকেন্সিতে নিতান্ত অস্থায়িভাবে তিনমাসের জন্ম নিযুক্ত হয়েছিল। বড়-
বাবু ছেলেটাকে অতসীর সামনে এনে বলেছিলেন, অতসী, এই চক্কোত্তি হচ্ছে
তোমার লাভ-ভেকেন্সির লোক। একেই ডেসপ্যাচে বসাও, কাজকর্ম শিখিয়ে
নাও—আর প্রথম দু-চারদিন একটু দেখে দিও। চালাক-চতুর ছেলে, বি. এ. পাস,
হুদিনেই শিখে নেবে। আমি চলি, বডকর্তা ইতিমধ্যেই সেলাম দিয়েছেন—মানে,
সেলাম দিতে ডেকেছেন।

বড়বাবু কৌচা সামলে আলমগীরের ভঙ্গিতে বড় বড় চ্যাঙ কপেলে চলে গেলেন।
অতসী মুখ তুলে দেখল ছেলেটার দিকে। রোগা, একহারা, অ্যানিমিক চেহারা
—বহরে বাড়েনি, বেড়েছে মাথায়। পাক। ছয় ফুট লম্বা। নতুন চাকরিতে
এসেছিল, প্রমোলা-রাজ্যের কেন্দ্রবিন্দুতে দাঁড়িয়ে আছিল—কোথায় লাজুক-লাজুক
মুখে দাঁড়িয়ে থাকবি, তা নয় দিবি। সপ্ততিভের মত হাত দুটো বুকের কাছে তুলে
বললে, নমস্কার, আমি কি আপনার হেপাজতেই কাজ করব?

পাশাপাশি তিন টেবিলে খটাখট বন্ধ হয়েছে। জয়তী, রেখা বিশ্বাস আর
প্রমোলা পট্টনায়ক হাতের কাজ বন্ধ করে তাকিয়ে আছে আগন্তকের দিকে।
ছেলেটি হাসিহাসি মুখে ওদের তিনজনের উপর মুণ্ডটা 'প্যান' করে এনে দৃষ্টিটা
ফোকাস করল অতসীর মুখেই। আবার বলছে, বসব কোথায়।

অতসী কৃত্রিম গাঙ্গুী বজায় রেখে বললে, কী নাম?

—রঞ্জু—বাই মীন, রঞ্জন চক্রবর্তী।

—এইটাই প্রথম চাকরি?

—আজ্ঞে না। এর আগেও লাভ ভেকেন্সিতে 'কিন্স আপ-দ্য-ব্ল্যাক' করেছি,
ইন্সুলে। অঙ্ক কষাতাম।

—ডেসপ্যাচ সেকশনের অতিষ্ঠতা আছে?

ছেলেটি একটা চেয়ার টেনে নিয়ে নিজেই বসল। বললে, না, নেই। সওদাগরী অফিসে এই প্রথম মাথা গলিয়েছি।

—কলকাতার কোন এলাকায় থাকা হয় ?

এর জবাবে ছেলেটি বললে, বাঙাইআটি। কিন্তু একটা কথা। এক অফিসে কাজ করব, কতকগুলি আর ভাববাচ্য চালাবেন? আপনি আমাকে 'তুমি'ই বলবেন।

জয়ন্তী মুখ টিপে হেসে নিল। রেখা বিশ্বাসের আঙুলগুলো কী-বোর্ডে নেচে উঠল। প্রমীলা তার টাইপ-রাইটারের আড়ালে মুখ লুকালো।

অতসী চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। বলে, এস আমার সঙ্গে। কাজ বুঝিয়ে দিচ্ছি। ঐটা হচ্ছে ডেস্প্যাচ-সেকশান। আমরা তিনজনে চিঠি টাইপ করি, সেটা সহই হয়ে এলে তোমাকে রেজিস্টারে এন্ট্রি করে ডেস্প্যাচ করতে হবে। কী ভাবে এন্ট্রি করতে হবে তা দেখিয়ে দিচ্ছি, এস।

রমা ঘোষাল ছিল ডেস্প্যাচ-ক্লার্ক। চার মাসের মেটর্নিটি লীভ পেয়েছে। গত সপ্তাহে ওয়া তিন টাইপিষ্ট পালা করে ডেস্প্যাচ সেকশানের কাজটা চালিয়েছে। আজ রঞ্জন চক্রবর্তী অস্থায়ীভাবে যোগদান করায় ওদের খাটনিটা কমল। কিন্তু দায়িত্বটা বাড়ল, অস্তুত অতসীর। বড়বাবু তাকেই বিশেষ করে বলে গেছেন নবাগতের কাজটা দেখে নিতে। ইস্যু রেজিস্টারে ঠিকমত এন্ট্রি না হলে, সহই না হওয়া চিঠি ইস্যু হয়ে গেলে, অথবা খামের কপি খামের বাড়ি রওনা দিলে ভবিষ্যতে অতসীই দায়ী হবে—ঐ নবাগত নয়। তাই সে ভাল করে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিতে থাকে। বলে, প্রথমেই দেখে নেবে চিঠি-গুলোতে সহই আছে কিনা, পরতীয়ত, যে চিঠির যেখানে 'টিক' দেওয়া আছে সেই ঠিকানায় চিঠিখানা যাচ্ছে কিনা; তিন নম্বর—ইস্যু রেজিস্টারে নাম্বার বসানো। ফাইল নম্বর বসানোই থাকবে, তুমি শুধু সিরিয়ালটাই বসাবে, বাই নম্বর আর ডেট বসাবে। আচ্ছা সরে বস, আমি খানকতক চিঠি এন্ট্রি করে দেখিয়ে দিই—

রঞ্জন পাশের টুলে সরে বসল। অতসী রেজিস্টারখানা টেনে নিয়ে খানকতক চিঠি পর পর এন্ট্রি করল। নম্বর বসালো,—রেজিস্টারে, চিঠিতে, খামের উপর। তারপর দৃষ্টান্ত খেয়াল হল রঞ্জন রেজিস্টারের দিকে তাকিয়ে নেই—একদৃষ্টে অতসীর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। একটু বিরক্ত হয়ে বললে, কী? কাজটা শিখে নেবে না কী?

একগাল হেসে ছেলেটা বলল, আপনাকে আমি কি বলে ডাকব?

গাভীৰ্ঘ বজাৰ রাখা কঠিন হয়ে পড়ে, অতসী বলে, সেইটাই বুঝি তোমার সবচেয়ে বড় সমস্যা ?

—না। তা ঠিক নয়। মানে, অফিসের কারও সঙ্গে তো আলাপ হয়নি, অথচ এখানেই মাস তিনেক কাটাতে হবে। রমাদেবী পূর্ণচন্দ্র লাভ করলে আমার অর্ধচন্দ্র মিলবে—

—তার মানে ?

—আপনি জানেন না ? আমি মিসেস্ রমা ঘোষালের লীভ ভেকেশিতে চার মাসের জন্ত বহাল হয়েছি। তিনি সোনার টাদ কোলে নিয়ে খালাস হলেই আমি অর্ধচন্দ্র ঘাড়ে নিয়ে খালাস হব।

বেশ কথা বলে ছোকরা। অতসীর ভাল লাগে ওকে। একটা ছোটভাই থাকলে এইভাবে গল্প করতে হয়তো। রঞ্জন আবার বলল, বড়বাবু টাইপিং সেকশানে আসামীকে হাজির করে তার নামটা ঘোষণা করলেন, অথচ আপনাদের কারও নাম আমি জানি না।

অতসী কোতুক বোধ করে। বলে, ঐ ঝাঁ দিকে সবুজ শাড়ি পরা মেয়েটি হচ্ছে জয়ন্তী লোম, মাঝের জন রেখা বিশ্বাস, আর ওপাশে প্রমীলা পট্টনায়ক।

—পট্টনায়ক ? ওড়িয়া নাকি ?

—হ্যাঁ, কিন্তু চমৎকার বাঙলা বলতে পারে। কিন্তু একটা কথা, তুমি কি বিবাহিত ?

—না তো। কেন ?

—তাহলে তোমার জানা থাকা দরকার—ওরা তিনজনেই বিবাহিত !

—ও। আর আপনি ?

—কী আমি ?

রঞ্জন এই প্রথম অপ্রস্তুত হল। ওর স্বভাব-সম্বন্ধিততার উপর অপ্রস্তুতির মেঘ ছায়া ফেলল ; কিন্তু তৎক্ষণাৎ সামলে নিয়ে বললে, আপনি তে নি জর নামটা বললেন না ?

—আমার নাম অতসী রায়।

—অতসী ! একটা ফুলের নাম, নয় ? নীল রঙের—অতসী, অপরাধিতা !

এবার হেসে ফেলে অতসী। বলে, আমার নাম নিয়ে কাব্য করতে হবে না ! মন দিয়ে কাজ কর।

—তা করছি ; আপনি কিন্তু মাঝে মধ্যে এসে দেখে যাবেন, আমি গম্বড় করছি কিনা—মানে প্রথম দিনটাই আপনাকে বিরক্ত করব মিস রায়।

—মিস্ রায় ! তুমি আমাকে মিস্ রায় বলে ডেক না !

—তবে কি বলব ? মিসেস রায় ?

—না । আমাকে ‘অতসীদি’ বলে ডাকবে ।

— কেন ? আপনি কি করে বুঝলেন যে, আপনি আমার চেয়ে বয়সে বড় ?

—ভারি ফাজিল তো তুমি ! তুমি কেমন করে বুঝলে আমি তোমার চেয়ে ছোট ?

—কোন অবিবাহিতা মেয়েই আমার চেয়ে বড় হতে পারে না—তাই !

অতসী ধমকে গেল । অনিবার্য প্রস্রাট করল না—কোন বিশ্বাসের জোরে রক্তন ধরে নিয়েছে আঠাশ বরের এই শ্রামাদী অবিবাহিতা । বরং গম্ভীর হয়ে বললে, মিস্টার চক্রবর্তী ! এটা অফিস ! রক্ত-রসিকতার জায়গা নয় ।

সেই প্রথম দিন ।

হুদিনেই অতসী অনুভব করল, ছেলেটা ফাজিল হতে পারে, অসভ্য নয় । য তার মনে আসে ফস্ করে বলে বসে । এদিকে দারুণ কুর্তিবাজ । বুদ্ধিমানও একটু এক্সেসিভিক । প্রথম দিনের শেষে অতসী এসে রেজিস্টারখানা ‘চেক-আপ’ করেছিল । ভুল নেই কিছু । সকালবেলায় ধমক খেয়ে এবেলায় সে এক নিম্প্রভ । চূপচাপ কাজ দেখিয়ে যাচ্ছে । অতসীর নিজেরই মায়া হয়েছিল । তাই বললে, হাতের লেখাটা এমন কাগের ঠ্যাঙ বগের-ঠ্যাঙ কেন ?

অগ্নানবদনে ছেলেটা বললে, আমি কবিতা লিখি যে !

—কবিতা লেখ । কবিতা লিখতে হলে বুঝি হাতের লেখা খারাপ করতে হয় ?

—করতে নয়, হয়ে যায়—মানে ইমোশানটার সঙ্গে আঙুল তাল রাখতে পারে না কিনা ।

হাসবে না কাঁদবে ভেবে পায় না অতসী । ছেলেটার মুখ চোখ দেখে মনে হয় না সে রসিকতা করছে । রীতিমত সিরিয়াস । অতসী বললে, তা হবে । আমি তো কবিতা লিখি না, তাই জানি না । সেই অন্তেই রবিঠাকুরের হাতের লেখা অত খারাপ ছিল !

—ওটা ‘এক্সেসেশান প্রভন্স দ্য কল’ ।

দিন-পনের পরে টিকিন আওয়ার্সে আমার ছেলেটা এসে পাকড়াও করল অতসীকে । বললে, আপনি আমার একটা উপকার করবেন ?

—উপকার ? কী জাতের উপকার ?

—আমি একটা শাড়ি কিনব । আপনি পছন্দ করে দেবেন ?

—শাড়ি কিনবে? কার জন্য? কেন?

—না, মানে আজ পে-প্যাকেট পেয়েছি তো। আমার বৌদির জন্য। আমার মা নেই, জানেন; বৌদির কাছেই মানুষ। তাই আজ একখানা শাড়ি কিনে নিয়ে যাব ভাবছি। কিন্তু আমার পছন্দ যদি তাঁর ভাল না লাগে!

অতসী ওর অসহায় মুখভঙ্গি দেখে শুধু কৌতুক নয়, করুণাও বোধ করেছিল। বললে, কিন্তু তোমার বৌদিকে আমি দেখিনি, চিনি না, তিনি কী রঙের শাড়ি পরেন, কী তাঁর পছন্দ কিছুই জানি না—

—আপনি ঠিক পারবেন অতসীদি। বৌদি রঙিন শাড়ি পরে না, তবে চওড়া পাড় শাড়ি পছন্দ করে; লাল-হলের পাড়, অথবা কক্স পেড়ে—গোটা পঞ্চাশের মধ্যেই হয়ে যাবে, কি বলেন?

—ফর্সা না কালো?

—এই আপনার মতো।

—তাহলে মোজামুজি বল না বাপু—‘কালো’।

—বলব? না বাবা! এর জবাবে যে-কথাটা মনে আসছে তা বলে ফেললে আপনি আবার ধমকে উঠবেন: “মস্টার চক্রবর্তী, এঁরা অফিস! রক্ত-সিকতার জায়গা নয়!”

—ঠিক আছে। আজ অফিস ছুটির পরে আমার জন্য অপেক্ষা করো।

—থ্যাঙ্ক!

—ওটা আবার কি হল? দিদিকে কি কেউ ‘থ্যাঙ্কস্’ দেয়?

—আয়াম সরি।

অফিস ছুটির পরে লেডিজ ট্রামটা ধরতে গেল না দেখেই রেখা বন্দান বৌদ্ব্য বোধ করল, প্রমীলা পট্টনায়েক হয়ে পড়ে কৌতূহলী, জয়ন্তী সোম উদগ্রীব। কিন্তু কোন কিছুকেই ভ্রক্ষেপ করল না অতসী। রঞ্জনের সঙ্গে ট্রামে চেপে কলকাতা স্ট্রীট অঞ্চলে রওনা দিল একখানা শাড়ি সওয়া করতে।

অফিস-ছুটির অনাকীর্ণ ট্রাম। তবু তাতেই ঐ ছেলেটা টেনে তুলল তার অতসীদিকে। ভিতরে ঢুকতে পারেনি। একটু হাতলের ছোঁয়া মিলল। রঞ্জন বাঁ-হাত দিয়ে আলিঙ্গন করে ওকে ভুললশায়িনী হতে দিল না। ওর সেই আলিঙ্গনপাণে কেমন যেন অখোয়াস্তি লাগছিল অতসীর। দু’স্টপ যেতেই বলল। এর চেয়ে হেঁটে যাওয়া ভাল, কি বল?

—আমিও তাই বলি। আমুন নেমে পড়ি।

দীর্ঘদেহী যুবকটির বাহুবন্ধ থেকে মুক্তি পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ল অতসীর।

দুজনেই ট্রাম থেকে নামল বোঁবাজার-সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউর মোড়ে। রঞ্জন সৌজন্য দেখিয়ে বললে, রিকশা নেব একটা ?

—কেন ? এটুকু হাঁটতে পারবে না ?

—আমি কেন পারব না ? আপনার কথাই ভাবছি আমি।

—আমার হাঁটা অভ্যাস আছে।

—তবে চলুন। বেশ গল্প করতে করতে চলে যাবো।

গল্প করতে করতেই ওরা এগিয়ে চলে উত্তরমুখো, সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ ধরে। অতীত শ্রোতার ভূমিকা পালন করছিল মূলত। রঞ্জন চক্রবর্তীই বক্-বক্তা। তার বাল্যের গল্প, কৈশোরের গল্প, কলেজ জীবনের কথা। ওর কবিতা লেখার বোঁক, ছোট গল্পও লিখেছে। ছাপানো যায়নি কোথাও। অভিনয় করতে খুব ভালবাসে। অনেক অনেকবার প্লে করেছে। বাপ-মা দুজনেই গত—মামুষ হয়েছ দাদার সংসারে। ওরা দু'ভাই এক বোন। বোনটির বিয়ে হয়ে গেছে, থাকে কানপুরে। দাদা রেলের কাজ করে। টি. টি. আই। সপ্তাহে দু'দিন বাড়ি থাকে—বাকিটা পথে পথে। বোঁদি লোক ভালো—খুব ভালো। রঞ্জনের দুটি ভাইঝি ও একটি ভাইপো আছে। দাদার সঙ্গে ওর বয়সের ফারাক দশ বছরের। রঞ্জন বি. এ পাস করেছে আজ দু-বছর। এম্প্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ নাম লেখানো আছে। জুন্সই একটা চাকরি ধরতে পারছে না। আগেকার দিন হলে দাদা নিশ্চয়ই রেলের ঢুকিয়ে দিত। আজকাল অত সহজে হয় না। তাছাড়া তারি কাজ রঞ্জন করতেও পারবে না—

—তারি কাজ মানে ?

—মানে 'স্টেনোগ্রাম' কাজ আর কি। আমি দেখতেই এমন তাগত্যাভা, ভিতরটা একেবারে ফাঁপা, বুয়েছেন ? প্রায়ই ঘুরে ঘুরে অস্থায়ী বাধাই।

—ভাল করে চিকিৎসা করাও না কেন ?

কেমন যেন বেদনার্ত হয়ে ওঠে হঠাৎ। বলে, বেকার মামুষ তো ! এতদিন দাদা পড়িয়েছে। এখন পাস করে কোথায় দুটো পরমা দিয়ে সাহায্য করব তা নয়, রাজকীয় চিকিৎসা করাও।

—রাজকীয় চিকিৎসা করাতেই হবে তার মানে কি ?

—এমনি ভাঙারে দেখেছে। টনিক-মনিক দ্যায়, খাই, ভাল থাকি, আবার ঘুরে ফিরে অর হয়। দেখছেন না কেমন অ্যানিমিক ?—হাতখানা বাঁড়িয়ে দেয়।

তারী মায়া হয় অতীত। কিন্তু সে ভাব চাপা দিয়ে বলে, আমার কি মনে হয় কোনো রঞ্জন, ঐ কবিতা লেখার জন্তই তোমার এ যোগ হচ্ছে—

কোথায় প্রতিবাদ করবে তা নয়, এক কথায় মেনে নিল ছেলেটা। বললে, ঠিক বলেছেন! বৌদিও তাই বলে?

—কী বলে?

—বলে, দিনরাত কবিতা লিখলে রোগ চেপে বসবে। বাইরে রোদে, আলো হাওয়ার ঘুরে আসতে বলে।

ক্রুদ্ধিত হয় অতসীর। খোলা-মেলা, আলো-হাওয়া? তাহলে কি—

—ডাক্তারবাবুও কি তাই বলেন?

—না। আপনি যা ভাবছেন তা নয়।

—আমি আবার কি ভাবছি?

—যে কথা আমিও প্রথম প্রথম ভাবতাম। টিউবারকুলোসিস নয়। ডাক্তার-বাবু বলেছেন।

—তাহলে?

রক্তশূণ্য হাত দুটি উল্টে দিয়ে রক্তন বগেছিল, গভ নোজ!

কলেজ স্ট্রীট বাজার থেকে পছন্দ করে একখানা ধনেখালি কিনে দিয়েছিল রক্তনকে। জমি, পাড়, দাম সবই পছন্দমত হল। হঠাৎ কোথাও কিছু নেই পাগল ছেলেটা বললে, অতসীদি! এবার আপনার জন্য একটা পছন্দ করুন। আপনাকেও একখানা শাড়ি প্রেজেন্ট করব আমি।

বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে যায় অতসী। বলে, তুমি কি পাগল?

অনেক পীড়াপীড়িতেও যখন রাজী হল না তখন বললে, তাহলে আর একটা অহরোধ রাখুন। চলুন আমার সঙ্গে কফি হাউসে। আজ পে-প্যাকেট পেয়েছি—প্রথম রোজগার! ‘না’ বললে আমি কিছুতেই শুনব না। আড়ি করে দেব আপনার সঙ্গে।

অতসী সেদিন পাগল ছেলেটাকে আশাহত করতে পারেনি।

...কিন্তু এ কী! বাস যে ওর অফিস-স্টপ ছেড়ে যাচ্ছে!

ভিড় ঠেলে কোনক্রমে সে চলন্ত বাস থেকে নেমে পড়ে। পিছন থেকে স্মরসিক কোন যাত্রী মন্তব্য করেন, দিদির দিবাঙ্গন হঠাৎ ভেঙেছে বোধ হয়।

বংশী চায়ের কাপটা নাহিয়ে দিয়ে বললে, অতসীদি, চা খেয়ে একবার বড়বাবুর সঙ্গে দেখা করবেন। উনি খোঁজ করছিলেন আপনাকে।

অতসী ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল—সাড়ে এগারোটো। এই সময় এক রাউণ্ড করে চা দিয়ে যায় বংশী সবাইকে। প্রমীলা চায়ের কাপটা টেনে নিয়ে বললে, ও ইগা বলতে ভুলে গেছি, আপনি তখন বাথরুমে গেছিলেন। বড়বাবু এর আগেও একবার আপনার খোঁজ নিয়েছিলেন।

অতসী তাকিয়ে দেখল ‘হল’-এর ও প্রান্তে। কাগজপত্রের মধ্যে বড়বাবু—মনোজ ঘোষ—ডুবে আছেন, এখান থেকে স্পষ্ট দেখা যায়। প্রকাণ্ড বড় ‘হল কামরা’—সওদাগরী অফিসে যেমন হয়। এ-পাশে টাইপিং সেকশান, মাঝে অ্যাকাউন্টস্, ও-পাশে ক্যাশ,—শুধু সাহেবদের ঘরগুলোই কাচ দিয়ে আড়াল করা। দৃষ্টির আড়াল নয়, শব্দের। মনোজবাবু লোক ভালো—সমস্ত অফিসের কাজকর্ম তার নখদর্পণে। অনেক দিনের মানুষ, এ অফিসে তাঁর বিশ বছর চাকরি হয়ে গেছে। সময়ে শত্রুও হতে জানেন, আবার প্রয়োজনে দিলদরিয়া। কনুফার্ড ব্যাচিলার। জনশ্রুতি, যাকে যৌবনে ভালোবাসতেন সেই মেয়েটি একটি বিলেত-ফেরত এঞ্জিনিয়ারের কণ্ঠস্বা হওয়াতেই বড়বাবু নীলকণ্ঠ! ছেনেস্তনে বিষ পান করে ব্যাচিলার! ভাহ বোনেদের মানুষ করেছেন। ডোল প্যাসেঞ্জারি করেন শ্রীরামপুর থেকে। সেখানে নাকি বাড়িও করেছেন। সখের মধ্যে সখ : থিয়েটার। কলকাতায় হেন থিয়েটার নেই যা উনি দেখেননি। নিজেও থিয়েটার করতে ভালবাসেন। ওঁরই উদ্যোগে এ অফিসে আজ দশবছর ধরে বছরে একবার থিয়েটার হয়। জুতো সলাই থেকে চণ্ডীপাঠ সব কিছু করতে রাজা—চাঁদা তোলা, ‘হল’ ভাড়া করা, স্মার্তের ছাপানো, তার বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করা থেকে নাটক চয়ন, কুশীলব নির্বাচন, পরিচালনা যায় থিয়েটারের পাট চুকলে যদি লোকসান যায় তবে গাঁটগছা। বীতিমত নাট্যমোদী লোক বলতে যা বোঝায়। কৈশোরের শিশিরবাবুর অভিনয় দেখেছেন, দুর্গাদাস, নির্মলেন্দু, অহীন্দ্র চৌধুরী, ভূমেন দাস—এঁরাই ওঁর আদর্শ। শঙ্কু মিত্তির—উৎপল দত্ত—অজিতেশ—কল-প্রসাদদের নিয়ে মাতামাতিটা তাঁর পছন্দ নয়। ফলে নাটক যা নির্বাচিত হয় তা বিগত যুগের। এখনও রঙমহল-বিশ্বরূপা-স্টার ভাড়া করে উনি চালিয়ে যান : সাজাহান, বঙ্গে বগী, মিশরুমারী, সিরাজুদৌলা। বড়বাবু বলে কথা!—কেউ

ট্যাং করতে সাহস পায় না। তাছাড়া প্রতিবাদ করা মানেই দারিদ্ৰ্যটা নিজের কাঁধে নিতে হবে, এবং সে দারিদ্ৰ্য ঐ জুতো সেলাই-তক-চণ্ডীপাঠ! স্বপ্নের আশ-সের সব কিছুই যদিচ হাল-কেশানের, বাবিক 'ফাংশানটা' হয় সাদেকী বেতার। সেই সভাপতি বরণ—প্রধান অতিথি বরণ—সম্পাদকের দীর্ঘ রিপোর্ট পাঠান্তে বিগত যুগের একটি নাটক আবার নতুন যুগে মঞ্চস্থ হয়।

‘—বাঙলা-বিহার-উড়িষ্যার মহান অধিপতি...’

‘—কী! মায়ের প্রতিমা চূর্ণ হবে! গোনার আঘাতে চূর্ণ হবে! মা মা...’

‘—মত্য সেলুকাস! কী বিচিত্র এই দেশ...’

কোন নাটক অভিনীত হবে তা নির্ভর করে একমাত্র প্রযোজকের ‘সিঙ্ক’ এ। এ বছর বড়বাবু কোন ‘রোল’টা করতে ইচ্ছুক—ডক্টর ভোস্, ডক্টর পণ্ডিত, না চাণক্য! অর্থাৎ কাকে কপি করবেন: অহোত্র চৌধুরী, নির্মলেন্দু, না শিশির-কুমার।

এ বছর মনোরঞ্জন চৌধুরী ঠর মনোরঞ্জন করেছেন নিশ্চয়, তাই এবার থরা হয়েছে—‘মাটির ঘর’।

অতসী প্রতিবাদই এক আধটা ছোটখাটো পার্ট করতে বাধ্য হয়। নারিকানর, লাইভ রোল। নারিকা কোনবার রমা ঘোষাল, কোনবার অন্নভী পোষ। ঐ আর এক বাতিক বড়বাবুর। অফিস-স্টাফের বাইরে থেকে কোন কুশল সব নির্বাচন করেন না তিনি। মায় ফিয়েল রোগেও। এ বছর রমা ঘোষালের নৈহিক অক্ষমতার জন্য বাধ্য হয়ে নির্বাচিত হয়েছিল অন্নভী পোষ। কিন্তু কোথাও কিছু নেই সে হঠাৎ বেকে দাঁড়িয়েছে। বড়বাবু তাই বাধ্য হয়ে অতসীকে চান্স দিয়েছেন। অতসী রাজী হত না, কিন্তু বিশেষ একটি কারণে সে রাজী হয়েছে এবার।

চারের কাপটা শেষ করে অতসী উঠল। পলিপথ অতিক্রম করে এসে হাজির হল বড়বাবুর টেবিলে। একজন বাইরের লোকের সঙ্গে কথা বলছিলেন তিনি, ইদিকে অতসীকে বসতে বললেন। অতসী বসে পড়ে একখানা ভিজিটাস চেয়ারে। কথাবার্তা থেকে বোঝা গেল আগন্তুক ভদ্রলোক থিয়েটারের ড্রেস ভাড়া দিয়ে থাকেন। কথাবার্তা শেষে তিনি বিদায় হয়ে বড়বাবু অতসীর দিকে ফিরলেন।

—আপনি আমার খোঁজ করছিলেন?

—হ্যাঁ। তুমি আমার একটি উপকার করবে মা?

এ আবার কী ধরনের কথা! বড়বাবু হুকুম করেন, ওরা তামিল করে। অতসী হ্যাঁ না কিছুই বলে না—বিস্ফারিত নেত্রে তাকিয়ে থাকে।

—আজ বিকেলে তোমার কোনও অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে ? একটা আরগার যেতে পারবে ?

অতসী মনে মনে কটকিত হয়ে ওঠে। অকস্মিক ছুটির পর সে বাণ্ডীবাটি যাবে বলে স্থির করে রেখেছে। এখন বড়বাবু কী ক্যান্ডাই বাধান কে জানে।

এক মুহূর্ত ইতস্তত করে অতসী বললে, আজ বিকালেই সেখানে যেতে হবে ? আজ আমি অন্য এক আরগার...

—ও ! তবে থাক। আমি নিজেই তাহলে...

—কোথায় ? কতদূর ? কাজটা কী ?

—তা দূর আছে। বাণ্ডীবাটি। যানে রজুটার এফটা খবর নিতে হয়—

অতসী লাবলে নিল নিজেকে। বললে, তা ঠিক। আজ পাঁচ দিন সে কামাই করছে, মদলবার থেকে। আমার অরজারি বাধারনি তো ? গোটা সপ্তাহ ডেন্‌প্যাচ সেকশানে—

—চুলোয় থাক তোমার ডেন্‌প্যাচ সেকশান ! আমার যে ‘হগ’ বুক করা আছে। এদিকে ছেলেটা ‘সিক্’ রিপোর্ট করে ছুটি চেষ্টা করেছে। ছোকরা তোভাবে কিনা বুঝতে পারছি না। যে-সে ‘রোল নর, মাটির ঘরে ‘কল্যাণ’—

অতসী স্বেপন বৃষ্টি বলে, একেবারে অজানা-অচেনা ছেনেকে প্রথমেই অত ইম্পর্টেন্ট পার্টটা দেওয়া বোধহয় আমাদের ঠিক হয়নি।

বড়বাবু উৎসাহে পালাবির পকেট থেকে নস্যির ডিবাটা বার করে ফেলেন। চট করে এক টিপ-র নাগারফ্রে চালিয়ে দিয়ে রুমালে নাকটা মুছে নেন। তারপর একগাল হেসে বলেন, তুমি কি আমাকে ছেনেবাহুধ পেয়েছ অতসী ? অত কাঁচা পোলা মনোজ ঘোষ নয়, বুয়েছ ? স্নোতিমত বাজিয়ে নিয়েছি আমি। হু-হুবার ওর অভিনয় আমি দেখেছি—টিগু স্মৃত্তানে ‘ব’সিরে লালী’ আর বিপ্রদাসে ‘বিজ্ঞান’। শুধু শুধুই ওকে লোভ ভেবেলিতে নিতে রাজী হয়েছি ভেবেছ ?

—অতসী অবাক হয়ে বলে, কোথায় দেখলেন ওর অভিনয় ?

—একবার ওদের কলেজে, একবার একটা ক্লাবে। তখন থেকেই ছোকরাকে নজরে নজরে রেখেছি। কী ‘টল’ ফিগার দেখেছ ? একটু সিকুনি, কিন্তু ‘ডব্লিস থো’ করতে জানে ; মডুলেশানও আছে। কিন্তু আজ পাঁচ দিন হয়ে গেল...

অতসী বললে, ঠিক আছে বড়বাবু, আমি আজই খোঁজ নেব।

—তুমি পারবে অতসী ? তুমি যে বলছিলে, তোমার কি যেন অ্যাপয়েন্টমেন্ট...

—সেটা কাল সকালেও হতে পারবে। কাল তো যোকার !

—তুমি আমাকে বাঁচালে বা। দাঁড়াও ওর ঠিকানাটা তোমাকে দিই।

অতসী সন্মুখে বসতে পারল না, বাড়িটা তার চেনা। তিন মণ্ডাং আগে এক শনিবার রজন তাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল বাগুইমাটি। বড়বাবু একটা কাগজে ঠিকানাটা লিখে দিলেন, বাস-পথের নির্দেশ দিয়ে দিলেন। অতসী সেটা লম্বা বাক্সে ভরে ফেলল। এবার সে উঠে দাঁড়ায়। বড়বাবু আবার বললেন, তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ অতসী।

অতসী সন্মুখে বলে, এ-সব কী বলছেন আপনি? সহকর্মী অসুস্থ হলে...

—না। আজ বাগুইমাটি যাচ্ছি বলে নয়। ‘তুমি’ করতে রাজী হওয়ায়।

অতসী চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। বলি-বলি করেও কথাটা বসতে পারে না। বৃদ্ধ হাসলেন। বললেন, কিছু বলবে মনে হচ্ছে?

—না।

—তাহলে আমিই বলি। আমি কৃতজ্ঞ বোধ করছি তুমি ‘তুমি’ বোলটা করতে রাজী হয়েছ বলেই শুধু নয়, তুমি নীরবে একটা মোক্ষের প্রতিবাদ করেছ বলে।

—প্রতিবাদ? কিসের প্রতিবাদ?

—একটা মিথ্যা অশ্ববাদের প্রতিবাদ। একজন জেহুইন-অ্যাকটরের মাথায় মিথ্যা কলক চাপিয়ে দেওয়ার প্রতিবাদ। ‘অভিনয়’ হচ্ছে ‘অভি’ পূর্বক ‘নি-’ধাতু ‘অন’। তুমি আমার অস্ত্রের নৈকট্যে এসে গেছ তোমার ব্যবহারে! আই কনগ্র্যাচুলেট ইউ অ্যাড এ ড্রামা-লাভার।

অতসী সন্মুখে মাটির দিকে তাকায়।

এ বৃদ্ধ নাট্যমোদীর সমস্ত প্রগতিবিমুখ দৃষ্টিভঙ্গিকে সে এই মুহূর্তে ক্ষমা করতে পেরেছে।

নাট্যরসিক মনোজ ঘোষ যে বিশেষ একটি উদ্দেশ্য নিয়ে রমা ঘোষালের লীভ-ভেকেসিতে চার মাসের জন্ত ঐ অনাখ্যের অজ্ঞাতকুলবীণ কুশীলবকে চাকরীতে চাকানোর জন্ত তথ্য তদারক করেছেন এটা কারই বা জানা? কেই বা ধবর রাখে বড়বাবুর কাছে কতজ্ঞাতের উদ্দেশ্য আসে ঐ বকম লীভ-ভেকেসিতে ছু-চারমাসের চাকি পেতে—পরিচিত-বন্ধু বা আত্মীয়দের সুপারিশ নিয়ে। সব দিকে নজর না রাখলে বছরে বছরে এমন রাজস্বের যজ্ঞ করা যায়? ‘মাটির ঘর’ ধরবেন বলে যখন মনস্থ করেন তখনই মনে মনে রমা ঘোষালকে ‘তুমি’র চরিত্রে নির্বাচন করেছিলেন। কিন্তু ঘেরোটোর কোন কাণাকাণ্ড জান নেই! সামনে বাৎসরিক ড্রামা কাংশন আর তুমি কী এক বধেড়া বাধিয়ে বসলি।

‘মাটির ঘর’ কেলে আতুড়ঘর ! কোনো মানে হয় ? অবশ্য বখেড়াটা দেখেছে কয়েক মাস আগেই—তখনও ‘মাটির ঘরের’ ভিত পহন হয়নি । বর্তমানে তার যা দৈহিক অবস্থা তাতে তাকে নাড়িকার রোল কেন, কোন চরিত্রেই নেওয়া চলে না । যেটানিটি লীভ পেয়ে অব্যাহতি পেল রমা ঘোষাল । কিছু করিংকরী লোকের হুভাবই ঐ । লোকসানটা নিয়ে তারা হা-হুতাশ করে না—লোকসানের পরিপূরক হিসাবে পয়সা বয়ে লাভ । রমা গেল, এল রজন । ‘তজ্জা’ হরপের ক্ষতিপূরণ হল ‘কল্যাণীয়েষু’তে । ছেলেটা মংগিয়ে লালী এবং বিজদাসের চরিত্রে হুগু বয়েছিল বড়বাবুকে—কল্যাণ সে ভালমতই করবে ।

‘মাটির ঘর’ এ তিন-তিনটে ইম্পোর্টেন্ট নারী চরিত্র : তজ্জা, ছন্দা আর নন্দা । বড়বাবু রমা ঘোষালকে হারানোর পর মনে মনে নিব চন করে রেখেছিলেন : জয়ন্তী, প্রমীলা আর রেখাকে । চমৎকার কাঠিৎ । অতসীকে টাইপ-বোলে চান্স দিয়েছেন—ছন্দার ননদ । প্রথম দিন রিহার্সালে বসেই তিনি চরিত্র-বন্টন তালিকাটা পড়ে শোনালেন । ‘অলক’ এ কোম্পানীর চিরকালের দিগো স্বরাজিৎ ঘোষ । ‘চঞ্চল’ করবে সেল্‌স ডিপার্টমেন্টের সুব্রত নাগ, ‘উৎপল’ করবে বিত্ত, আর ‘কল্যাণ’ করবে নবাগত রজন চক্রবর্তী । নারকের বোলে চান্স নেই, সুব্রতর আশা ছিল বল্যাণের রোলটা পাবে অর্থাৎ এতদিনে তার ভাগ্যে শিক ছিঁড়ে দইয়ের হাঁড়িটা নামবে । কোথা থেকে ছল্লড়-ফোঁড়া ঐ তা-চ্যাঙা ছেলেটা এসে ছিনিয়ে নিল সে সুযোগ । সুব্রত বুকল—এই জহেই বড়বাবু ঐ ‘নেপোটিজম’ । রমা ঘোষালের লীভ ভেকোঁসতে এনে হাতির করেছেন ঐ ‘নেপো’কে দখিভকণের সুযোগ পাইয়ে দিতে । তবে বড়বাবুর কথার উপ-কেউ কোনদিন কথা বলেনি । সুব্রত আড়চোখে একবার দেখে নিল নবাগত নেপোকে—রজন চক্রবর্তীকে ।

বড়বাবু বললেন, নেকস্ট বুধবার অফিস ছুটির পর আমরা রিহার্স লে বসব । তোমরা সবাই আমার সিস্টেম জান, তাই শুধু রজনকেই বিশেষ করে বলছি—রিহার্সালে প্রমুটিং হবে না কিন্তু । আছোপাস্ত পাট মুখস্থ থাকা চাই ।

রজন সংক্ষেপে শুধু বলেছিল : ও কে !

বড়বাবু তখন ‘মাটির ঘর’ নাটকটার মূল বক্তব্য এবং বিভিন্ন চরিত্রের ব্যক্তিত্ব বুঝিয়ে দিতে থাকেন—হেন, ‘মাটির ঘর’ গুয়ের অচেনা কোন নাটক । পাণ্ডুলিপি, অবস্থায় তার প্রথম অভিনয় হচ্ছে । কেউ কোনও কথা বলেনি ।

বড়বাবু বলে কথা !

ঝামেলা বাধল ঐ প্রথম বুধবারেই রিহার্সাল-অঙ্কে । জয়ন্তী সোম জ-

কড়াবুঝ কাছে এসে বলল আমাকে সাপ করতে হবে আর, আমি 'তজ্জা' করব না। হয় 'ছন্দা' অথবা 'নন্দা'-র পার্ট আমাকে দিন।

এ জাতীয় অস্বাভাবিক কথা দশ বছরের ইতিহাসে কখনও শোনেননি কড়াবুঝ। মিনিটখানেক তিনি নিশ্চল চোখে তাকিয়ে থাকেন জয়তীর দিকে। তারপর বলেন, কেন?

গম্ভীরভাবে জয়তী বলে, সেদর কথা শুনে আপনার কাজ নেই। নিতান্ত নিক-পায় না হলে এমন কথা আপনাকে কেন বলব বলুন?

মনোজ ঘোষ বুকে উঠতে পারেন না, এক্ষেত্রে কী করণীয়। দীর্ঘদিনের অভিজাত্য তিনি বুকেছিলেন তাঁর চরিত্র বস্টন নিহুল হয়েছে। তজ্জার চরিত্রটাই কঠিন, জয়তী অভিনয় কুশলতার সবচেয়ে পারদর্শী, রম্য অবর্তমানে। প্রমীলাও ভাল অভিনয় করে, তবে উচ্চারণ ঘোষ আছে। রেখা বিশ্বাস বয়সে এতই ছোট যে তাকে বড়বোনের পার্ট দেওয়া চলে না। মরিয়া হয়ে শেষ পর্যন্ত বড়াবুঝে চলে, এমন করলে তো চলবে না জয়তী, তোমার কী জাতের অহুবিধা হচ্ছে তা আমাকে জানতে হবে বইকি—আমার কাছে আর সঙ্কেচ কী? বল মা, খুল বল?

যেদিনোনিবন্ধ দৃষ্টি জয়তী বগেছিল, আমার শাওড়া খুব কনজার্টেটিভ। উনি জানতে পারলে আমাকে আর খিয়েটার করতেই দেবেন না।

হালে পানি পান না। জয়তীকে উনি আজ তিন-চার বছর ধরে চেনেন। ওর বাম্বোকেও। শাওড়ীকেও দেখেছেন বার্ষিক ফাংশনে। জয়তীকে ওর শাওড়ী ঠাকরন 'মিশর হারী'তে নাহ্রিন, বঙ্গবর্গীতে 'গৌরী' এবং সিরাজুদ্দৌলার 'সেটি বেগমে'র ভূমিকার অভিনয় করতে দেখেছেন, আজই বা তজ্জার ভূমিকার দেখলে আংকে উঠবেন কেন? বেশ বুঝতে পারেন, মেয়েটা আদল কথা ভাঙছে না। বাধ্য হয়ে তিনি অতঃপর ডেকে পাঠালেন প্রমীলা আর রেখাকে। ওদের বললেন জয়তী বলছে, তজ্জার পার্টটা তার স্টুট করছে না। এখন বল, কী ভাবে চরিত্রগুলো অঙ্গ-বঙ্গ করা যায়? প্রমীলা 'তজ্জা' করবে?

প্রমীলা দৃঢ়ভাবে মাথা নেড়ে বলল, না। আমি রাত জেগে ছন্দার পার্ট মুখস্থ করেছি। আর ছন্দা আমাকে স্টুটও করছে। আমি কেন পার্ট বদলাব?

রেখা নিজে থেকেই বললে, আমাকে নিশ্চয়ই আপনি তজ্জার রোলটা করতে বলবেন না। প্রমীলাদি আর জয়তীদিকে আমার ছোট বোন বলে দর্শকদের কেউ মেনে নেবে না।

রেখা সন্ত সৌমভিনী। বরসে সবার ছোট। তাছাড়া সে গান গায়। নন্দার গান আছে।

অগত্যা ওদের বিদায় দিয়ে বড়বাবু ডেকে পাঠিয়েছিলেন অতসীকে। ভিতরে কিছু একটা ব্যাণার আছে। সেটা কী তা তাঁকে জানতে হবে। অতসী কিছু কোন হৃদিস বলতে পারেনি। সে অবাক হয়েছিল খবরটা শুনে। বলেছিল, আজ্ঞে না, আমাকে তো ওরা কিছু বলেনি। জরতীও কিছু বলেনি।

—আশ্চর্য! অথচ তোমরা চারজন পাশাপাশি টেবিলে বসে কাজ কর।

তা করে। ওরা চারজনেই টাইপিষ্ট। অতসীই একমাত্র স্টেনোগ্রাফিষ্ট।

বি. এ. পাস করে যখন চাকরির অভাবে বসেছিল তখন স্টেনোগ্রাফিষ্টা শিখেছে। এজন্য ওদের তিনজনের চেয়ে ও কিছু বেশি মাইনে পায়। ভিন্ন ছেলে। কিন্তু সেজন্য নয়, অন্য একটি কারণে ঐ চারজন মহিলা-কর্মীর মধ্যে অতসীই একমাত্র অস্বেবাসিনী। বয়সে সে সবচেয়ে বড়, চাকরিতে সিনিয়র-মোস্ট; সেটাও কিন্তু কারণ নয়। কারণটা জীবনের রঙ্গমঞ্চে ও জুনিয়র-মোস্ট! তাদের সবজাতের রক্ত-রসিকতা শুজ শুজ হুস্‌হুস্‌ শুক হয়ে যায় অতসী এসে পড়লে। ওরা তিন সৌভাগ্যবতী সীমাহিনী যে সমতলের বাসিন্দা অনুচা অতসী তার নাগাল পায়নি।

বড়বাবুকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছিল—ব্যাণারটা তদন্ত করে দেখবে এবং কী করণীয় তাও জানাবে।

তদন্ত করে দেখেছিল অতসী। অভিযোগটা বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়নি। সমাধানটা যে কী জাতের হতে পারে তারও হৃদিস পায়নি। একটা নিরুৎসাহ রাগে সে যেন ফেটে পড়তে চাইছিল। ইচ্ছা করছিল—ঠাস ঠাস করে কতকগুলো চড় মারতে। কিন্তু কাকে? জরতীকে? নাকি ঐ ছেলেটাকে? কিংবা নিজের গালেই।

প্রথমটা কিছুতেই ওরা ভাবতে চাননি ব্যাণারটা। ক্রমাগত একথা একথা বলে এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করে। অহেতুক ধানাই পানাই। শেষে অতসী রীতিমত ক্ষুব্ধ হয়ে বলেছিল, তোমরা তিনজনে এমন করলে আমি কী করতে পারি বল? বড়বাবু বললেন, ভিতরের কথাটা জেনে একটা ‘পসিবল্‌ সাজেসশান’ দাও। অথচ তোমরা...

জরতী বলল, পসিবল্‌ সাজেসশান? আমি দিচ্ছি। আপনি ‘তজ্জা’-র রোলটা করুন, আমি আপনার ‘অজনা’র এক সিনের রোলটা করে দেব।

কোথাও কিছু নেই রেখা বিশ্বাস বিলুপ্ত করে হেসে ওঠে, সেই বেশ হবে!

অতসী অপমানিত বোধ করে। গভীর হয়ে বলে, তুমি যদি ও-কথা রসিকতা করে না বলে থাক তাহলে আমার জানা দরকার তোমার কী জাতের অসুবিধা হচ্ছিল। কারণ আমাকেই হ্যাঁ সেটা ‘কেন’ করতে হবে?

যেথা আগ বাড়িয়ে বললে, আপনার সে অসুবিধা হবে না অতসীদি।
আপনার তো আর শক্তী নেই—

অতসী ধমকে ওঠে, তুমি চুপ কর যেথা। আমি জরতীর সঙ্গে কথা বলছি।
এবার প্রমীলা নিজে খেবেই নাক গলার। ওদের দুজনের দিকে ফিরে
বলে, আই থিংক, বু আর নট ফেরার উইথ অতসীদি। সব কথা ওঁকে খুলে বলা
দরকার।

জরতী বললে, বেশ, তুই বল।

অতসী এবার প্রমীলাকেই ধরে গড়ল, তুমিই বলতো প্রমীলা, কী ঘটেছে?

প্রমীলা সংকোচ করল না। অকপট সত্যতাবণ করল। জরতী বলছে,
রিহার্সালের সময় যে গীনে কল্যাণ তুম্বাকে জড়িয়ে ধরবে সেখানে রজনবাবু
জরতীকে সত্যি সত্যিই ‘এম্ব্রেস’ করেছিলেন। আই মীন ‘মিয়াল এম্ব্রেসিং’।

অতসী বুঝতে পারেনি তাও। বলেছিল, সে ওটা আমরা সবাই বচকে
দেখলাম। ‘কেবু এম্ব্রেসিং’ হওয়ার কথাও তো নয়। তাতে হল কী?

আবার কথা বলল যেথা, কী যে হল তা আপনাকে বোঝানো যাবে না
অতসীদি। জরাদি ম্যানেজ। ও বুঝতে পারে।

অকুণ্ঠিত হয় অতসীর। জরতীর দিকে ফিরে বলে, ইজ দ্যাট দ্য রীজন?
রিহার্সালের সময় রজন তোমাকে এমনভাবে জড়িয়ে ধরেছিল...ওয়েল, যাতে তুমি
অস্বাভাবিক বোধ করেছ?

জরতী ওর চোখে-চোখে তাকিয়ে বলে, ইয়া তাই।

অতসী মিনিট খানেক জবাব দিতে পারেনি। তারপর বললে, আমি কিছু
ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না। আমাদের সকলের চোখের সামনেই তো
ঘটনাটা ঘটেছিল। নাটকে নির্দেশ আছে ‘কল্যাণ তাকে নিবিড়ভাবে বুকে
চাপিয়া ধরিয়া শুক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।’ ভিরেকটার যেভাবে দাঁড়াতে বলে-
ছিলেন ঠিক সেইভাবেই তো রজন তোমাকে বুকে টেনে নিল। এর মধ্যে
অশালীন তো কিছু ছিল না।

—ও আপনাকে বোঝানো যাবে না অতসীদি।

—কেন যাবে না? কি দিবে বুঝলে ওটা অশালীন?

—সর্বদা দিবে!...বলছি তো, ও বোঝানো যায় না, বোঝা যায়। আপনি
নিজে ‘তুম্বা’র পার্টটা নিয়ে দেখুন। তাহলেই বুঝতে পারবেন।

আবার খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে যেথা বিশ্বাস।

প্রমীলা ধমক দেয়, এ্যাই তুই হাসছিস কেন?

যেখা সামলে নিয়ে বসে, আমার একটা প্রস্তাব আছে অতসীদি ! লেটস হ্যাভ অ্যান এক্সপেরিমেন্ট । নেক্সট রিহর্সালে জয়াদি অ্যাবসেন্ট হোক—আর আপনি প্রক্সি দিন তদ্বার বোল-এ । আপনি দেখুন ব্যাপারটা যাচাই করে । যাকে বলে ‘ফিজিক্যাল ভেরিফিকেশান’ !

অতসী এতটা উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল যে, রেখার বাক-প্রয়োগের চাতুৰ্যটা খেয়াল করেনি । সে অ্যাকসেন্ট করেছিল ঐ চ্যালেঞ্জ : ঠিক আছে ! তাই হোক ! প্রমীলা বলে, কিন্তু একটা সৰ্ত আছে অতসীদি । আমরা স্বীকার করতে পারিনি । আপনি যদি তেমন কিছু ‘ফোল’ করেন তাহলে বড়বাবুকে জনাস্থিকে আসন্ন কারণটা জা'নিয়ে দেবেন ।—এগ্রীড ?

দৃঢ়তরে অতসী বলেছিল, না ! জনাস্থিকে নয় ! আমি সোচ্চারে প্রতিবাহ করব রিহর্সাল ক্রমেই । আমি যদি তেমন কিছু ‘ফোল’ করি তবে সর্বসমক্ষে ছোঁড়াটাকে টেনে একটা চড়ু কটাব !

আবার বিনশ্বিল করে হেসে উঠেছিল রেখা বিশ্বাস ।

যেখা বেধেছিল অতসী । কায়দা করে জয়তী ‘ক্যাজুয়াল নোড’-এ অল্পপন্থিত হল । অতসী রাজী হল প্রক্সি দিতে । রেখা বিশ্বাস আর প্রমীলা পট্টনায়ক সেই বিশেষ দৃশ্বে নাটকীয় পরিবর্তনের জন্য ক্রুদ্ধ নিশ্বাসে প্রহর গুনছিল । কিন্তু তাদের নিরাশ হতে হল । বহুদিন যখন বুকে টেনে নিগ অতসীকে তখন কিছুই ঘটল না ।

ও'া ভেবেছিল ভিতরের কথাটা বুঝি কেউ টের পায়নি । ও'রা ভুল ভেবেছিল । প্রমীলা পট্টনায়কের স্বামী লক্ষ্মণ পট্টনায়ক অ্যাকাউন্টন্-সেকশানের করণিক । ধর্মপত্নীর কাছ থেকে যে গোপন তথ্যটা সে জেনেছিল তা বিশ্বাসভাজন সহকর্মীদের গোপনে জানিয়েছিল—অবশ্য ব্যাপারটা সম্পূর্ণ গোপন রাখতেও বলেছিল । বলা বাহুল্য সেই সেই সহকর্মীরা যখন তাদের বন্ধুবান্ধবদের গোপন বার্তাটা জ্ঞাপন করে তখন তারাও উপযুক্ত গোপনীয়তার নির্দেশ দিয়ে বেধেছিল । তাই অতসী না জানলেও সেদিন রিহর্সাল-ক্রমে উপস্থিত প্রত্যেকটি প্রাণীই অন্ধরে অন্ধরে ঐ চরম দৃশ্বে ১৫পেটাঘাতের ক্লাইমেক্সের প্রতীক্ষায় ছিল ।

ঘটনা ভিন্ন দিকে মোড় ফেরার হতাশ হল সকলেই ।

অতসী আন্দাজ করেছিল, বোধকরি রঞ্জন চক্রবর্তী অনুমান করতে পেরেছে—কী কারণে জয়তী সোম বৈকে বসেছে । আর সে জন্তই আনিগুন দৃশ্বে এমন নিষ্ঠাবান আবেষ্টনী গড়ে তুলল যাতে অঙ্গে-অঙ্গে স্পর্শ হল না আদৌ । ব্যাঙ্গে-জাল্যের পেলব স্পর্শে সে আবেষ্টনীর একটা পরিবেশ সৃষ্টি করল বটে, কিন্তু

রীতিমত আড়ষ্ট ভাবিত। অতসী বেশ বুঝতে পারে, জয়তীর ক্ষেত্রে এমনটা ঘটেনি। কেমন যেন একটা আশাত্মক হতাশ হল সে।

আশাত্মক। কেন? সেও কি মনে মনে ঐ নাটকীয় দৃশ্যটা প্রত্যাশা করেছিল? রঞ্জন চক্রবর্তীকে সর্বসমক্ষে টেনে একটা চড় মারা? অথবা...

না! নিশ্চয় নয়। খুনিই হয়েছে অতসী। একটা বিশেষ ঘটনার হাত থেকে মুক্তি পেয়ে।

সবচেয়ে অবাক কাণ্ড মহড়া শেষ হলে বড়বাবু বললেন, অতসী! আই হাত কাষ টু এ ভিসিগন! শোন। তুম্মার বোলটা তুমিই করবে। আর জয়তা করবে ছন্দার নন্দ অঙ্গনা।

অতসী রীতিমত হকচকিয়ে যায় : কা বলছেন বড়বাবু। রঞ্জন আমার চেয়ে চার পাঁচ বছরের ছোট। আমাকে, আমাকে—

—না, চার-পাঁচ বছরের ছোট নয়। বছর দুইয়ের ছোট হতে পারে। ওটা মেকআপে ম্যানেজ করা যাবে। কিন্তু এটাই আমার ভিসিগন! না কি তুমিও জয়তীর মত বলবে তোমার অস্থিবিধা হচ্ছে?

অতসী মুখ তুঙ্গে দেখল, সবাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। আর অপরাধীর মত মুখ নিচু করে এক কোণায় দাঁড়িয়ে আছে রঞ্জন। বললে, না আমার আপত্তি শুধু ঐ বয়সের ডিকারেন্স। জন্মই; আর কোনও অস্থিবিধা নেই।

—ডাটস্ সেটল্‌ড্‌ দেন।

সেদিন রিহার্সাল ভাঙবার পর রঞ্জন এসিয়ে এস বসেছিল, অতসীদি, আপনার সঙ্গে একটা কথা ছিল।

চোখে-চোখে কথা হয়ে গেল প্রমীলা আর রেখার। অতসী ভ্রূক্ষেপ করল না। বলল, চল, যেতে যেতে কথা হবে।

পথে বেরিয়ে অতসী দললে, কি বসছিলে?

—কোন চায়ের দোকানে গিয়ে বসবেন? রাত তো বেশি হয়নি।

—তা হয়নি। কিন্তু তুমি ‘একটা কথা’ বসতে চেয়েছিলে। মনে হচ্ছে ‘একটা’ ছেড়ে দুটো কথা বলতে চাও?

—সেটা নির্ভর করছে, আপনি ‘একটা’ কথার জবাবে আর একটা কথা বলেন কিনা, তার উপর।

ডালহৌসী পাড়ায় এই রাত আটটাই পড়ার রাত। অধিকাংশ দোকান-পাট বন্ধ হয়ে গেছে। একটা ট্রাম ধরে ওরা এম্প্রানেন্টে চলে এস। একটা

রেস্তোরার চুকে বসল দুজনে। অতসী বললে, আজ আমি তোমাকে খাওয়াব। বল কী খাবে?

রজন আপত্তি করল না। বলল, কোব্‌রেজি কাটলেট।

বর এসে অর্ডার নিয়ে চলে যাবার পর অতসী বলে, এবার বল?

খালি প্লেটে ককটা দিয়ে আঁচড় কাটতে কাটতে মুখ নিচু করে রজন বলে, আমি জানি, কেন মিসেস সোম ওস্তার পার্টটা করতে অস্বীকার করেছেন।

অতসী কৌতুক বোধ করে। বলে, কেন বলতো? আমি তো শুনি নি কিছু?

—আপনি আমার ‘লেগপুল’ করছেন। নিশ্চয় শুনেছেন আপনি!

মায়ী হয় অতসীর। বলে, হ্যাঁ, শুনেছি। কথাটা সত্যি?

—কী কথা!

—শ্রাকামি কর না! সত্যিই আগের দিন দুটুমি করেছিলে কিছু? জরতীকে নিয়ে?

—মা কালীর দিব্যি! আচ্ছা, আপনি তো আজ নিজেই দেখলেন—

—বাজে বক না! তাতে কী প্রমাণ হয়?

—আপনিই বলুন, তাতে কী প্রমাণ হয়?

—অনেকগুলি বিকল্প সিদ্ধান্ত হতে পারে। এক নম্বর, তুমি হয়তো জানতে পেরেছিলে আজ কোন রকম দুটুমি করলে খান্গড় খেতে হবে; দু-নম্বর প্রথম দিনের দুটুমির পর তুমি ভয়ে ভয়ে নিজেই সংযত হয়েছ; তিন নম্বর, তুমি শুধু জরতীকেই ঐভাবে জড়িয়ে ধরতে চাও, আমাকে নয়—

বাণবিদ্ধ বোবা জ্বর মত রজন চুপ করে তাকিয়ে থাকে।

—কী হল? জবাব দিচ্ছ না যে?

—কী জবাব দেব? ওর তো একটাও সত্য কথা নয়।

আবার কৌতুক বোধ করে অতসী। বলে, একটাও নয়? তিন নম্বর হেতুটাও নয়? অর্থাৎ আমাকেও ঐ ভাবে জড়িয়ে ধরার ইচ্ছা তোমার হয়েছিল, শুধু নাহসে কুলারিনি?

রজন উঠে দাঁড়ায়। বলে, থাক অতসীদি, আমার ‘একটা কথা’ শেষ হয়েছে। উঠুন।

—উঠুন কি গো? খাবারের অর্ডার দিয়েছি না? বল।

আবার বসে পড়ে রজন। মাথা নিচু করে প্লেটের উপর আঙুলের দাগ কাটতে থাকে নীরবে। অতসী বলে, কী ভাবছ এত?

—আপনি কি সত্যিই ‘ওস্তা’র রোলটা করবেন?

—উপায় কি ? আমার তো অস্বাসী চাকরি নয় । বড়বাবুকে চটাতে পারব না । বাধ্য হয়ে তোমাকে সহ্য করতে হবে ।

রঞ্জন গম্ভীর হয়ে বললে, হবে না । আমার তো স্বাসী চাকরি নয় । এরোজন হলে রিজাইন দেব । আমি আপনার স্বাসীর রোল করছি না ।

অতসী ওর হাতটা চেপে ধরে, এ্যাই ! কী পাগলামো করছ ? তুমি কেন ‘কল্যাণ’ করবে না ? তোমার কিসের আপত্তি ?

—সে আপনি বুঝবেন না ।

—বুঝব না কেন ? এ তো সহজ কথা । জরুরী সোম ‘তজ্জা’ করলে তবেই তুমি ‘কল্যাণ’ করবে । আমার অপোজিটে তুমি ও পার্ট করতে রাজী নও । এতে না বোঝার কী আছে ?

রঞ্জন প্রতিবাদ করে না । চুপচাপ বসে থাকে । অতসীই আবার বলে, কী হল ? জবাব দিচ্ছ না যে ? যা হোক কিছু বল । চায়ের দোকানে তো তুমিই ভেঁকে আনলে ?

—বলতে তো অনেক কিছুই চাই অতসীদি । কিন্তু আপনি ক্রমাগত আমার ‘লেগপুল’ করছেন । সিয়েরিয়াসলি কোন আলোচনাই করতে রাজী নন ।

এবার সত্যই গম্ভীর হয় অতসী । বলে, আয়াস সরি । বল রঞ্জন, সব কথা খুলে বল ।

রঞ্জন এক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকল অতসীর দিকে । তার মুখে কৌতূহলের ছিটেকোটাও আবিষ্কার করতে না পেয়ে বললে, আমি সব কথাই স্বীকার করব অতসীদি । আপনি মাঝপথে আমাকে বাধা দেবেন না । সব শুনে যদি মনে করেন আমাদের দুজনের স্বাসী-স্বাসীর চরিত্রে অভিনয় করা ঠিক হবে না তাহলে আমিই সরে দাঁড়াব । আপনারােব বিয়েটার তাতে হয় না হয়, আমি লক্ষ্যপ করি না । এমন কি চাকরিরও তোয়াক্কা করি না আমি ।

—বেশ, বল তোমার কথা ।

রঞ্জন বলতে থাকে—

সে স্বীকার করে, ই্যা জরুরী সোমকে আগের দিন সে যেভাবে আলিঙ্গন করেছিল সেটা—যাকে বলে প্রেমীলা পট্টনায়েকের ভাবায় ‘রিয়্যাল এম্ব্রেসিং’—অকপট ‘নিবিড় আলিঙ্গন’ । কিন্তু নির্লজ্জ ভাবণে রঞ্জন বলল, বিশ্বাস করুন অতসীদি সেই ঋণমুহূর্তে আমি ছুনিয়াকে ভুলে গিয়েছিলাম । আমি যখন অভিনয় করি তখন আমি ভুলে যাই যে, আমি রঞ্জন চক্রবর্তী । এভাবেই শুরু কাছে শিখেছিলাম । অভিনয়কে আমি ভালবাসি, প্রাণ দিয়ে ভালবাসি । তাই সেদিন

রিহার্সালে আমি যখন তুম্বাকে জড়িয়ে ধরেছিলাম—মাইও য়, অন্নভী সোমকে
নয়—আমার জীকে—তুম্বাকে, তখন তার মধ্যে কীকি কিছু ছিল না।

বাধা দিয়ে অতসী বললে, কিন্তু আজ ?

—আজ—আপনি যাই মনে করেন অতসীদি—আজ তুম্বাকে দেখতে পাইনি
রিহার্সাল-কমে। আপনাকে বরাবর দেখতে পাচ্ছিলাম—তুম্বা নয়, অতসীদি—
আমি অভিনয়ের অভিনয় করেছিলাম। ব্যাপারটা আপনাকে ঠিক বোঝাতে
পারব না—

অতসী গভীরভাবেই বলল, না বন্ধন, আমি বুঝতে পেরেছি। তাহলে কী
করতে চাও ?

—আপনি যা বলবেন। আমি থিয়েটার করতে ভালবাসি—আপনার
বড়বাবু মতই আমি থিয়েটার-পাগল মানুষ—কিন্তু সেটা এতবড় কিছু নয়,
যাতে—

—যাতে ?

—কী বলব ? যাতে আপনি বা আমি বিড়খিত হই।

—আমার বিড়খনার প্রশ্ন আসছে কোথা থেকে ?

—আসছে। আমি যদি অভিনয়ের অভিনয় না করে সত্যি অভিনয় করতাম
তাহলে আপনি বিড়খিত হতেন—যেমন হয়েছেন অন্নভী দেবী—হয় তো সর্বসমক্ষে
আপনি আমাকে চড় মেয়ে বসতেন ! আপনি আমাকে অব্যাহতি দিন অতসীদি ;
আমি অভিনয় শিল্পকে সত্যিই ভালবাসি। ঝাঁর কাছে এ শিল্পে আমার হাতেখড়ি
—যিনি আমার গুরু, তাঁর কাছে আমি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ : যদি বুঝতে পারি নাটক-
বর্ণিত চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম হতে পারছি না তাহলে পরিচালকের অশ্রুযুক্তি নিয়ে
সরে আসব ; অন্য কোনও অ্যাকটারকে চান্স দেব।

স্নান হাসল অতসী। বললে, কিন্তু তাতেও তো কারও কোনও লাভ হবে না
কেন। তুমি হার মানবে, থিয়েটারটা নিকৃষ্টতর হবে অথচ আমিও বিড়খনার
হাত থেকে মুক্তি পাব না—তোমার বদলে আর কারও বাহুবল আমাকে নিশ্চেষ্ট
হতে হবে। কারণ তোমার মত এক কথার হার মেনে আমি পিছু হটে আসব
না। আমার কাছে অভিনয় অভিনয়ই !

বয় এসে খাবার দিয়ে গেল। অতসী দু-কাপ চায়ের অর্ডার দিল। হাত
খড়তে দেখে নিল কটা বাজে। তারপর বললে, জবাব দিলে না যে ?

—জবাব আমি কি দেব বলুন। আপনি বলুন, আমার কী কর্তব্য ?

—প্রাণ দিয়ে কল্যাণের চরিত্রটা অভিনয় করা—এছাড়া কী ? অভিনয়ের

প্রয়োজনে ঐ ঋণকর্ত্তে তোমাকে মনে করতে হবে আমি তোমার অন্তর্ভুক্ত নই, আমি তোমার চেয়ে বয়সে বড় নই—আমি তুমি এবং তুমি আমার স্বামী। পারবে না? রান হাসল রঞ্জন। বললে, পারব। আপনি পারবেন? তুলে যেতে যে আমি রঞ্জন চক্রবর্তী নই। কল্যাণ! আপনার স্বামী?

—আমাকে পারতে হবে। চাকরির মায়ায় নয়, অভিনয় শিল্পের মুখ চেয়ে।

রঞ্জন বললে, তাহলে আপনাকে একটা গল্প বলি অন্তর্ভুক্ত। বছর খ'নেক আগে 'কথাকলি' নামে একটা সৌখীন দলের হয়ে আমি অভিনয় করি। ওরা শরৎবাবুর 'বিপ্রদাস' ধরেছিল। আমার ছিল বিপ্রদাসের পাট—সেখানেই আপনাদের বড়বাবুর সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ। গ্রীনরুমে এসে কংগ্যাচুলেট করে গিয়েছিলেন। আমার 'অপজিটে' 'বন্দনা' কে করেছিলেন জানেন? বিখ্যাত অভিনেত্রী কেতকী বসু!

—তাই নাকি? তুমি অভিনয়কালে তুলে যেতে পেরেছিলে তো যে তিনি কেতকী বসু নন, বন্দনা?

—তাই তো বলছি। তিনিও এক হিসাবে আমার নাট্যাগুরু। প্রথম দিন রিহার্সালে গিয়েছি। ক্লাব সেক্রেটারী আনন্দবাবু আলাপ করিয়ে দিলেন, মিস বসু, এই ভদ্রলোক বিপ্রদাস করছেন, এঁর নাম রঞ্জন চক্রবর্তী। আমি হাত তুলে নমস্কার করে বললাম, আপনার অপজিটে অভিনয় করতে হবে শুনে খুঁসে ঘাবড়ে গিয়েছিলাম—

—কেন আমি কামড়ে-টামড়ে দিই বলে এ-পাড়ায় বন্দনাম আছে নাকি?

হেসে হেসেই বলেছিলেন তিনি। তারপর প্রথম দিনই রিহার্সালের পরে বললেন, একটা কথা রঞ্জনবাবু! আপনি নর্মাল হতে পারছিলেন না কেন এখন তো? অস্ত্রান্ত মীনে দিব্যি বাস্তবিক অভিনয় করছিলেন অথচ আমার সঙ্গে যেখানে-যেখানে ডায়ালগ সেখানেই আপনি আড়ষ্ট।

আমি সসঙ্কোচে বলেছিলাম, মুশকিল কি হয়েছে জানেন, আমি কিছুতেই ভুলতে পারছিলাম না যে, আপনি বিখ্যাত অভিনেত্রী কেতকী বসু।

উনি বললেন, কিন্তু তাহলে তো চলবে না। মনের মধ্যে অমন ইন্কিহিঁদ্রিটি কমপ্লেক্স নিয়ে সার্থক অভিনয় করা চলে না। এ আড়ষ্টতা আপনাকে কাটিয়ে উঠতে হবে।

আমি পুনরায় সঙ্গক্ষে বলেছিলাম, চেষ্টা করব।

—আমিও তোমাকে সাহায্য করব রঞ্জন। প্রথম স্টেপ হচ্ছে, তুমি আমাকে নাম ধরে ডাকবে, এবং 'তুমি' বলবে, বুঝলে?

আমি অবাক হয়ে বললাম, সর্বসমক্ষে ?

—কতি কি ? তুমি তো আমার চেয়ে বয়সে বড় ? কেউ কিছু মনে করবে না।

আমি বলেছিলাম, এক সপ্তে রাজী আহি কেতকী দেবী। অভিনয় শেষ হয়ে গেলে আমি আবার ‘কেতকী দেবী’ বলব, ‘আপনি’ বলব।

উনি হেসে বলেছিলেন, সে তোমার যা খুশি।

গল্প শেষ হলে অতসী বললে, এখনও কি তুমি তাঁকে নাম ধরে ডাক ?

—না। প্রব্রট। অবৈধ। সে সুযোগই আর আসেনি জীবনে। এই এক বছরে তিনি আরও দূরের মানুষ হয়ে গেছেন। তাঁর খ্যাতি আরও বেড়ে গেছে। ঐ অভিনয়-রঙ্গনীর পরে তাঁকে মাত্র একবারই দেখেছি। ওঁর একটি ফিল্মের ‘প্রিমিয়ার শো’তে। আমি ছিলাম নিচের হলে, উনি ব্যালকনিতে। আমি ওঁকে দেখতে পেয়েছিলাম, উনিও পেয়েছেন কিনা তা বুঝতে পারিনি। অভিনয় শেষ হলে আমার সামনে দিয়েই ওঁরা নেমে চলে গেলেন—আমার সাহস হল না ডাক দিতে। যে ভক্তমহিলা তাঁকে নাম ধরে ডাকবার অধিকার দিয়েছিলেন মাত্র একবছর আগে, ষাঁর সঙ্গে প্রেমাভিনয় করেছি, তাঁকে ‘মিস বক্স’ বলেই ডাকবার সাহস সেদিন সঞ্চয় করতে পারিনি। যদি তিনি চিনতে না পারেন ?

যেন একটা ভা—রী ট্রাজিক গল্প শুনিয়েছে। বিজ্ঞান-বন্দনার অসুযোগের অপমৃত্যুতে, ওরা এক মিনিট নীরবতা পালন করছে যেন। ইতিমধ্যে বর এসে দু কাপ চা-খাবার রেখে গেছে টেবিলে। অতসী চায়ের কাপটা টেনে নিয়ে বললে, তোমার গল্পটার মর্যাদা কী রঙ্গন ?

—মর্যাদা। মর্যাদা তো এইটাই যে, অভিনয় শিল্পকে যদি গ্রহণ করতে হয় তাকে পুরোপুরি মনে প্রাণে গ্রহণ করতে হবে।

—আর কিছু নয় ? আমি ভেবেছিলাম অন্ত কিছু।

—অন্ত কিছু মানে ?

—তুমি বুদ্ধি কায়দা করে আমার অসুখতি চাইছ—নাম ধরে ডাকার এবং ‘তুমি’ বলে কথা বলার। স্বামীজীর দাবী ফলানো—

রঙ্গন জবাব দিল না। নিঃশব্দে চায়ের কাপটার দিকে তাকিয়ে থাকে।

অতসীই আবার বলে, কী হল ? হয় স্বীকার কর, নয় প্রতিবাদ কর।

রঙ্গন মুখ তুলে তাকায়। বলে, দুটোই হবে মিথ্যাচরণ। প্রথমত সে উদ্বেগ নিয়ে গল্পটা আপনাকে শোনাইনি ; দ্বিতীয়ত, এখন মনে হচ্ছে : শুটি মে রিয়ারলি হেলপ্।

—কী ? তুমি আমাকে 'অতসী' বলে ডাকবে সর্বসমক্ষে ?

রঞ্জন হাসল।

কেমন যেন কৌতুক বোধ করল অতসী। বললে, এস মাঝামাঝি রকম করি। আমি বুঝতে পেরেছি তোমার অস্বাভাবিকতা : পেটে কিংক, মুখে লাজ ! শোন, সর্বসমক্ষে তুমি আমাকে অতসীদিদি বলেও, 'আপনি' বলে কথা বলবে—অনাস্তিকে আমাকে নাম ধরে ডাকতে পার, 'তুমি' বলেও কথা বলতে পার।

মুখটা উজ্জস্ব হয়ে উঠল রঞ্জনের। বললে : থ্যাঙ্কস !

অতসী ধমক দেয়, আবার বলে—থ্যাঙ্কস ! মেদিনই বলেছি না, দিদিকে 'থ্যাঙ্কস' দিতে নেই ?

—আমায় সরি !

সম্পূর্ণ বদলে গেছে রঞ্জন। একগাল হেসে বললে, এটাও কিছ ভুল বললাম অতসী। দিদিকে তো বলছি না এখন, বলছি—'তুমি'কে। প্রেম করছি যে। তাই 'সরি' বলার অধিকারও আমার নেই।

নিজের অজান্তেই গারে কাঁটা দিয়ে উঠল অতসীর। চৌরঙ্গীর পর্দা-ঘেরা কেবিনে সে একটি ছেলের সঙ্গে প্রেম করছে—এই আঁঠাশ বছরের জীবনে—হোক অভিনয়, তবু কেমন যেন অস্বাভাবিক বোধ করে। বেশ অস্বস্তি করে পাগল ছেলেটার দৃষ্টি, তার হাসি, তার আঁচুড়াত মুহূর্তে বদলে গেছে। ছেলেটা একটু অস্বস্তির—কবিতা লেখে, অভিনয় পাগল, অস্বস্তি জাতের। প্রেম করার অস্বস্তি পেয়ে সে অস্বস্তি এক রঞ্জন হয়ে গেছে। পকেট থেকে সিগারেট দেশলাই বার করে। ও যে সিগারেট খায় এটা জানাই ছিল না অতসীর। দিকি মুক্কি চালে দেশলাইয়ের উপর সিগারেটটা বারকত হঠক রঞ্জন বললে, তুমি জান অতসী, কেন 'সরি' বলার অধিকার আমার নেই ?

কঠিনাঙ্গী শুকিয়ে উঠেছে অতসীর। পাগল ছেলেটা এরপর কী করে বলবে তার কি স্থিরতা। আমতা আমতা করে বললে, না। কেন ?

—বলতে পার কে বলেছিল, Love means not ever having to say you're sorry. ?

—না। কে বলেছিল ?

—একটি মিউকেমিয়ার কণী। বলেছিল তার স্বামীকে। এবার বল কোথা থেকে ? কুইজ টেস্ট হচ্ছে। পাঁচ সেকেন্ড। টিক-টক-টিক-টক-টিক-টক...

অবার দেবার মত অবস্থা নেই তখন অতসীর। সে যে রঞ্জনের চেয়ে বয়সে

বড়, পাঁচ মিনিট আগেও ছোট ভাইয়ের মত বন্ধুকে ধমক-ধামক দিয়েছে এসক
কথা শুয় মনেও পড়ল না। ছোট্ট মেয়ের মত মাথা দু'লগ্নে বললে, জানি না।
কোথা থেকে ?

—এরিক শোগলের : Love Story !

তারপর প্রায় এক মাস কেটে গেছে। এই এক মাসে না-হক দশ বারো বার
ঐ ছোট্টোর বাহুবন্ধনে ধরা দিতে হয়েছে অতসীকে। সবসময়। উন্নত
শ্রীমা-লেখার দল জানতে চায়নি বন্ধনের আলিঙ্গন পাশ 'বিয়েল এমব্রেসিং'
কি না। প্রস্তুত করতে সাহসই হয়নি তাদের। ব্যাপারটা যে নাট্য 'মোদ' মনোজ
ঘোষের অজানা নয় তা আজ টের পেল অতসী, তাঁর ঐ বখাটার : তুমি-ন-রকে
একটি সোচ্চার প্রতিবাদ করেছে বলে। আই কংগ্রাচুলেট যু অ্যান্ড এ ড্রামা-
লাভার !

। ৫ ।

এই এক মাসে অতসীর নিজেরও বেশ কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে। প্রথমটা
নিজের কাছে স্বীকার করেনি—অশালীন-চিন্তা বলে মনের মধ্যে-জাগা প্রস্তুতকে
অবচেতনের গভীরে ঠেলে ফেলে দিয়েছিল। কিন্তু মন জিনিষটা তারো পাশী
যে চিন্তাটাকে শুভবুদ্ধির লগ্নি দিয়ে জাগর চিন্তায় ঠেসে ধরবে—নিজের অবকাঠ
সেটাই ঠেলে উঠবে স্বপ্নের মধ্যে। অবচেতনের তির্যক বাসনা চরিতার্থ করার
ঐ এক পটভূমি—স্বপ্নের রঙ্গমঞ্চ। সেখানে ও তার আঠাশ বছরের গভীর
নিরে অটল থাকতে পারে না, নিজস্ব ছেলেমানুষ হয়ে ওঠে। তাগো স্বপ্নজগতের
কথা আর কেউ জানতে পারে না।

দু-এক সপ্তাহ পার করে অতসী বুকল : এভাবে হবে না। অবচেতনের সঙ্গে
একটা সমঝোতায় আসতে হবে। হতভাগাটা কী চায় ? কী ভাবে তাকে বাঞ্ছা
জানা যায় ? সত্যি তো আর সে ঐ এককোঁটা ছেলেটাকে—

মনোবিশ্লেষণ করে অতসী বুঝেছে, অবচেতন মন এতদিনে একটা কী-
বাক্যের খেলার যেতেছে। কুনালের জায়গায় সে বন্ধনকে প্রতিষ্ঠা করতে চায়।
কুনাল সবসময় সে সংযত হতে পেরেছিল। বন্দনাকে বিবাহ করার পর কুনাল
কথাটা সে ভুলে যেতে পেরেছে—তাই অবচেতন মন-ব্যাটা এখন প্রতিশোধ নিতে
চায়। শুকে অপদস্থ করতে চায়।

অতীতর অতীতরই—কিন্তু সেই পরিস্থিতিতে মন ব্যাটা বাধা থাকতে চায় না। সে আরও সুযোগ পেয়েছে রজনকে ছাউপত্র দেওয়ায়। রজনের এখন বৈতস্ক্য। সর্বসমক্ষে সে অতসীর ছোট ভাই—একান্তে সে তন্দ্রার স্বামী। মাঝে মাঝে অতসীর মনে হয়—পাগল ছেলেটাকে ওভাবে লাই দেওয়া ঠিক হয়নি। আবার পরক্ষণেই মনে হত, না! রজন কোনও অত্যাচার সুযোগ নেবে না তার বদান্ধ-তার। কিন্তু ওর আচরণটা বিসদৃশ। অফিসে সে অতসীদির কাছে কাজ বুঝে নেয়, অফিস ছুটির পর ট্রাম-স্টপেজে চুপচাপ অপেক্ষা করে। অতসী এলেই দলে, চল কোন চায়ে দোশানে ঢুকি।

অতসীর ভয় করে। এই ধেডে বয়সে কলক রটবে বলে নয়, হাসির খোরাক যোগাতে হবে বলে। ঐ যে কথা বডু মামা আজ সকালে বলেছে : তোর লজ্জা করে না হাঁটুর বয়সী একটা ছেলের সঙ্গে বেলোপনা করতে!

না! রজন ওর হাঁটুর বয়সী নয়, বেলোপনাও সে কিছু করছে না; কিন্তু যেটা করছে সেটাই কি স্ক্রটিসম্মত? 'কটি' বস্তুটা দেশ-কাল-সমাজ নির্ভর। যে সমাজে ওরা বাস করে সেখানে রিহার্সাল-ক্রমে সর্বসমক্ষে রজন চক্রবর্তীর বিয়্যাল এম্ব্রেস-টাও স্বীকার্য; কিন্তু জনান্তিকে তার 'ফেক-লাভ স্টোরির' উদ্ভৃতি শোনাটা অপরাধ! সেটা সামাজিক নির্দেশ, অতসীর আন্তরিক মায় নেই তাতে। তার মনে হয়েছিল—যে কারণে ঐ অনাত্মীয় যুবকটির বাহুবন্ধে ধরা দেওয়াটা সামাজিক অপরাধ নয়—যেহেতু নাট্যশিল্পে একালে সেটা গ্রাহ্য, ঠিক সেই কারণেই ওর এ ছেলেমানুষীটাকে মেনে নেওয়াও অপরাধ নয়। ছেলেটার মানসিক প্রস্তুতিতে সাহায্য করাও তার কর্তব্য—ঐ নাট্যশিল্পের দোহাই দিয়েই। না হলে রজন চক্রবর্তীর তন্দ্রা যায় হারিয়ে, উপস্থিত থাকে মূর্তিমতী অতসী রায়। যুক্তিটা সাধারণ মানুষকে বোঝানো যাবে না, হয়তো মনোজ ঘোষ বুঝতেন। অতসী বুঝেছিল। এ শুধু রজনের মুখ চেয়ে।

কিন্তু শুধুই কি তাই? মনের অগোচরে পাপ নেই! অতসী যে 'নজেকে' অস্বীকার করতে পারে না। নিজের অনুভূতিটাকে। দ্বিতীয় দিনে প্রমীলার রসিকতাটার সে ছোট্ট কিশোরী মেয়ের মতই রাড়িয়ে উঠেছিল। প্রমীলা বলেছিল, স্কিন্ডার চক্রবর্তী, আপনার পাঞ্জাবিতে সিঁহুরের দাগ লেগেছে। ওটা ভালো করে মুছে ফেলুন! বাড়ির লোক না হলে ভুল বুঝবে!

বেখা বিশ্বাস যথায়োতি খিলখিলিয়ে হেসে উঠেছিল—মানে?

অতসী চোখ তুলে দেখেছিল : সত্যিই। ওর কপালের টিপ রজনের পাঞ্জাবিতে একটা দাগ দিয়েছে!

অমুভূতিটা স্বীকার করে কি করে ? সে জয়ন্তী লোম নয়। ওর আঠাশ বছরের জীবনে এ অভিজ্ঞতা হয়নি। প্রদীপদাকে ভাল লেগেছিল; তখন ও কিশোরী, কিংবা বালিকাই। প্রদীপদা বেশী দিন বাঁচেনি। কোনদিন তার বাহুবদ্ধে ধরা দেবার প্রশ্নই ওঠেনি। কুনাল দু-একবার ওর হাত দুটি ধরেছে; কিন্তু রক্তনের মত সবল আলিঙ্গনে বুকে টেনে নেয়নি কোনদিন। সেদিক থেকে কুনাল ছিল খুবই পিউরিটান। মন জানাজানি হবার পরেও সাহস করে কোনদিন অতসীকে চুমু খায়নি। ফলে ওর আঠাশ বছরের অনাদৃত যৌবন সত্যিই শিউরে উঠেছিল তৃতীয় মহড়ার দিন, যখন কল্যাণ তার তস্রাকে সবলে বুকে টেনে নিয়েছিল। ওর বাহুবদ্ধে সত্যিই ধরধর করে কেঁপে উঠেছিল অতসী। মনোজ্ঞদা বলেছিলেন, ওয়াণ্ডারকুস ! আজ অভিনয় যা করলে অতসী, সিম্পলি সুপার্ব !

অতসী মরমে মরে যায়। অভিনয় ! অভি-পূর্বক নি-খাত্ত অল ! 'নি'কটে আসতে পারার মৌভাগ্যে সে যে নিজেই 'অভি'ভূত। কী বলবে ? কেমন করে স্বীকার করবে আত্মসমর্পণের যে ব্যঞ্জনা তার সর্বাত্মক ফুটে উঠেছে তা আদৌ অভিনয় নয়—তা একটা, ছি ছি ছি,—তার আঠাশ বসন্তের উপেক্ষিত স্বপ্নে-দেখা এক অমুভূতির বাস্তব প্রকাশ ! একটা প্রচণ্ড যন্ত্রণামেশানো আনন্দের অভিযাত্রি। ভয়ে ভয়ে সে মুখ তুলে দেখেছিল—রিহার্সাল-রুমে উপস্থিত সকলের দিকে। আশ্চর্য ! কী মূর্খ মানুষগুলো। কেউই ধরতে পারেনি অপরাধীকে। সকলেই একবাক্যে সমর্থন করেছিল বড়বাবুকে—তস্রার চরিত্রটা সুন্দর করতে পারছে অতসী।

বোধহয় রক্তনও বুঝতে পারেনি কিছু। অস্বস্ত কথাবার্তার স্বীকার করেনি। রক্তন ছেলেটা সত্যিই পাগল ! তার চোখে অভিনয়কালে অতসী অতসী নয়, সে তস্রা। তার স্ত্রী, তার কামনার ধন। অতসীকে সে দেখেও দেখতে পার না, দেখে তস্রাকে। কিন্তু অতসীর নিজের দৃষ্টিভঙ্গি খেঁ ? মনকে চোখ ঠেরে লাভ নেই। নিজের মনের মুখোমুখি যখন নির্জনে দাঁড়ায়—পাশবালিশ জড়ানো ঘুম-ন-আঙ্গা রাতে, বাপের জানলার মাথা রেখে হ হ করে বাড়ি ফেরার পথে, কিংবা রক্তনর আনন্দের বিবসনা অবস্থার—তখন শিউরে ওঠে কপে কপে। স্বীকার করতেই হয়—ঐ দীর্ঘকায় পুরুষটার বাহুবদ্ধে যখন ধরধর করে কেঁপে উঠেছিল তখন সে তার নাট্যকথিত স্বামীর আলিঙ্গনে ধরা দেয়নি, কল্যাণ-কুনালের বাহুবদ্ধেও নয়—ওর অমুভূতিতে সে পুরুষটা ছিল নিতান্তই রক্তন চক্রবর্তী—সেই খেয়ালী, তাৎপ্রবণ, নাটক-পাগল, কবি।

ছি ছি ছি। এ কী কাণ্ড করে বসেছে অতসী। ছনিয়া জানে না, ছনিয়া জানবে না কোনদিন—তীক্ষ্ণদৃষ্টি প্রমীলা-জয়ন্তী-রেখার দল পৰ্বন্ত ধরতে পারেনি, বরেনও টের পারিনি—কিন্তু অতসী জানে, অভিনয়ের অচ্ছিন্ন এ-এক সর্বনাশ। আত্মরতির খেলার যেতেছে সে। আত্মরতি ছাড়া আর কি? যেখানে প্রেমের পাত্র ওর আত্মর অল্পভূতির নাগাল পায় না, অথচ অতসী একক মননে ঐ পুরুষের গায়ের গন্ধ, তার দেহস্পর্শ, তজ্জা-নারক-অপার্থিব জীবের প্রতি প্রযোজ্য প্রেম-কুঞ্জন থেকে উপাদান চরন করে একা-একাই একটা, ইয়া যৌন-অল্পভূতিতে আত্মভূগি পায়, তাকে আত্মরতি ছাড়া আর কী বলা যায়? বিহার্মালের নিমিটিতে তার ভাবান্তর হয়, সকালে ঘুম থেকে উঠেই ওর মনে পড়ে আজ বিহার্মাল আছে। সেই সকাল থেকেই ওর মনের মধ্যে দুই-অতসীর দ্বন্দ্ব শুরু হবে যায়। অতসীর বৈতস্ক্য। মনের একটা অংশ প্রতীক্ষায় গ্রহর গৌনে, দ্বিতীয় অংশ তাকে ক্রমাগত টিটকারি দেয়। এক মন বলে, আজ সাম্প্র করবে বলেছিল না? দ্বিতীয় মন ধমকে ওঠে, লজ্জা করে না ও কথা বলতে? এক মন বলে কত দিন থেকে বলছি একটা সেন্ট কেন; দ্বিতীয় মন প্রতিবাদ করে, তোমা গলায় দড়ি জোটে না?

প্রথম মন সলজ্জ বলে, না, না, তুমি যা ভাবও ত নয়—গরম কাপড় তো, ঘামের গন্ধ হয়! দ্বিতীয় মন মুখ টিপে বলে—তাই বুঝি?

অফিস ছুটির পর প্রমীলা বলল, অতসীদি, আপনি বুঝি আজ বরেনবাবুর বাড়িতে যাচ্ছেন?

—ই্যা, কে বলল?

—বড়বাবু বলছিলেন।

—সল না প্রমীলা, তুমিও চল—একা-একা এতটা পথ—

জবাবটা জানাই ছিল। অতসী জানত, কল্লণ পট্টনায়ক আজ বিবাহে ম্যাটিনী শো'র দুখানি টিকিট কেটেছে। প্রমীলা তখন প্রকাশ করত মনে যেতে পারছে না বলে; আরও বলল, সোমবার আপনার কাছ থেকে জানতে পারব, বরেনবাবু কেমন আছেন।

এম্প্রানেন্ডের মোড় থেকে শ্রামবাজারের বাস ধরল অতসী।

বাসে যেতে যেতে ওর মনে পড়ছিল তিন সপ্তাহের আগের অ'ড্যানটার কথা।

সেটাও একটা শনিবার। অনেক কমানিশান অফিসে আজকাল সপ্তাহে দুদিন ছুটি—শনি-রবি। শুধু এখনিও তা হয়নি। শনিবার হাফ-ছুটি, বেলা

আড়াইটায়। সেবার অতসীকে প্রায় জোর করে ধরে নিয়ে গিয়েছিল রজন। বলেছিল, বৌদি তোমার সঙ্গে আলাপ করতে চান। তোমার গল্প অনেক কঠিন কিনা।

— কেন? আমার গল্প সাতকাহন করে বৌদিকে শুনিচ্ছে কি করতে?

— বাঃ! তুমিই তো আমার একমাত্র বাছবী এ অফিসে!

— তুমি কি বৌদির সামনে আমাকে নাম ধরে ডাকবে নাকি? ‘তুমি’ বলবে?

— পাগল! তাহলেই বৌদি সব বুঝে ফেলবে—

— বুঝে ফেলবে! কী বুঝে ফেলবে?

— যে তোমার সঙ্গে আমি লুকিয়ে প্রেম করছি। তুমি আমার বৌ।

অতসী কণ্টকিত হয়ে ওঠে। কিস্ফিস্ করে কথা বলছে ওরা। বাসের অন্ত্যস্ত যাত্রীরা লক্ষ্য করছে না। তাহলেও পাগল ছেলেটাকে বিশ্বাস নেই। অতসী বলে, সে তো তুমি প্রেম করছ তজ্জার সঙ্গে, আমার সঙ্গে তার সম্পর্ক কী?

— বৌদি সিধাসাধা মানুষ, এত ঘোর প্যাচ বোঝে না।

এই কথোপকথনটা হঠাৎ মনে পড়ে গেল আজ। আর ঐ সঙ্গে কিছু মনো-বিশ্লেষণও করল অতসী। সে কি সেই মুহূর্তে তজ্জাকে ঠেঁধা করেছিল? ওর মনে পড়ে গিয়েছিল কী একটা সিনেমার কথা। স্মৃতিয়া সেন একজন মানসিক রোগীর নার্সের পার্ট করছিল। রোগী ঐ নার্সের মধ্যে দিয়ে দেখতে পেত তার হারানো প্রেমিকাকে। আর নার্স সেই তৃতীয় সত্তার বকলমে প্রেমের অভিনয় করত। অতসীর অবস্থাও আজ যেন সেই রকম। এই আধা-পাগলা ছেলেটা ‘তজ্জা’ নামে একটা অবাস্তব মেয়েকে ভালবাসে। তজ্জার স্বামী আছে, রূপ আছে, যৌবন আছে—আর অতসীকে সে সব কিছুই নেই। তবু সেই অপার্থিব তজ্জাদেবীর সঙ্গে সে একাত্ম হয়ে গেছে। তার চরিত্রটা অভিনয় করে যাচ্ছে একজন খামখেয়ালীর উদ্ভট মানসিকতার খেসারত মেটাতে। এ খাটামোতে কেন রাজী হল অতসী? নাট্যশিল্পের মুখ চেয়ে? ঐ ছেলেটার একটা উদ্ভট খেয়াল চরিতার্থ করতে? নাকি তার নিজস্ব কামনা-বাসনার তির্যক পরিভূষণে পড়ে?

সেবার সন্ধ্যায় এক পাংবেট সন্দেশ কিনে নিয়ে গিয়েছিল। রজনের তাইপো-জাহ্নবী বসে বসে তালপ চাষাভল লুকলের সঙ্গে। রজনের দাদা, বৌদি, স্বামী, সবাই বসে বসে বসে ছিলেন, আপনার কণা রজনকে দেখতে। আপনি

এসেছেন, খুব ভাল লাগছে। আপনাদের থিয়েটারের টিকিট দেবেন কিন্তু
তাই—

অতী বলছিলেন, ও থিয়েটার আর আপনাকে দেখতে হবে না।

—কেন? কেন?

—এই খেড়ে বরসে আমি নারিকার পাট করব—আর রঞ্জন...

লক্ষ্যে ধরে যায়। বৌদি বলেন, একটুও বেমানান লাগবে না। আশ্রমকাল
এমন সুন্দর মেক-আপ দেয় যে, বোকাই যায় না। আর তাছাড়া তোমার
কিঙ্গারটা তো এখনও সুন্দর আছে...ঐ যা, আপনাকে 'তুমি' বলে ফেললাম,
কিছু মনে করবেন না তাই—

—মনে করব, যদি আপনি আবার 'আপনি' শুরু করেন। আমি রঞ্জনের
চেয়ে বড়, কিন্তু আপনার চেয়ে তো ছোট। আপনি আমাকে 'তুমি'ই বলবেন।

...বৌদি খুশি হন। বলেন, বেশ, তাই বলব। তোমার পছন্দ করা শাড়িটা
আম্মার খুব পছন্দ হয়েছে। কী করে বুঝলে আমি লাল কঙ্কাপাড শাড়ি পছন্দ
করি?

—আপনার দেওর বলেছিল।

রঞ্জন আগ বাড়িয়ে বলে, তাছাড়া বৌদিকে লাল কঙ্কাপেড়ে শাড়িতে যা
মানায়। বৌদি ধমক দেন, তুমি আমাদের মধ্যে কেন কোডন কাটতে এসেছ?
মেরে-মহলে কথা হচ্ছে, এখানে ঘুরঘুর করা কেন? যাও, নিজের ঘরে বসে
কবিতা লেখ গে!

অতী অবাক হবার ভান করে বলে, রঞ্জন কবিতা লেখে বুঝি?

—আর বল না তাই। ও একটা বড় পাগল।

ধমক খেয়ে রঞ্জন ইতিপূর্বেই পালিয়েছে। তাই বৌদি রঞ্জনের যাবতীয়
পাগলামির বিস্তারিত বিবরণ দিতে থাকেন। তিনি যখন এ সংসারে আসেন
তখন রঞ্জন ক্লাস এইটে পড়ে। তার আগেই শান্তী গত হয়েছেন, খন্তর মাঝে
যান আরও বছর দুই পরে। সুতরাং বৌদির মাধ্যমেই রঞ্জু তার মাতৃস্নেহের
স্বাদ পেয়েছে।

অতী বলছিলেন, এবার দেওরের বিয়ে দিয়ে দিন। চাকরিতে তো ঢুকেছে।
এখন সংসার হলে ঐ সব পাগলামি ঘুচবে।

বৌদি বলেছিলেন, চাকরি কোথায় তাই? ও তো তিন মাসের নীত-
ভেকেসি। একটু স্থায়ী না হলে কি দায়িত্ব চাপানো উচিত হবে? তাছাড়া
ছেলেটা...

স্বাক্ষরপেই খেয়ে যান। অতসী বুঝতে পারে। এসকটা সে খাতে দেয় না। বলে, তনেছি। রন্ধন নিজেই বলেছে। বাবে বাবে ঘুরে ফিরে অরে পড়ে। কী ব্যাপার? ঠাণ্ডার খাত?

কেখন যেন মান হয়ে গিয়েছিলেন বৌদি, না তাই। ব্যাপারটা বোঝা যায়নি। অনেক ডাক্তার-বড়ি দেখানো হয়েছে। কেউই করতে পারেনি। গ্যাঙ-মাংগ কোলে, গারে হাতে ব্যথা হয়। অরের ভাড়সে বেহাশ হয়ে পড়ে থাকে। আবার ঠিক হয়ে যায়।

অতসী ইতস্তত করেছিল। 'খরো চেক-আপের' কথাটা সত্যোচনায় করতে পারেনি। সে এসক তো রন্ধনের সঙ্গে আগেই হয়ে গেছে। অত্যাধিক সংসারে রাজকীয় চিকিৎসা একটা বিলাস।

বাড়ীখাটির মোড়ে বাগটা এসে রন্ধন থামল তখন পড়ত বেলা। নামনেই একটা বাজার। চারের হোকানে একটা চাপ ভিড়। শনিবারে কী বুদ্ধি চ্যাবিটি খেলা হচ্ছে ময়দানে; তাইই ছিল হচ্ছে বেতারে। ভিড় এড়িয়ে অতসী বড় রাস্তা ধরে এগিয়ে চলে। ওদের বাড়িটা বাস-স্ট্যাণ্ড থেকে প্রায় আধমাইল ভিতরে। রিক্সা নেবার ব্যবস্থা নেই। যেটাই পাড়ি দেওয়া যাবে। কলকঠে সাইকেল রিক্সার কীক চলেছে। অতসী থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। নামনেই একটা মিষ্টির দোকান। কিনে নেবে নাকি কিছু? নাঃ। প্রতিদিন মিষ্টির প্যাকেট নিয়ে গেলে ওরা অযোগ্যতা বোধ করতে পারেন—কেখন যেন কুটুম-কুটুম লাগে তাতে। তাছাড়া অসুস্থতার খবর পেয়ে আজ দেখা করতে যাচ্ছে—

ঠিক তখনই নজর পড়ে এ-কোনার একজন মূল বিক্রি করছে। রজনীগন্ধা, বেলফুলের মালা, দণ্ডকমল আর গোলাপ। হঠাৎ বুদ্ধি খুলে যায়। 'বৌদির সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার সময় মূল নিয়ে যাওয়া চলে। অতসী এক গুচ্ছ গোলাপ কিনল এক ডজন। দাম মিটিয়ে গোলাপের তোড়াটা হাতে নিয়ে কেখন যেন লজ্জা লজ্জা করছে। কাজটা কি ঠিক হল? কেন নয়? এর মধ্যে লজ্জা যাওয়ার কী আছে? আলতো করে তোড়াটা বুকের কাছে চেপে ধরে অতসী চলতে থাকে।

রাস্তা চিনতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। বড় রাস্তাটাই এঁকে বঁকে এগিয়ে গেছে নতুন গড়ে ওঠা কলোনির বুক চিরে। দু-বশ বছর আগে অকলসটা ছিল মজা পুকুরে ভরা—আশুশ্যাওড়া আর আকনের ঝোপে আকর্ণ। ইতিমধ্যে গড়ে উঠেছে নতুন নতুন বাড়ি, এমনকি শহরে হাল ক্যানালের বাসও। বিস্ময়

পথে এঁকে বেঁকে নির্দিষ্ট বাড়িটার সামনে এসেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল অতসী।

রক্তনদের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে একখানা কালো রঙের মহিন আইনর। এতে অবাক হবার কি আছে?

.. আছে। বাড়ির নম্বর-প্রটটা অতসীর অতি পরিচিত।

কোনও কার্য কারণ সম্পর্কের ইতিমধ্যে পার না সে।

বাগানে কবরী গাছতলার চূপচাপ দাঁড়িয়েছিল শান্তা—রক্তনের ভাই-বোন। সে দেখতে পেল অতসীকে। উল্লাসে চীৎকার করে উঠল না : মা, ডাখো কে এসেছে।

বন্ধু পারে পারে এগিয়ে এসে কাছে। দুখটা খসখস করছে তার। অতসীর হাতখানা টেনে নিয়ে বললে, ডাক্তারবাবু এসেছেন। কাকামণিকে দেখতে।

সহিংস করে পার অতসী। বলে, কেমন আছেন ডাক্তারমণি?

—জানি না!

সত্যই জানত না সাত বছরের মেয়েটা। কাকামণির জর নেই, হাসিঠাট্টা সবই করছে, বালি খায় না, ভাতই খাচ্ছে অথচ শহর থেকে বড় ডাক্তার তাঁকে দেখতে এসেছে। এক্ষেত্রে সে কী করবে? কাকামণি ভালো আছে, না—না?

অতসী তার হাতটা ধরে বলে, এস ভিতরে যাই।

—না। জাননি যান। আমি এখানে থাকব।

অতসী নীড়াপীড়ি করল না। ছোট বাড়ি। বোম্বের ওর মা তিফু কমা-বার জন্তে শুকে বলেছে—মা খেলুগে মা। মেয়েটা জানে, এখন খেলতে নেই। খেলার ইচ্ছাও তার নেই। কিন্তু ডাক্তারবাবু বিদায় না হলে সে ভিতরে যাবে না।

কক্ষের বেড়া দেওয়া গেটটা পার হয়ে, ইট-বাঁধানো পায়ে-চলা পথটা অতিক্রম করে বৈঠকখানার তুকেই আর একটা থাকার খেল অতসী। আর একজন অপ্ৰত্যাশিত আগন্তুক। কেমন যেন অমঙ্গলের একটা ছায়া ঘিরে ধরে শুকে। লোকটা জপয়া—বিশেষ করে অতসীর জীবনে। এই লোকটাট কীসক হিসাব করে নিদ্রান হেঁকেছিল : অতসী বিষকণ্ঠা!

—ভাই! এখানে? কী ব্যাপার?

অতসী সামলে নিয়ে বললে, রক্তনবাবু আমাদের অফিসেই চাকরি করেন।

—অ! তা যাও, ভিতরে যাও। কুনল এসেছে শুকে দেখতে।

“অতসী প্রমটা না করে পাবল না, আপনি এদের চিনলেন কেমন করে ?

—৬ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা মা। রক্ত-রক্তনের গর্তধারিণী আবার কাছে ময়দীকা নিয়েছিলেন। যাও ভিতরে যাও—

অতসীর ইচ্ছা ছিল না ভিতরে ঢুকতে। অতঃ এই মুহূর্তে। তাকে একটু সামলে নিতে হবে। কিন্তু ঠাকুরমশাই বারে বারে তাগাদা দেওয়ার মে ঘরের বিপরীত দিকে এগিয়ে যায়। তাছাড়া ঐ কয়লাকিছরের মুখোমুখি এই বৈঠকখানাতে বসে থাকার কোন সাহস নেই।

সামনেই রুমীর ঘর। পর্দা সরিয়ে প্রবেশ করে দেখল, ঘরে কুসান এক রক্তনের দাদা দাঁড়িয়ে আছেন। কুনাল একটি ভাঙারী বাগে কিসব জুড়িয়ে তলছিল—বারপ্রান্তে নিঃশব্দে কে এসে দাঁড়িয়েছে, তা সে নজরই করেনি। সে চমকে ওঠে—রোগীর কণ্ঠস্বরে—পিঠে—বালিশ দিয়ে রক্তন আশশোয়া হয়ে বসেছিল খাতে। হঠাৎ বারপাথে দৃষ্টি পড়ায় সে উজ্জ্বলিত হয়ে ওঠে : এসেছ ? আমি জানতাম আজ তুমি আসবে। বাঃ। কী সুন্দর গোলাপ! আবার জন্ম এনেছ নিশ্চয় ? দাঁও, আমাকে দাঁও।

কুনাল মুখ তুলে-তাকায়। এবং তৎক্ষণাৎ চমকে ওঠে। অস্বুটে বলে, তুমি।

সে কথা কানে যায় না কারও। রক্তনই এক মাগাড়ে বলে চলেছে, আবার মন বলছিল আজ তুমি আসবে। আজ শনিবার তো। অফিস ছুটির পর তুমি নিশ্চয়ই...

হঠাৎ রক্তন বুদ্ধি অস্বভাব করে, কোথায় কী একটা বিসদৃশ ব্যাপার ঘটে গেছে। থিয়েটারের ভাষায় থাকে বলে ‘ক্রিজ’ হয়ে যাওয়া। ওর চোখের সামনে গোটা রক্তমকটাই তেমনি ক্রিজ হয়ে গেছে। থিয়েটার-পাশল রক্তন চক্রবর্তীর বোধ করি মনে পড়ে যায়—রক্তমকে সবাই যখন ‘ক্রিজ হয়ে যায়’ তখন নীরবতাই বাসায়! সেও হঠাৎ চুপ করে যায়।

রক্তন চক্রবর্তীই প্রথমে কথা বললেন, এস ম’, ভিতরে এস।

সলজ্জচরণে অতসী ভিতরে এসে দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়ায়। রক্তনবাবুই পুনরায় বলেন, ভাঙারবাবু রক্তকে দেখতে এসেছিলেন।

তারপর কুনালের দিকে কিয়ে বললেন, রক্তর সহকর্মী, মিস অতসী বার।

কুনাল হাত দুটি বুকের কাছে জড় করে বললে, নমস্কার। আমার নাম কুনাল কহু।

আপাদমন্তক জালা করে উঠল অতসীর। কুনালকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে

হাটের মাঝে হাঁড়ি ভেঙে দিল। রজনবাবুকে বলল, উনি আমার আত্মীয়।
অপরিচিত নন।

রজনবাবু একটু অবাক হয়ে বলেন, সে কি! তাহলে ডাক্তারবাবু যে মেলুক
ইন্সট্রাকশান দিচ্ছিলেন?

কুনালের বুদ্ধির তারিক করতে হবে। তৎক্ষণাৎ সামলে নিয়ে বলে, আমি
ভেবেছিলাম উনি বুঝি আমাকে ভুলেই গেছেন। পরিচয় না দিলে চিনতে পার-
বেন না। সম্পর্কটা কিঞ্চিৎ মধুর কিনা! আমি ওঁর ভগ্নিপতি!

—ও তাই বলুন।

অতসী সমস্ত বিধাৎমক বেড়ে ফেলে বললে, কেমন বুঝলেন ডাক্তারবাবু?

কুনাল লক্ষ্য করল, অতসীর সম্ভাষণে আত্মীয়তাটা স্বীকার করা হয়নি,
অর্থাৎ কুনাল নিজেই যখন অপরিচয়ের দূরত্বে সরে থাকতে চেয়েছিল তখন অতসীই
তাকে সে সুযোগ দেয়নি। কুনাল বুঝতে পারে, ঘটনার আকস্মিকতায় অতসী
তার আভাবিক বুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছে; এক্ষেত্রে সে কী স্ট্র্যাণ্ড নেবে তা স্থির
করে উঠতে পারছে না। কুনাল একবার অতসী একবার রজনবাবুর মুখের দিকে
দেখে নিল। তারপর বললে; খুব কঠিন ব্যাপার! রজনবাবু একটি মেয়ের
প্রেমে পড়েছেন। প্রেমরোগ! চিকিৎসা করা কঠিন।

রজন চক্রবর্তী ধীর পায়ে ঘর থেকে নিজাস্ত হয়ে যান।

অতসীর আপাদমস্তক জ্বালা করে ওঠে। কী একটা কঠিন জবাব সে দিতে
যাচ্ছিল, তার আগেই রজন বলে বসে, ঠিক ধরেছেন ভো! কেমন করে
বুঝলেন?

—আপনার নাড়ি টিপে!

—ঐষধ কী দিচ্ছেন? কিছু তো প্রেসক্রাইব করেন না?

—ঐষধে এ রোগ সারবার নয়, সারবে নাশিংএ! আপাতত তাই মিস-
স্বায়ের হাতে আপনাকে ছেড়ে দিয়ে যাচ্ছি। দেখুন, যদি উনি আপনাকে চাক-
করে তুলতে পারেন!

অতসী কা জবাব দেবে বুঝে উঠতে পারে না। তার কান-মাথা ঝাঁ-ঝাঁ করছে।
কুনাল এগিয়ে আসে। অতসীর হাত থেকে গোলাপের তোড়াটা নেয়।
রজনবাবুর হাতে তুলে দেবার সময় বলে, যদি আপনার আপত্তি না থাকে রজনবাবু,
একটি ফুল আমি নেব?

—নিশ্চয়, নিশ্চয়।

তোড়া থেকে একটি অধক্ষুট রক্তমুখী গোলাপ তুলে নিয়ে কুনাল বলে, তুমি

যে নিজে হাতে আমার বাটন-হোলে পরিবে দেবে এতটা ভরসা করতে পারছি না।
তবু এই আকস্মিক-সাক্ষাতের মধুর স্মৃতি হয়ে আজকর একটা সন্ধ্যা এটা
খানিক না আমার জামার।

নিজে হাতেই কোটের 'বাটন-হোলে' ফুলটা গোঁথে ব্যাগটা তুলে নেয় হাতে।

পদাঠেলে বার হাতেই রজতবাবু এগিয়ে এলেন।

অতলী গুনতে পেল কুনাল তাঁকে বকছে, না না, 'কিস' আমাকে আগেই দিয়ে
'দিয়েছেন কবালীবাবু।

এবার রজতবাবুর কণ্ঠস্বর শোনা গেল, না, না, উনি কেন দেবেন?

—সেটা শুঁও সবাই কবালী করবেন। মোট কথা ছবার ভোঁ কি নিতে
পারি না আমি।

একটু পরেই স্বাক্ষার দিক থেকে আসে এল মরিস্ মাইনর গাড়িটার স্টার্ট
নেওয়ার শব্দ। জানলা থেকে মুখ বাড়িয়ে অতলী দেখল—কুনাল গাড়িটা
চালাচ্ছে, পাশে বসে আছেন কবালীকিহর।

কোণশয়া থেকে রজন ডাকল, এদিকে এস অতলী। বস এখানে।

অতলী চারিদিকে একবার দেখে নেয়। কাছে বসিয়ে এসে বলে, তোমার
কি কোন কাণ্ডজান নেই? সবাই সামনে আমার নাম ধরে ডাকছে কেন?

—কি? আমি?... হ্যাঁ, তাই ভোঁ! খুব ভুল করে গেছে। ঠিক—ম!

অতলী প্রশ্ন করে, বৌদি কোথায়? তাঁকে দেখছি না ভোঁ?

—কি জানি। আছে কোথাও।

অতলী ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসে। পাশের ঘরে উকি মারে, বাইরের ঘরেও।
দেখতে পায় না কাউকেই। আবার ফিরে এসে বসে খাটের একাঙ্গে। কপালে
হাত দিয়ে দেখে। না, জরটা নেই।

রজন বলে, একটু দুর্বল হয়ে গেছি, এই যা। তবু ভাবনার কিছু নেই—
সোমবারে ন হলেও মঙ্গলবার জঘেন করব। 'কল্যাণ' আমি করছি—মনোজনা-
কে বল দাস্ত হবার কিছু নেই। অকিসের আর কি খবর বল?

প্রায় অ'ধঘটা গল্পগুস্তাব করার পর অতলীর খেয়াল হল, সে কপীও ঘরে একা
বসে আছে। এমন ভে' হবার কথা নয়। রজতবাবু হয়তো গুদের এগিয়ে
দিতে 'গিয়েছিলেন তখন, এতক্ষণে তাঁর ফিরে আসার কথা। ছেনে-যেয়ে দুটোই
কি কোথায় গেল? আর সবচেয়ে বড় কথা—বৌদি কোথায়?

আবার উঠে দাঁড়ায় অতলী। বলে, তুমি একটু চুপটি করে শুঁও খান। আমি
দু'খ বৌদি কোথায় গেলেন।

অবশেষে খুঁজে পাওয়া গেল। বাঁরাঘরে। একটা মোড়া টেনে নিয়ে চুপচাপ বলে আছেন। চোখ দুটো জবা ফুলের মত লাল। অতসীকে ঘেঁষে উঠে দাঁড়ালেন। এগিয়ে এলেন, ওর হাত দুটি ধরে কি যেন বলতে গেলেন। পারলেন না। উল্লাসে অঙ্গ ঢাকতে মুখে আঁচল ঢাঙ্গা দিলেন।

অতসী তো অপ্রত্যাশিত একশেষ। কিন্তু খামল না সে। জোর করে চোখ থেকে আঁচল সরিয়ে দিয়ে বললে, কী হয়েছে বৌদি? আপনি এমন করে ভেঙে পড়েছেন কেন?

বৌদি অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নেন। একটা পিঁড়ি পেতে বসে অতসীর জন্ত। বলেন, কাছি ভাই। কিন্তু তার আগে বলন্ত—ঐ ডাক্তার বহু তোমার ভগ্নিপতি?

—হ্যাঁ, কেন?

—কী রকম ভগ্নিপতি? জানে, ওঁর স্ত্রী তোমার কী রকম বোন হয়?

—আমার আপন বোন।

বৌদির মুখ চোখে বিস্ময়ের কোন চিহ্ন ছিল না। বরং তিনি যেন আশঙ্কিত হলেন কিছুটা। ওর হাত দুটি টেনে নিয়ে বললেন, তাহলে আমাদের একটা উপকার করতে হবে ভাই।

—নিশ্চয়ই করব। কী ব্যাপার বলুন তো?

বৌদির কাছ থেকে জানা গেল, ডক্টর বহু আজ রক্ত নিয়ে গেলেন। বলেছেন, সোমবার সকাল দশটার সময় তাঁর ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরিতে গেলে রক্ত পরীক্ষার ফলাফলটা জানা যাবে। বৌদি শুকে অস্বস্তি করছেন—ও কি রক্ত-বাহকের মধ্যে খবরটা এনে দিতে পারে না? রবিবারের সন্ধ্যার দিকে?

—রবিবার সন্ধ্যা আর সোমবার সকালের মধ্যে এমন কি তফাত?

বৌদি কাতর কণ্ঠে বললেন, রক্তের দাঙ্গা আজ দু-দিন কিছু খাননি। বাড়িতে ইাড়ি চড়ে না। রক্তের কাছ থেকে অবশ্য খবরটা গোপন রাখা হয়েছে, কিন্তু এভাবে কি বেঁচে থাকা যায়?

—কী এমন খবর? কী অস্বস্তি হয়েছে রক্তের?

—হয়েছে কিনা তা এখনও জানা যায়নি। তবে আগে যে ডাক্তারবাবু দেখেছেন তিনি সম্ভবত প্রকাশ করেছেন, বলেছেন, রক্তটা পরীক্ষা করাতে। সেই অন্তরেই ঠাকুরমশাই আজ কলকাতা থেকে ধরে নিয়ে এসেছেন ডক্টর বোসকে।

—কিন্তু অস্বস্তিটা কী? জানে, যেটা আশঙ্কা করা হচ্ছে?

—শক্ত নাম। আমার ঠিক মনে নেই—নামটা বোধহয় : লিউনোনিয়।

—নিম্ননিয়া ? হতেই পারে না । সর্দি-কাশি তো ওর নেই ।

—না না, নিম্ননিয়া নয়, রক্তের ক্যানসার— কী যেন নাম...

বিহুংচমকের মত একটা নাম শ্রবণে এসেছে অতসীর । কিন্তু জিহ্বাশ্রে উচ্চারণ করতে সাহস হচ্ছিল না । ওদিকে বৌদি আশ্রাণ চেঁচা করছে খটখট ইংরাজী নামটা মনে করতে । অতসী নিরুপায়ভাবে বলে, নামটা কি লিউকেমিয়া ?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, লিউকেমিয়া ।

অতসী একটা জাস্তব চীৎকারে ফেটে পড়তে চাইল । হু-হাতে মুখ ঢেকে কোনক্রমে আত্মসংবরণ করল সে । এবার বৌদিই তাকে সাহসনা দিচ্ছেন— না না, ঐ শক্ত ব্যাঃমা যে ওর হয়েছে এটা তো প্রমাণ হয়নি । তুমি ভেঙ্গে পড়ছ কেন অতসী ?

অতসী কি বলবে ? কেমন করে বলবে ? বললেও ওরা যে বুঝতে পারবে না । রক্তনের নিশ্চয়ই হয়েছে ঐ চিকিৎসার-অতীত অস্থখটা । সংক্রামক ব্যাধি ।

হ্যাঁ, সংক্রামক । চিকিৎসা বিজ্ঞান কী জানে ? কতটুকু জানতে পারে ঐ কুনাল বহু তার অণুবীক্ষণ যন্ত্রে ? অতসী জানে । মর্মে মর্মে জানে, কেমন করে এই সংক্রামক অস্থখটা প্রবেশ করেছে ঐ অ্যানিমিক মাস্থ্যটায় রক্তকণিকায় । বলবে না ? ও কেন বিষকণ্ঠকে বুকে টেনে নেবার হুঃসাহস দেখালো ? একবার নয়, দুবার নয়—বার বার । অতসী কী করতে পারে ?

বাব-মা তাকে সহ্য করতে পারেনি, প্রদীপদা মরে বেঁচেছে । বড়মামী মৃত ছেনে শুনে ভালবেসেছিল অতসীকে । কুনাল আর বন্দনা পালিয়ে বেঁচেছে— অতসীর ত্রিসাঁমানার মধ্যে আসে না বলেই আতঙ্ক বেঁচে আছে ।

ঐ বোকা ছেনেটা কেন এ ভুল করল ? কেন ভালবাসল নাগিনী কণ্ঠকে ? কেন বারে বারে তাকে আপটে ধরল হু-হাত দিয়ে ?

যেমন কর্ম তেমনি ফল ।

এবার মর ।

সব দরজাটা হাট করে খোলা।

সুইচ জেলে ঘরে ঢুকল অতসী। বলা গাঙ্গুলী এডোএডি হয়ে পড়ে আছে পাসেজটা জুড়ে। শরীর মন ক্লান্ত। তবু রান্নাঘরে উকি মেরে দেখল একবার। মাটসেলফটাও হাট করে খোলা। দুধের বাটিটা উল্টে পড়ে আছে। বডমামা খেয়েছে, না বেড়ালে খেয়েছে, বোঝা গেল না। কটি তরকাবী ছিড়িয়ে আছে ঘরময়। ভাগা ভালো, আজ বডমামা বমি বলে রাখেনি। না হলে এই অবসায় সব সাফ করতে হত।

ওর ঘরটা তাল দেওয়া ছিল। বডমামার ভরসায় এ বন্টা সে খুলে দেখে যায় না। তাল খুলে ঘরে ঢুকল অতসী। জামা কাপড় ছাড়ল। বাতের মাটপোরে শাড়িখানা হাতে নিয়ে বাথরুমে ঢুকল। হোক অবলা, গা ধুলো। জরপর ফিরে এল ঘরে। বিছানাটা পরিষ্কার করল, মশারি খাটালে নিজেও বডমামার। ভেবেছিল বাইরেই কিছু খেয়ে নেবে। ফেরার পথে সে টান্নে আর অবশিষ্ট ছিল না। এক গ্লাস জল গড়িয়ে খেল ঢক ঢক করে। —
বডমামা
ভুলতে গেল বলাই গাঙ্গুলীকে।

—বডমামা! ওঠ, ঘরে গিয়ে শোবে চল।

ছিল ছোট

খানিক ঠেলাঠেলির পর মাতালটা উঠে বসল। ঘোলাটে চোখ তার বিঘর অতসীকে। চিনতে পারল। পকেট থেকে একগুঠো টাকা বার করলে নে ধর। তোর টাকা।

অতসী ওর মুঠি থেকে টাকার গুছিটা নিল। একখানা দশ টাকার করে বাকি খুঁচরো। মাত্র তিন টাকা খরচ হয়েছে। সতের টাকা রয়েছে অবশিষ্ট।

বলাই বললে, দেখলি? বলাই গাঙ্গুলী আর বেসুডে নয়! মাঠর দিকে সে যায়ই না। মাত্র তিন টাকা খরচ করেছে। কালী মার্ক। যা কালীর চিহ্ন।

—ই্যা বুঝেছি! ওঠ, চল, ঘরে গিয়ে শোবে চল।

স্ববোধ বালকের মত উঠে দাঁড়ায় এবার। ভাগ্যর ঘাড়ে একটা হাত রেখে টল্‌তে টল্‌তে এগিয়ে যায়। ঘরে ঢুকলেই আবার থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। বলে, ভাববে না খুঁ! তোকে সকালে গালমন্দ করেছিলেন। না রে?

—কই না তো! বাও তুয়ে পড়।

—এ্যা-এ্যাই! তাই বল! কোন্ শালা বলে বলাই গাঙ্গুলী তার তারিকে
হেনস্তা করে। বড়খুকি তার কত আদরের ব'লে! বড়খুকিই তো আছে তার।
বল? আর কে আছে বলাই গাঙ্গুলীর? তুই বল?

—তা তো বটেই। নাও তুয়ে পড়। আমি মশারীটা গুঁজে দিই।

—হ্যা দে! শ'লার মশাগুলো বড় কামড়ার। ট্যাকাটা তুলেছিস? ঐ
যে কুড়ি ট্যাকা তুই দিবে গিস্‌লি। মাস্তর দু বোতল কালিমার্কী...

—জানি। এই তো বাকি ট্যাকা তুমি দিবে দিলে।

—তবে? বাকি ট্যাকা কেন হবে না, বল? ট্যাকা কি যেস খেলে
গুড়াবার জন্ত? রক্ত জল করা ট্যাকা। বলাই গাঙ্গুলী সেম্‌নটি নয়। বুঝলি?

বালসে মাথা দিয়ে আপন মনে বিড়বিড় করতে থাকে।

অতনী ভালো করে মশারীটা গুঁজে দিয়ে নিজের ঘরে আসে। জানলার
কাছে গিয়ে একটু দাঁড়ায়। বখিনা বাতাস বইছে। ক্যান নেই ঘরে। অনেক-
বার ভেবেছে এবার একটা ক্যান কিনবে—কিন্তু কিনতে হলে দুখান। কিনতে হয়।
সুামার ঘরেও লাগাতে হয়। পরের বছর দু'খানাই কিনবে। ইন্‌টলমেন্টে।
করে একটু ক্যানের হাওয়া গেলে বড়সামা তৃপ্তি পেত।

করবে কুনীটা তুলে নিয়ে চুলের জট ছাড়াতে গিয়েই হাতে কাটা কুটল।

একবার নয়, মনে পড়ল ওর খোঁপায় বসানো আছে একটা রক্ত গোলাপ।

বাঁ-মা ন ছেলেটার কাণ্ড।

জেনে শুনে ভ বাধা দেয়নি। বাধা দিতে চায়ওনি। অল্পসময় হলে হয়তো ওর
অতনীর ত্রিশ্রুতবে রক্তগাবু অথবা হয়তো বৌদি বিরক্ত হতেন—কিন্তু বিধাতার

ঐ বোঁর কোঁতুকে ওঁরাও আজ অল্প চোখে দেখছেন ঐ অ্যানিমিক
কেন ব'লে।

সত্য কি ওর ব্লাড-ক্যানার হয়েছে? জিউকেমিয়া? যার চিকিৎসা
নেই? অনিবার্য মৃত্যুর জন্ত পরীক্ষা করা? কতদিন বাচকে ছেলেটা? কখন
বলতে পারে? এক বছর? ছয় মাস? তিন মাস?

কী আশ্চর্য! এসব কথা এখনই তাবছে কেন? একজন ডাক্তার আশঙ্কা
করেছেন—এছাড়া আর তো কোন প্রমাণ নেই। হয়তো এসব কিছুই নয়।
কালই জানতে পারা যাবে। না, কাল নয়, সোমবার। পরশু সকাল দশটার।
রক্তগাবুও অবশ্য শেষ পর্যন্ত ওকে অসুস্থোধ করেছে, ববিবার সন্ধ্যাবেলায়
একবার তার তদ্বিগতির সঙ্গে যোগাযোগ করতে। যদি রিপোর্টটা তৈরি হয়ে

থাকে তাহলে যেন অতসী ঠাণ্ডের পাড়ার যতীনবাবুকে একটা ফোন করে দেয়—যত রাতেই হোক। যতীনবাবু দুখানা বাড়ির পরে থাকেন। বিশেষ প্রয়োজনে রক্তবাবুদের ভেঁকে দেন। সেদিক থেকে যতীনবাবু লোক ভালো। অবশ্য পাড়ার সব বাড়ির বাসিন্দাই এ সুযোগ পায় না। রক্তবাবুর প্রতি ভ্রাতালোকেও একটু নেকনজর আছে—প্রয়োজনে রেলওয়ে বিজার্ভেশনের ব্যবস্থাটা তাঁর মাধ্যমে করা যায়।

গোলাপণী নাকের কাছে নিয়ে একবার শুঁকল, তারপর বেঁখে দিল ড্রেসিং টেবিলে। হাসল অতসী। কাল সকালে উঠে নিশ্চিত দেখবে গোলাপটা শুকিয়ে কুকড়ে পড়ে আছে। যাবে না? অতসী রায়ের নিশ্বাসের হোঁচা পেয়েছে যে।

অতসী মশারী-ফেল' পালকটার দিকে ফিরল এবার। আবার হাসি পেল তার। ওটাও একটা দ্রুতক। ডবল-বেড বিছানার আধখানা ইঁ ইঁ করা মাঠ।

এ বাড়িতে তিনখানা ঘর। একখানা ছিল দিদিমার। ছেলেবেলায় ওরা দুবোন দিদিমার সঙ্গে শুতো। মাকখানে দিদি, দুপাশে দুবোন—মেকোতেই শুতো ওরা। তারপর দিদিমার চৌকি এল। তখন ওরা দু'বোন গলা জড়াজড়ি করে মেকোতে ঘুমাতো, দিদি খাটের উপর। দক্ষিণ দিকের বড় ঘরখানা বড়মামার—যে ঘরটার দখল পেয়েছিল ওরা দু'বোন বড় মামী গত হওয়ার পর। বড় মামী এখন থাকে পূর্বদিকের ছোটঘর—যে ঘরটা আগেকার আমলে ছিল ছোট মামার পড়ার ঘর। এঘরের সব কিছুতেই বড় মামীর স্বত্তি জড়ানো। তার বিপরীত দিকের খাট, ড্রেসিং টেবিল। অপরা খাটটা—বড় মামীও ভোগ করতে পারেনি, অতসীও নয়। আর কিছু না হোক, বন্দনাকে তো শয্যাসজিনো হিসাবে পেয়েছিল—পালকটার তাও সহ্য না। অতসীর শয্যাসজিনো গৃহত্যাগ করে চলে গেল।

মশারী তুলে অতসী শুয়ে পড়ে।

আর একটা দিন কাটল। একটা উল্লেখযোগ্য দিন। ভালোয়-বন্দর, কাঁদার হাসার। না, দিনটার আনন্দের চেয়ে বেদনার তাই বেশি।

মশারীর ভিতর হাওয়া আসছে না। হাতপাখা চালাতে হচ্ছে। দু' কাঁধ বাড়িতে রেডিওতে রবীন্দ্রসঙ্গীত হচ্ছে। কথাগুলো বোকা যায় না—ছরটা চেনা-চেনা। ঠিক যেন অতীতের দিনগুলোর স্বাদ—সব কথা মনে পড়ে না, ছরটা লেগে থাকে প্রতিতে।

আচ্ছ', কুনাল কি আশা করেছিল অতসী বন্দনার কথা জানতে চাইবে? মাঝের পেটের বোন প্রায় বছরখানেক দেখাশোনা নেই, যোগাযোগ নেই—কুশল প্রশ্ন কবাটা কি স্বাভাবিক ছিল না? 'কিন্তু ছোটখুঁকও তে কোন খবর নেই', দেয় না। কেন? অতসীর বিষ-নিষ্বাসের কথাটা তো সে কোন্‌দিক্‌ই বিশ্বাস করেনি, কুনালও নয়। তাহলে? ওরা কি আশঙ্কা করে অতসীর অভাবের সংসারে সঙ্গ যোগাযোগ রাখলে ওরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে? তা হতে পারে না। অতসী যা রোজগার করে তাতে দুজনের দিব্যি চলে যায়। ওসব কিছু নয়। কারগটা অন্তর্জ। ওরা জানে, ওদের জীবনের মাঝখানে অতসী এসে দাঁড়ালে শুদেব দাম্পত্য জীবনটা জটিলতর হয়ে উঠবে। হয়তো বন্দনা কুনালের মনটা ভবিষ্যে তু-তে পারেনি। কুনাল শিক্ষিত, সংস্কৃতিবান—দেশী-বিদেশী সাহিত্য সে পড়ে, বিশ্ব বজ্ঞান-বিজ্ঞান হত্য রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করতে ভালবাসে। এমন একজন মানুষকে কতটুকু তৃপ্তি দিতে পারে বন্দনার মত মেয়ে—যার জ্ঞানের দিগন্ত উন্টোবধ-প্রসাদ-আনন্দলোকেব পাঠসীমা অতিক্রম করে না? হয়ত সেইজন্তেই কুনাল ভয় পায় অতসীকে, পাছে তার আশ্বর-কুধা তাকে অভিভূত করে ফেলে।

না, কুনালের জীবন-দর্শনের সঙ্গে অতসীর চিন্তা-ভাবনাব ওতপ্রোতভাবে মিল ছিল না। মতবিরোধ লেগেই থাকত—নানান বিষয়ে। সিনেমা-সাহিত্য-রাজনীতি বিষয়ে তো বটেই—এমন কি ঘরোয়া ব্যাপারেও।

প্রথম কথা ঐ ঠিকুজী-কোণী হস্তরেখা বচার ইত্যাদিতে কুনাল আদৌ বিশ্বাস করত না। বোধকরি ঈশ্বরেও নয়। এ নিয়ে সে বারে বারে তর্ক করেছিল অতসীর সঙ্গে। কুনাল ডাক্তার, বিজ্ঞান-শিক্ষিত—অতসীকে যুক্তি দিয়ে বিজ্ঞানের মাধ্যমে বোঝাবার চেষ্টা করেছিল ওসব আশুস্ত বুজুকি। বিশ্বাসপ্রবণ একজাতের মানুষের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খাওয়ার জন্ত ওরা যুগে যুগে ছুনিয়ায় পয়সা হয়। বিষকন্ডা কী? কোন মানে হয়? না, সে যাকে ভালবাসবে, যার কণ্ঠে বরমালা দেবে, যার বাহুবন্ধনে ধরা দেবে,—ছয় মাসের মধ্যে তার মৃত্যু অবধারিত। কেন? না, ঠাকুরমশাই বলেছেন! কে ঐ ঠাকুরমশাই! বাঃ! তুমি নাম শোননি? ঐ যে গুরুগিরি করে ঘিন গ্রাসাচ্ছাদন করেন; শুধু গুরুগিরিতে গ্রাসটা যথেষ্ট মনঃপুত হয় না বলে হুদে টাকা খাটান? অজ্ঞাত উপায়ে যাব কাছে থাকা সাত হাজার টাকার 'তমহুক কি-করে-জামি' বিপ হাজার টাকার পারণত হয়! সেই দেবতুল্য অজ্ঞাত পণ্ডিতটি বলেছেন! হরিবল্ল!

অতসী তর্ক করত কিন্তু অ্যাস্ট্রল'জও তো একটা 'সায়েন্স'?

নিশ্চয় নয়। অ্যান্টনি একটা বিজ্ঞান, অ্যান্টিলজি নয়। গণিত-জ্যোতিষ
মানি, কলিত-জ্যোতিষ মানি না।

অতসী কৌতুক করে বলত, কিন্তু তুমি কেমন করে জানলে যে, জন্মমূহুর্তের
গ্রহ-সংস্থাপনে মানুষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হতে পারে না? ‘চেরো’ না ‘কিয়ারো’
কী বেন ভল্ললোকেয় নাম, তিনি অসংখ্য উদাহরণ...

—জানি, জানি। মজা হচ্ছে উদাহরণগুলি লেখা হয়েছে ঘটনা ঘটে যাবার
পর। তাছাড়া তোমরা বিশ্বাসপ্রবণ বলে যেগুলো মিলে গেছে সেগুলোকেই
উদাহরণ হিসেবে তুলে ধর। যেগুলো মেলেনি তার কথা চেপে যাও। আরে
বাবা, একটা করেন নিরে টস্ কর না—আমিও স্ট্যাটিস্টিক্যালি নির্ভুল উত্তর
দিতে পারব শতকরা প্রায় পঞ্চাশটা ক্ষেত্রে।

—কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে সত্যিই ওরা মিরাকুলাস প্রেডিকশান করে।
আমার দাদামশাইয়ের কোষ্ঠিবিচার করে—

কুনাল তাকে মাঝপথে থামিয়ে দেয়, সো হোয়াট? শুনেছি, নবাব অফ
পার্তোদি একটা টেস্ট-সিরিজে পর পর পাঁচবার টসে জিতে যায়। তার মানে
কি পার্তোদি জ্যোতিষাৰ্ণব?

অতসী প্রতিবাদ করত, না, জ্যোতিষকে বুজুকি বলতে পার না তুমি।
অ্যাট বেস্ট বলতে পার যে, ‘এটা বিজ্ঞানসম্মত কিনা আমি জানি না। আমি
পরীক্ষা করে দেখিনি।’

—তা কেন? বিজ্ঞানসম্মতভাবে আমি প্রমাণ করে দিচ্ছি যে, এটা স্বীকৃত
শাস্ত্র হতে পারে না। তুমি লজিক্যালি আমার প্রশ্নের জবাব দিবে যাও : এক
নম্বর প্রশ্ন—জ্যোতিষশাস্ত্রমতে জন্মমূহুর্তে নবগ্রহের সংস্থান অনুসারে জাতকের
জীবন পূর্ব-নির্ধারিত, এটা মানো?

—হ্যাঁ, মানি।

—দ্বিতীয় প্রশ্ন—মানুষ সেই পূর্বনির্ধারিত ছকে আবদ্ধ, বইছায় বন্ধন কাড়িয়ে
উঠতে পারে না?

—তা কেন? শাস্তি-স্বস্ত্যয়ন করে, যাগ-যজ্ঞ করে গ্রহের প্রকোপ থেকে মুক্তি
পাওয়া যায়, রত্নধারণ করেও তা করা যায়।

—আচ্ছা বেশ বাবা বেশ—ধর আমি। আমি শাস্তি-স্বস্ত্যয়ন-হাচি-টিকটিকি-
মাছলো-আংটি কিছু বিশ্বাস করি না—শুধুমাত্র বিজ্ঞানে বিশ্বাস করি। এ ক্ষেত্রে
আমি কি একটা জাতকের কোষ্ঠীর ফলাফল পালটে দিতে পারব? —কোন
মন্ত্রতন্ত্রের ধার না ধেরে? স্রেফ বিজ্ঞানের সাহায্যে?

অতনী মাথা নেড়ে বলেছিল, না, পারবে না। অবিশ্বাসীরা পারে না।

কুনাল বলে, নেস্ট ! লেটস্ কাম টু ডেকিনিশন ! বিজ্ঞানসম্মত আলোচনার, তর্কশাস্ত্রে, সবার আগে সংজ্ঞা নিরূপণ করতে হয়। এবার বল, ‘জন্মমূহূর্ত’ বলতে কোন মূহূর্ত ?

—যখন বাচ্চাটা প্রথম জন্মালো !

—দাঁড়াও, দাঁড়াও—অত সহজ নয়, তুমি গাইনকলজি-পড়া লোকের সঙ্গে কথা বলছ ! জন্মমূহূর্ত কোনটা ? যখন ব্যাথা উঠল, না ভ্রূণটা বার হতে শুরু হল, না সবটা বেরিয়ে এল, অথবা নাড়ি কাটা হল ? এর মধ্যে কয়েক ঘণ্টার ব্যবধান হতে পারে—শনি-মঙ্গল এক রাশি থেকে অন্য রাশিতে সংক্রান্ত হতে যেতে পারে।

কোণঠাসা হয়ে অতনী বলে, তোমার রেজিস্টারে কোন সময়টা লেখ ?

—সেটা প্রশ্ন নয়। আমাদের হিগাবে দু-পাঁচ মিনিট এদিক ওদিক হলে মহাভারত অন্তত হয় না !

—কেন হবে না ? এক রাজার দুই রানী—দুজনেই একই সময়ে মস্তান প্রসব করলেন। কে সিংহাসন পাবে তা তো নির্ভর করবে ঐ সময়টার উপরেই ! সুতরাং ‘হিষ্ট্রি অব্ জুরিস্পুডেন্সে’ নিশ্চয়ই এ প্রশ্নের জবাব আছে, তুমি জান না !

কুনাল বলেছিল, তুমি প্রশ্নটা এড়িয়ে যাচ্ছ অতনী ! আমার বক্তব্য—কলিত-জ্যোতিষকে বিজ্ঞান নস্যাৎ করতে পারে। পারে না ?

—কেনন করে ?

—ধর একটা মেয়ে প্রসব-যন্ত্রণায় কাৎরাচ্ছে। আ ম দেখলাম তখন সকাল নটা। তোমার ঠাকুরমশাই বললেন—বেলা দশটা পর্যন্ত মহেন্দ্রক্ষণ, দশটার পর জন্মালে জাতক হবে বিধকণ্ডা। এ ক্ষেত্রে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আমি সিজারিয়ান সেকশন করে জাতককে ক্রম বিধকণ্ডা টু রাজরানী করে দিতে পারি কি না ?

—না, পার না ! জাতকের ভাগ্যে যদি পূর্ব জন্মের সংস্কারবশে বিধকণ্ডা হয়ে জন্মানোই ভবিষ্যৎ হয়, তাহলে তোমার অপারেশন আনসাক্সেশন ফুল হবে ! বাচ্চাটা মারা যাবে !

—তাতেও তুমি তর্কে জিততে পারলে না। ভবিষ্যৎ অনুসারে জাতকের হওয়ার কথা ছিল ‘বিধকণ্ডা’, সে হল ‘টিল-বর্ন’—মৃত শিশু। নঞর্থকপথে সে ক্ষেত্রেও সার্জেন কলিত-জ্যোতিষকে ব্যর্থ করল। করল না ?

অতসী হালে পানি পার না। একেত্রে তার যা ব্রহ্মাঙ্গ তাই সে প্রয়োগ করল
—যত যাই বল। ভবিতব্যকে কেউ খণ্ডাতে পারে না।

কুনাল মাথা নেড়ে বলত, যু আর এ ফেটালিস্ট! তোমার কুসংস্কারের দুর্গ
আমার বৈজ্ঞানিক গোলায় ঝুঁড়িয়ে দেওয়া যাবে না।

তু এ এক বিষয়েই নয়, জীবনদর্শনেও তাদের মত-পার্থক্যটা অনস্বীকার্য।
যেমন এ বড়মামা।

কুনালের বক্তব্য—হ্যা, ঐ ভদ্রলোকের প্রতি অতসীর একটা কর্তব্য আছে।
কিন্তু এ ছনিয়ার যাবতীয় জিনিসের মতই সেই কর্তব্যবোধটা সশীম। সেটা
এতখানি বাড়তে দেওয়া উচিত নয় যাতে অন্যের জীবন বিষময় হয়ে উঠবে।
হ্যা, লোকটার একখানা হাত নেই, সংসারে আর কেউ নেই—জীবন-সংগ্রামে সে
পরাজিত মৈনিক, সে অশুকস্পার পাঞ্জ-ঠিক আছে। কিন্তু তাই বলে আর
পাঁচজনের সংসার ছারখার করে দেবার ছাড়পত্র সে পায়নি। অতসী-কুনালের
সংসারে ঐ মানুষটার ঠাই হতে পারে না। লোকটা পাঁড় মাতাল, রেহুড়ে,
কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান নেই। এমন মানুষকে কেন সখ করে নিয়ে যাবে কুনাল তার
নতুন-পাতা সংসারে? বেশ তো অতসী যদি চায়, সে মাস-মাস কিছু টাকা
দিয়ে সাহায্য করবে। লোকটা কানীতে গিয়ে থাকুক না—সব বন্দোবস্ত কুনাল
করে দেবে। আর কী চাই?

আর কি চায়, অতসী বলেন। তার যুক্তিগুলো সবই এলোমেলো। বলত,
মাসে মাসে নগদ টাকা পাঠালে বড়মামা প্রথম দিনেই ফুঁকে দেবে।

কুনাল রাগ করে বলত, ফুঁকে দিলে বাকি মাস না খেয়ে থাকতে হবে;
পরের মাসে সে নিজেই সংযত হবে।

--হবে না। তুমি বড়মামাকে চেন না।

এর কী জবাব! তবু জবাব দিয়েছিল কুনাল। বলেছিল, বেশ তো! সে-
ক্ষেত্রে আমি যদি এমন ব্যবস্থা করে দিই যাতে রোজ সকাল বিকাল তাঁকে কেউ
রাগাকরা ভাত টিফিন-কেরিয়ারে করে পৌঁছে দেয়?

—কে এমন লোক বসে আছে তোমার কানীতে?

—সেটা আমার চিন্তা অতসী। টাকা খরচ করলে সব রকম ব্যবস্থাই
লভব!

অতসী মাথা নেড়ে বলত, তাতে বড়মামা রাজীই হবে না।

বড়মামা-বড়মামা-বড়মামা! এ জটিল নাগপাশ থেকে বের হওয়ার উপায়
নেই। বলে বুঝিয়ে কিছুতেই অতসীকে স্বমতে আনতে পারেনি। দীর্ঘ তিন-

তিনটি বছর অপেক্ষা করেছে সে। ইতিমধ্যে পাস করে বেরিয়েছে, বোনের বিয়ে দিয়ে নিজ খাট হয়েছে। বাবা গত হয়েছেন, যদিও বিরাট ঋণের বোঝা ডাক মাথায়। তবু ভাল চাকরিও পেয়েছে একটা—ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরিস্ট সিনিয়র প্যাথোলজিস্ট, প্রাইভেট প্র্যাকটিসও ধীরে ধীরে জমছে। এবার সংসারী হওয়া দরকার। আর কতদিন অপেক্ষা করবে?

অতসীও দু-নম্বর যুক্তি ছিল : ছোটখুকি।

এখানেও কুনাল তার সাথে একমত হতে পারেনি। বলত, দেখ অতসী, তুমি নিজের ইচ্ছামত ছনিয়াকে চালাতে পারবে না—কিন্তু তা সত্ত্বেও তোমাকে ভাল দিয়ে চলতে হবে। বন্দনা তোমার মতো নয়। তুমি আইডিয়ালিস্টিক, বন্দনা প্রাগ্‌ম্যাটিক। সে জীবনকে উপভোগ করতে চায়, সে কচি খুকি নয়। তাকে তুমি নিজের ইচ্ছামত গড়তে পারবে না। সে—সে। কিন্তু যত যাই হোক সে তোমার ছোটবোন। প্রচলিত আইন অনুসারে স্বাভাবিকভাবে তোমারই আগে সংসার পাতার কথা। আমি তো বন্দনার দাবিত্ত্ব অস্বীকার করছি না। সুপাত্রে তাকে পালন করবার চেষ্টা আমরা নিজেরাই করব—বোধহয় তার দরকারই হবে না; সে নিজেই তার উপযুক্ত জীবনসঙ্গী বেছে নেবে। কিন্তু সে ভ্রত তুমি অবিবাহিত থাকবে কেন?

অতসী বলত, তুমি বুঝতে পারছ না। ও একেবারে অন্তরকম। ওর একটা ব্যবস্থা না করতে পারলে আমি কিছুতেই বিয়ে করতে পারব না।

কুনাল হেসে কেলত। বলত, দেখ অতসী, তোমার চরিত্রের আগল সন্দেহ কোথায় জান? তুমি মূলত দুঃখবাদী। দুঃখ পেলেই তুমি আনন্দ পাও। প্রয়োজন থাক না থাক, একটা মহান ত্যাগ তোমাকে করতেই হবে, অপরের জন্য তোমাকে মাথা পেতে বকনা সহ্য করতে হবে। তুমি আত্মপীড়নেই আনন্দ পাও।

অতসী প্রতিবাদ করত। এ কোন কাজের কথা? কেউ কি ইচ্ছে করে দুঃখ পেতে চায়? অথচ কুনালের যুক্তি ছিল সেই রকম। বলত, তুমি খুশি হয়েছে শুনে যে, কোষ্ঠীর বিচার অনুযায়ী তুমি নাকি বিবকন্যা। অর্থাৎ স্বাভাবিক দাম্পত্য জীবনে তোমার অধিকার নেই।

আচ্ছা, কোন মানে হয় এসব অবাস্তব কথার? একটা মহত্ব স্বাভাবিক মেয়ে চাইবে না—স্বামী-সংসার-সন্তান? সে খুশি হবে সেই স্বাভাবিক প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হলে? কুনাল বলে, অতসী নাকি নিজেও মনে প্রাণে বিশ্বাস করে না ঐ ভাগ্য-বিড়ম্বনার কথাটা—অথচ যেন বিশ্বাস করে, এমন ভাব দেখায়। তাহলেই যে সে সকলের সহানুভূতি আকর্ষণ করতে পারবে।—যত্নসব পাগলের কথা।

হ্যা, স্বীকার করে অভঙ্গী—কুনালের সঙ্গে জীবনদর্শন বিষয়ে তার কতকগুলো মৌল পার্থক্য ছিল। এসব দুঃখবাদ-টাদ কিছু নয়, কিন্তু পরের অন্ত কষ্ট-স্বীকার করতে সে পিছপাও নয়। সত্য-ধর্ম, আদর্শ—এসব বিষয়ে কুনালের সঙ্গে মাঝে মাঝে ওর ধুম তর্ক বেধে যেত। বন্দনা উপস্থিত থাকলে পালিয়ে বাচত—এসব তাত্ত্বিক আলোচনার ধারে কাছে সে থাকে না। কুনাল বলত, ‘ভালো’ আর ‘খারাপ’ শব্দ দুটো আপেক্ষিক। সমাজে ঐ শব্দ দুটির সংজ্ঞা যারা নিরূপণ করেছেন তাঁরা সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি। তাই এদেশে তেতাল্লিশ-সালের স্বল্পকালে যখন লাখে লাখে মানুষ মারা গেল—জোতদারের খানের গোলা লুট করল না, তখন ওঁরা বললেন—দেখেছ! ভারতবর্ষের মানুষ কত ধার্মিক! প্রচলিত সমাজব্যবস্থায় তোমার যতই ক্ষতি হোক—সেটা যদি তুমি মেনে চল, তাহলেই তুমি ধার্মিক। ‘পিতামাতাকে ভক্তি করিবে’—হোন পিতা মজুপ এবং মাতা স্বার্থপর, ‘মাষ্টারমশাইদের শ্রদ্ধা করিবে’, যদিও তিনি টাকা ধোয়ে তোমার সহপাঠীকে কোশ্টেন বলে দেন, রাজনৈতিক দাদাদের—

বাধা দিয়ে অভঙ্গী বলত, তুমি ছায়ায় সঙ্গে যুক্ত করছ কুনাল। গায়ে-ব্যাথা হবে!

—ছায়া? তোমার বড়মামা কি কারাময় নন?

—বড়মামার কথা ছেড়ে দাও। উনি একটা ব্যতিক্রম।

—বেশ ছাড়লাম। ধর, তোমাদের ঐ ঠাকুর-মশায়ের কথা। সেদিন আমি তোমাকে বলেছিলাম যে, বাবা সাত হাজার টাকা কর্ত্ত করেছিলেন, অথচ আমাকে শোধ করতে হচ্ছে বিশ হাজার টাকা—মনে আছে? তুমি শুনে বলেছিলে—কী করবে বল? মেনে নাও।

—অন্য বলছিলাম? উপায় কি? তুমি বলছ—দলিলটা তুমি পরীক্ষা করে দেখেছ। তোমার বাবার হস্তাক্ষর সন্দেহাতীত, কোথাও কোন কাটাকুটি নেই। প্রতিটি পাতাতেই সকলের সই আছে। বিশ-হাজার টাকার অকটা সংখ্যায় এবং শব্দে পরিষ্কারভাবে লেখা আছে—একত্রে কী করতে পার তুমি? মেনে নেওয়া ছাড়া?

—মেনে তো নিচ্ছেছি, নিতে বাধ্য হয়েছি—কিন্তু ধর যদি স্বেচ্ছায় বুঝে আমি ঐ জোচোরটাকে খুন করে দলিলখানা হিনিরে নিয়ে পুড়িয়ে ফেলি, তুমি আমাকে সমর্থন করতে পারবে?

—এসব হাইপথেটিক্যাল কথা কী ভাবাবে দেব, কুনাল?

—আমরা অ্যাকাডেমিক ডিস্কাশান করছি অভঙ্গী। হাইপথেটিক্যাল কেস-

এ হাইপথেটিক্যাল প্রশ্নই তো উঠবে। বল, আদর্শগতভাবে তুমি আমাকে সেক্ষেত্রে সমর্থন করতে পারবে ?

—না। পারব না। প্রথম কথা—দলিলে যে কারচুপি আছে এটা তুমি প্রমাণ করতে পারনি।

—তা পারলে তো মামলাই ঝড়তাম। কিন্তু বাবার ডায়েরীতে লেখা আছে সাত হাজার টাকা, আমার বোনের বিয়ের হিসাবের খাতায় জমার অঙ্কে লেখা আছে ‘করালীর কাছে কর্ত্ত সাত হাজার টাকা’। বাবা মৃত্যুশয্যায় আমাকে বলে গেলেন সাত হাজার টাকা—এগুলো তো মিথ্যা নয় ?

—তা হলেও তুমি ঠাকুরমশাইকে খুন করতে পার না। আইন নিজের হাতে নিতে পার না। নীতিগতভাবে পার না। এভাবে সবাই যদি আইন নিজের হাতে নেয়, তাহলে সমাজ চলে পাবে না। টাকার জন্য তুমি মানুষ খুন করতে পার না।

—অলরাইট, অলরাইট। এবার আর একটা ‘হাইপথেটিক্যাল কেস’-এর জবাব দাও। ধর আমি ঠাকুর-মশায়ের সঙ্গে দেখা করতে তাঁর বাড়ি গেলাম। গিয়ে দেখলাম, তাঁর খোলা ড্রয়ারে অনেক টাকা আছে। আমি নিশ্চয়ই তা থেকে বিশ হাজার মাইনাস সাত, তের হাজার টাকা তুলে নিয়ে এলাম। ওয়েল—তুমি আমার কাজটাকে সাপোর্ট করবে ?

অতসী বলেছিল, না, করব না। সেটা তো চুরি।

—চুরি নয়। জোচ্চুরির অ্যান্টিডোট।

—না, কুনাল। এভাবে তুমি আইনকে ঝাঁকি দিতে পার না।

কুনাল হতাশ হয়ে বলেছিল : যু আর ইন্করিজিব্ল। তোমাকে শোধরানো অসম্ভব ! অতসী হেসে ফেলেছিল। বলেছিল, সে কথা সত্যি কুনাল। তোমার সঙ্গে আমার কোনদিনই মতের মিল হবে না। আমরা ভিন্ন মেরুর বাসিন্দা।

‘কুনাল হতাশ হরনি। বলেছিল, বিজ্ঞ ন কিন্তু বলে—আনলাইক পোল্‌স অ্যাট্রাক্ট’।

—জীবন তো শুধু বিজ্ঞানের নির্দেশেই চলে না। মিষ্টার হোরেশিও। এখানে মতের মিলটাই বড় কথা। তুমি বরং ছোটখুকিকে বিয়ে কর ! ওর সঙ্গে তোমার বেশ মতের মিল হবে—

স্পষ্ট মনে আছে অতসীর। ভীষণভাবে চমকে উঠেছিল কুনাল। কোন জবাব দেয়নি। নীরবে উঠে চলে গিয়েছিল।

কেন ? তার আগে থেকেই কি কুনাল খুঁকেছিল বন্দনার দিকে ? অতসীর

চোখের আড়ালে ? বন্দনা তখন যৌবনের মধ্যগগনে। বাইশবছর বয়স তার। অতসী কালো, বন্দনা ফর্সা, অতসী রোগা—একহারা, বন্দনার সর্বাঙ্গব্যব যৌবন উপচে পড়ছে। তার চেয়েও বড় কথা, অতসী রক্ষণশীল—কুনালকে এ পর্যন্ত শুধু হাত দুটিই ধরতে দিয়েছে, তার বেশি কিছু নয়। গুর ধারণা ছিল, এসব বিষয়ে কুনালও বেশ পিউরিটান, প্রাক-বিবাহ যুগে দৈহিক সংস্পর্শে তার আস্থা নেই, যেমন নেই অতসীর। হয়তো কথাটা ঠিক নয়, হয়তো গুর দৃষ্টির আড়ালে গুরা ছুঁজন তার আগেই—

...নাঃ ! ঘুম কি আজ আসবে না ? অতসী উঠল। স্নাইচ ছেলে ঘড়িটা দেখল। রাত বারোটা। কলকাতা শহরও নিস্তর হরে এসেছে। পাশের বাড়ির রেডিওটা অনেকক্ষণ থেমেছে। মনে হচ্ছে ঘণ্টাখানেক আগে একটা ‘কুগপি—মালাই—ওয়াল’ এই মধ্যরাত্রে হেঁকে গেছে। তারপর একটা রিকশার শব্দ শুনেছে। এছাড়া চরাচর নিস্তর। পাশের ঘর থেকে বড়মামার নাসিকা-গজন শুধু শোনা যায়।

অতসী মশারী তুলে বাইরে এল। বাথরুমে গিয়ে মুখে চোখে জল দিয়ে এল। ড্রেসিং টেবিলটার কাছে এগিয়ে এসে গোলাপফুলটাকে তুলে দেখল। তার পচন ক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে কিনা ঠিক বোঝা গেল না। আবার এসে শুয়ে পড়ল।

...না ! ছোটখুকিকে সে দোষ দেয় না। সে দিদির মন জানবার চেষ্টা করেছিল—দোষ অতসীরই।

ততদিন অতসী চাকরিতে ঢুকেছে। সাত সকালে দুটি নাকেমুখে গুঁজে সে অফিসপানে ছোট্টে, ফিরতে যার নাম সন্ধ্যা। বড়মামা অধিকাংশ দিনই সন্ধ্যা-কোলা মাতাল হয়ে পড়ে থাকে। সবচেয়ে মুশকিল হয়েছিল ছোটখুকিকে নিয়ে। সারাদিনমান সে যে কী করে, কী ভাবে, কোথায় কোথায় ঘোরে কিছুই বোঝা যায় না। স্কুল ফাইনাল দিয়েছিল, পাস করতে পারেনি। দ্বিতীয়বার কিছুতেই পরীক্ষা দিল না। সেলাই-কোঁড়াই করবে না। ঘরের কাজ যেটুকু না করলে নয়, শুধু সেইটুকু। এদিকে রূপচর্চার যথেষ্ট উৎসাহী। গুরই করমাস মত নানান জাতের প্রসাধন দ্রব্য কিনে আনতে হত অতসীকে। মাঝে মাঝে বন্দনাই বরং ধরে বসত তাকে—কী কাগের বাসা করে রেখেছিস চুলটা ? আয়, আঁচড়ে দিই।

অতসী শুকে কত করে বোঝাবার চেষ্টা করত। বলে বুঝিয়ে, কিছুতেই শুকে বাগে আনতে পারেনি। এতবড় মেয়েকে তো আর মারধোর করা যায় না।

অতসী অকিলে বেরিয়ে গেলেই ছুটি নাকেরূখে ভাঁজে বন্দনাও বেরিয়ে যেত।
কিরে আগত সন্ধ্যা নাগাদ। আর প্রতিদিনই ছপুয়ে অথবা ম্যাটিনিতে গিনেমা
দেখত। কার সঙ্গে? পরমা পেত কোথায়? অতসী জানতে পারেনি।
জিজ্ঞাসা করেও জবাব পায়নি। বেশি কিছু বললেই উন্টে জবাব দিত, আশায়
জন্তে তোকে ভাবতে হবে না রে, তুই শুধু নিজের আখেরটা ভাখ।

অতসী গভীর হয়ে যেত। বলত, তুই আর কচি খুকিটি নস্। সব কিছু বোক-
বার বয়স হয়েছে তোরা। বুকে বেখ, আমি বি. এ. পাস করেছি, স্টেনোগ্রাফি
পাস করেছি। চাকরি করছি। কিন্তু তুই? তুই কী করবি?

বন্দনা কথা ঘোরাবার জন্ত বলত, কুনালদা আর আজকাল আসে না কেন
রে? অতসী ঔদাসীন্য দেখিয়ে বলত, তার আমি কি জানি? পমার হয়েছে
বোধহয়। হঠাৎ দিদির গলা জড়িয়ে ধরে বলেছিল, এ্যাঁই, একটা কথা সত্যি
করে বলবি? কুনালদার সঙ্গে তোরা ঝগড়া হয়েছে, না রে?

অতসী স্বীকার করেনি। ভুল করেছিল কি? স্বীকার করলে কি ঘটনা অস্ত
ধাতে বইত? না, তা তো নয়। কুনাল ভুল বলত, অতসী অন্তর থেকে বিশ্বাস
করত যে, সে বিষকণ্ঠা, তার নিঃশ্বাসে তার স্বামীর মৃত্যু ঘনিরে আসবে।
কোনদিনই সে কুনালকে গ্রহণ করতে পারত না। স্মৃতরাং সে মিথ্যা কথা বলেনি
কিছু। বন্দনাকে সেদিন সবকথা খুলে বললে ঘটনা হয়তো অস্ত ধাতে বইত—
কিন্তু তাতে আরও খারাপ হত। সব শুনে বন্দনাও হয়তো পিছিয়ে আসত।
আজও আইবুড়ে খুঁড়ি হয়ে পড়ে থাকত। তগবান যা করেন, মঙ্গলের জন্তই।
অতসী জবাবে বলেছিল, দূর পাগল! তুই কি ভেবেছিস কুনাল আমাকে বিয়ে
করত? আমার মত কালো—কুচ্ছিং মেয়েকে?

হঠাৎ সোজা হয়ে বসেছিল বন্দনা। বলেছিল, তুই কালো-কুচ্ছিং মোটেই
ন'স্। সে কথা তো জানতে চাইছি না আমি। আমি জানতে চেয়েছিলুম—
তোদের দুজনের কি ঝগড়া চলছে?

অতসী তার জবাবে বলেছিল, ঝগড়া-ঝাঁটি নয়রে ছোটখুকি, আমি ওকে মুক্তি
দিয়েছি। আমাদের বিয়ে হতে পারে না। হবে না।

বন্দনা একটু অপেক্ষা করে বলেছিল, তাহলে ওর সঙ্গে তোরা বন্ধুত্বের-সম্পর্কটা
বজায় থাকল না কেন? কুনালদা বিয়ে করবে নিশ্চয়ই। তার বউয়ের সঙ্গেও
তোরা বন্ধুত্ব হতে পারে।

—পারবেই তো। সে যদি সম্পর্কটা বজায় রাখতে চায়।

সেদিন ঐ পর্যন্তই কথাবার্তা হয়েছিল।

এখন, অতীতের কথা ভাবতে বসে অতসী মনে হয়—অতসীর সঙ্গে কুনালের বিবাহ না হওয়াটা তার জীবনে ট্রাজেডি নয়, এমন কি বন্দনার সঙ্গে তার বিবাহটাও নয়; কুনাল সত্যিই মৎপাত্র। এমন পাত্রের হাতে ছোটবোনটাকে তুলে দেওয়ার মধ্যে পরম তৃপ্তি থাকার কথা। ভাগ্যবিধাতা যখন জন্মমূহুর্তেই তার কপালে লিখে দিয়েছেন চরম বন্দনার ইতিহাস, তখন কুনালের হাতে বন্দনাকে তুলে দেওয়ার চেয়ে আনন্দের কথা আর কি হতে পারত ?

ট্রাজেডি সেটাই। ছোটখুকি ওকে এই মহৎ দানের স্বেযোগ দিল না। দ্বিধার হাত থেকে নিতে পারল না যা তার জীবনের শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি এবং তার দ্বিধার জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ ! সে প্রমাণ ক্রুরতাে চাইল তার জীবনের সাফল্য : যোগাড়িত !

নিভাস্ত ঘটনাচক্র বলতে হবে।

পর পর কদিন ধরেই সংসারে অশান্তি চলছিল। অফিস থেকে ফিরে ক্লান্ত দেহ-মন নিয়ে অতসী যেন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠত ওদের দুজনের অভিযোগ পার্টা অভিযোগে। বড়মামা আর বন্দনা। দুজনেই আক্রমণ করত অতসীকে। একই অভিযোগ। বন্দনা বলত, তুইই তো সর্বনাশের মূল। বড়মামার হাতে কাঁচা টাকা কেন দিস ? তাতেই তো ও মাতাল হয়। রেস খেলতে যায়।

বড়মামাও বলত ওই এক কথা : তুইই তো সর্বনাশের মূল ; কেন ছোটখুকিকে শাসন করিস না ? দিনরাত বেলান্নাপনা করে বেড়ায়। এতবড় কংশের নাম ভোবাবে।

তিতিবিবরক্ত হয়ে অতসী সেদিন অফিস যাবার আগে হুকুমজারি করে গেল, শোন ছোটখুকি, আমার সংসারে এসব অনাচার চলবে না। আমি সন্ধ্যার সময় ফিরে আসব। তার আগে তুই বাড়ি ছেড়ে বের হবে না, বুঝলি ?

বন্দনা জবাব দেয়নি। বড়মামা ওপাশ থেকে ফোড়ন কাটে, ভারি বাধ্য বোন কিনা তোর ! তোর হুকুমকে ও খোড়াই কেয়ার করে ! তুইও বেকবি, ও-ও বেকবে !

ঘুরে দাঁড়িয়ে অতসী বলেছিল, তুমি কেন কথা বলতে আসছ বড়মামা ? আমি বলে গেলাম, ও শুনে গেল। যা করশালা হয় আমরা করব। তুমি এসবে নাক গলিও না !

—না, না আমি কেন নাক গলাব ? আমাকে দু-বেলা দুমুঠো খেতে দিচ্ছিল—

বাকিটা অতসী শোনেনি। সে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গিয়েছিল।

সন্ধ্যার পরে ফিরে এসে তার মাথার ঠিক ছিল না। যথারীতি বন্দনা অস্থপস্থিত, আর বড়মামা পাঁড় মাতাল হয়ে পড়ে আছে। ঘরে, বিছানায় বসি করেছে। ছটা-সাতটা-আটটা শ্রীমতীর দেখা নেই। ওদিকে বারান্দার ওপাশে বসে মাতালটা ক্রমাগত খিস্তিখেউর করে চলেছে।

সে রাত্রে—বোধকরি জীবনে সেই প্রথম ও শেষ—অতসী সংঘম হারিয়েছিল। হারাতো না। তা সত্ত্বেও সে আত্মবিস্মৃত হত না। হল; বন্দনার ঐ অশ্লীল কথাটার।

বন্দনা যখন ফিরে এসে তখন রাত দশটা। দিব্যি সাজগোজ করে কোথায় গিয়েছিল সে। দোর খুলে দিতে মাথা খাড়া করেই ঘরে ঢুকল মেয়েটা। সদর দরজার খিল দিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখল—বন্দনা ধীরে হুহু ওদের ঘরের দিকে যাচ্ছে—বলাই গাঙ্গুলীর অনর্গল গাঙ্গাগালে ভ্রক্ষেপ নেই তার। অতসী চিৎকার করে বললে, দাঁড়া! কথার জবাব দে।

বন্দনা ঘুরে দাঁড়াল। বললে, কী কথা?

—কোথায় ছিলি এতক্ষণ?

—সিনেমায়। কেন?

—‘সিনেমায়। কেন!’—তোর লজ্জা হয় না? কী বলে গিয়েছিলাম তোকে?

বন্দনা ততক্ষণে ড্রেসিং টেবিলের টুলটার বসে চুল খুলছে। সেখান থেকেই বললে, কী নাটক শুরু করলি দিদি? আমি কি কচি খুকি—যে; আমাকে ঘরে তালাবদ্ধ করে ঘাবি?

অতসী ছুটে এসে বললে, কার সঙ্গে সিনেমা দেখতে গিয়েছিলি? বল?

বন্দনা শাস্ত স্বরে বলল, বলব। এখন নয়। তুই রেগে আছিস। আমার এক বন্ধুর সঙ্গে।

—বন্ধু? তোর অনেক বন্ধু হয়েছে, না রে?

বন্দনা জবাব দেয়নি, নিশ্চুপ চুলের জট ছাড়াতে থাকে।

অতসী ছুটে এসে ওর দুটি কাঁধে ঝাঁকানি দিতে দিতে বলে, কই বললি না? কতজন বন্ধু আছে তোর? কটা ছেলের মাথা খাচ্ছিল?

বন্দনা উঠে দাঁড়ায়। জোর করে কাঁধ থেকে দিদির হাতটা সরিয়ে দিয়ে বলে, দিদিগিরি করিস না বলছি।

—কী বললি? আমি করব না? তুই আমার উপর দিদিগিরি করবি? হড্ড ভাগী! তোর লজ্জা করে না? ধুমুনি মাগি! কেলেঙ্কারি হলে ঠেকাবে কে?

এর জবাবে ছোটখুকি যে কথাটা বলেছিল তাতেই অতসী সংযম হারায়। বলেছিল, কেলেকারি হবে না। লাল ত্রিকোণের বিজ্ঞাপন দেখিসনি?

অতসী আর হির থাকতে পারেনি। প্রচণ্ড একটা চড় বসিয়ে দিয়েছিল বন্দনার গালে, লম্বাছাড়ি! তুই এতবড় কথা বলিস!

পাঁচ-আঙুলের দাগ কুটে উঠেছিল বন্দনার গালে। দৈহিক ক্ষমতা তারই বেশি। সে কিন্তু প্রতি-আক্রমণ করেনি। উঠে দাঁড়িয়ে শুধু বলল, তুহ আমাকে মারলি?

—মারের এখন চয়েছেটা কি? মেরে তোর ঠ্যাঙ খোঁড়া করে দেব। তুই যার খাস যার পরিস তারই মুখে মুখে চোপা?

বন্দনা শুধু অন্ধুটে বলেছিল, যার খাই, যার পরি...?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, বেরিয়ে যা! এই মুহূর্তে বোরয়ে যা। দেখি, কোন বন্ধু তোকে খেতে দেয়, পরতে দেয়! যা—তোর মুখদর্শন করব না আমি। বেরিয়ে যা, বলছি।

বন্দনা শুরু হয়ে দাঁড়িয়েছিল কয়েকটা মুহূর্ত। তারপর যেন সিদ্ধান্তে এল।

বলল, বেশ। তাই যাচ্ছি। আর কোনদিন তোর ভাত খেতে আসব না!

—যা যা! দেখি তোর তেজ কত!

বন্দনা এলো খোঁপাটা জড়িয়ে নিল। তুলে নিল ভ্যানিটি ব্যাগটা। আর কী ছঃসাহস! সত্যিই বেরিয়ে গেল খোলা দরজা দিয়ে।

অতসী ছুটে এল সদর-দরজার কাছে। বললে, কোথায় যাচ্ছিস তেজ দেখিয়ে? রাত দশটা বেজে গেছে সেটা খেয়াল আছে?—বন্দনা! শুনে যা!

বন্দনা শোনেনি। হনহনিয়ে চলে গিয়েছিল।

অতসী কী করবে ভেবে পারনি!

বড়মামা বলেছিল, ঠিক আছে, আমি জেগে বসে আছি। দরজা খোলাই থাক। রাগ পড়লে, মাথা ঠাণ্ডা হলে ফিরে আসবে আবার। যাবে কোথায়?

আসেনি! সমস্ত রাত ঘর-বার করেছে অতসী।

পরদিন সকালে সে কী করবে, কোথায় যাবে হির করতে পারেনি।

তৃতীয় দিনে খবর পাওয়া গেল। ডাকপিয়ন দিয়ে গেল চিঠি। বলাই গাঙ্গুলীকে লিখে ডক্টর কুনাগ বহু—‘আপনার ভাগ্নি শ্রীমতী বন্দনা রায়কে আমি মালখানেক আগে রেজিস্ট্রীমতে বিবাহ করেছি।’

যাচ্ছে নিজের বোনের বাড়ি, অথচ ভাবনা যেন সিঁকে চোর।

বাস থেকে নেমে একবার আড়চোখে দেখে নিল। মেজানাইন ঘরের জানলাটা খোলা, পর্দাটা টানা আছে। সম্ভবত বন্দনা ঘরেই রয়েছে, কারণ পর্দা সম্বন্ধে দেখা যাচ্ছে মিলিং ক্যানটা ঘুরছে। নিচে ডিস্‌পেনসারিতে ডাক্তার-বাবুও আসীন। চেয়ার-বেঞ্চিতে বেশ কয়েকজন রুগী অপেক্ষা করছে। তাহলে কুনালের পদারটা ভালই জমেছে। হাতঘড়িটা একবার দেখে নিল অতসী। সওয়া পাঁচটা। আজ বুধবার। বাসযাত্রীদের ভিড়ে ইতর বিশেষ হয়নি ততটা। প্রায় হল, রাস্তা পার হয়ে ডিস্‌পেনসারিতে ঢুকে পড়ার আগেই যদি বন্দনা জানলায় এসে দাঁড়ায়? যদি দেখতে পায় দিদিকে? কী ভাববে মেয়েটা? দিদি এখনও ঘুর-ঘুর করছে কুনালদার পিছনে? ছোটবোনের স্বামীর সঙ্গে অবৈধ প্রেম করছে? কিন্তু এখন আর ফেরার পথ নেই। ফিরে যাবে বলে এতটা পথ আসেনি। হয়তো কুনাল ইতিমধ্যেই ব্রাড-স্ট্রাইডটা পরীক্ষা করেছে, হয়তো সিঁকাস্তে এসেছে : সেই হতভাগা ছেলেটার ফাঁসীর হুকুম হল কি না।

রাস্তা পার হয়ে দ্রুতপদে অতসী এগিয়ে গেল। হৃদয় দিয়ে ঢুকে পড়ল ডাক্তারখানায়।

কুনাল একজন বড়ো ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলছিল। হঠাৎ লক্ষ্য হল তার। আশ্চর্য মানুষ। একচুল অবাক হল না। সে কি আশা করেছিল অতসী আসবে? আশা না আশঙ্কা? অথবা আশ্চর্য সে হয়েছে, কিন্তু অবাক হওয়ার অভিব্যক্তিটা সে গোপন করতে পেরেছে।

অতসী বেঞ্চের একপ্রান্তে বসে পড়ে।

ডাক্তারবাবু পর্যায়ক্রমে একের পর একজনকে নিয়ে পিছনের 'এগজামিনেশন রুম'-এ ঢুকছেন। মিনিট পাঁচ-সাত পরে বেরিয়ে আসছেন। কোন কোন দর্শনার্থীকে ভিতরে নিয়ে যাবার প্রায় উঠছে না। তারা রুগী নয়, রোগপ্রাপ্তের আত্মীয়। কথাবার্তা বলছে, উপসর্গের কথা শুনে, কখনও বা প্রেসক্রিপশন লিখে দিচ্ছে, কখনও নির্দেশ দিচ্ছে পথ্যের, শুক্রবার। ইতিমধ্যে একটি বিধবা, বোধহয় বাড়ির কি, একটা ফ্লাস্ক রেখে গেল টেবিলে। কুনাল উঠে গিয়ে বেসিনে হাতটা ধুয়ে এল। ফ্লাস্ক খুলে তার ঢাকনিতে গরম কিছু পানীয় ঢেলে

ভারিয়ে ভারিয়ে খেতে থাকে। চা না কফি? কে বানিয়েছে? ঐ বিধবা বুদ্ধি
ঝি, না বন্দনা নিজে? কুনাল বরাবর কফির পক্ষপাতী। জানা আছে অতসীর।
সে নিজে চায়ের ভক্ত। কোন দোকানে ঢুকলে ছু-জাতের পানীয় অর্ডার দিতে
হত। এর চা তো ওর কফি। অতসী বলত, সত্যিই তোমার সঙ্গে আমার কোনও
মিল নেই। কুনাল জবাবে বলত, অস্তরের মিল ছাড়া। কেক্সবিশেষে, যেখানে
কফি পাওয়া যেত না সেখানে অবশ্য ছুজনেই চায়ের অর্ডার দিত। আজ ওটা
যাই হোক—কুনাল তাকে ভাগ নিতে ডাকল না। আর পাঁচজন রুগীর সঙ্গে
একই সারিতে বসে সে কুনালের চা অথবা কফি পান দেখতে থাকে।

কোনরকম পক্ষপাতিত্ব দেখালো না কুনাল। অতসী মনে মনে মহড়া দিয়ে
চলেছে—সে কী-জাতের স্ট্যাণ্ড নেবে। সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ হবে রুগীর
আত্মীয় সঙ্গে থাক। সেই সুযোগই তাকে দিয়েছে কুনাল। জ্বর বড়বোন
হিসাবে যেনে নিলে অনেক আগেই তার বলার কথা, আশুন দিদি, যান উপরে
গিয়ে বসুন। ‘ও’ বাড়িতেই আছে!

তা যখন বলেনি, তখন অতসী গম্ভীরভাবে বলবে, কাল যে রুগীর ব্লাড-
স্যাম্পেলটা নিয়ে এলেন তার রিপোর্ট তৈরী হয়েছে?

কুনাল হয়তো চাল মেয়ে প্রতিগ্রন্থ করবে, কোন কেসটা বলুন তো?

অথবা বলবে, সে রিপোর্ট তো ল্যাবরেটরিতে আছে।

হঠাৎ বাঁ পাশের ভদ্রমহিলা ওর হাতে একটা ঠেলা দিয়ে বললেন, আপনাকেই
ডাকছেন উনি—অতসী সাবৎ ফিরে পায়। এতক্ষণে তার চান্স এসেছে।
পাখি-পড়ার মত বলতে যায়, কাল যে ব্লাড-স্যাম্পেলের...

তার আগেই ডাক্তারবাবু বলেন, হ্যাঁ আপনাকেই। আশুন, আপনার পেটটা
ভিঁপে দেখি—

অতসী জবাব দেবার আগেই ডাক্তারবাবু চুকে গেলেন ‘এগজামিনেশন রুমে।’

অতসী দাঁড়িয়ে পড়ে। কী করবে বুকে উঠতে পারে না। তার বাঁ-পাশের
মহিলাটি আবার তাগাদা দেন, কী হল? যান? উনি আপনাকে একজামিন
করবেন।

অতসী বিধাৎম্ব বেড়ে ফেলে পর্দা-কেলা ঘরে চুকে পড়ে।

কুনাল বাতিটা আগেই জ্বলে দিয়েছে। জোয়ালো বাতি। নিবিকারভাবে
বলে, নিন, তুরে পড়ুন। সায়ার দড়িটা আলগা করে দিন।

অতসীর হাতটা নিশাপিন করছে। টেনে একটা চড় মারবার জন্য।

কুনাল যেন চড় খাবার জন্যই মুখটা বাড়িয়ে দেয়। অক্ষুটে বলে, তুরেই পড়।

সায়ার দড়ি খুলতে হবে না। তবে ঐ অবস্থাতেই কথা বলা ভালো। তাহলে চুপি চুপি কথা বলার কারও সন্দেহ হবে না। গাইনকলজিক্যাল কেস্ তো!

অতসী সরু বিছানার আধশোয়া অবস্থায় শুয়ে পড়ে। 'আপত্তি করে না। বলে, আমি এসেছিলাম...

—জানি! রঞ্জন চক্রবর্তীর জন্তে। কিন্তু একটা কথা বলতো অতসী? তুমি কি ছেলেটাকে ভালবাস?

তড়াক করে উঠে বসে, তার মানে? এসব কথা আসছে কেন?

—আস্তে! আস্তে! বাইরের ওরা ভাবতে পারেন, আমি তোমার গ্লীতাহানি করছি, শোন। রঞ্জন চক্রবর্তী লুকাবার কোনও চেষ্টা করেনি—বেশ বুঝিয়ে দিয়েছিল তার মনোভাবটা। আমি জানতে চাইছি, কনভার্স থিয়োরিয়ার কথা। অর্থাৎ তুমি কি...

—থাক! জানতে চাইছ কোন অধিকারে? এসব কথা উঠছেই বা কেন? অতসীর কণ্ঠস্বর যথেষ্ট সতর্ক নয়।

কুনাল পর্দাটা খুলে দিল। বলল, উঠে বসুন। আমার দেখা হয়ে গেছে। বাইরে আসুন এবার।

উপায় নেই। এখন বাইরের ভিজিটাররা ওদের দেখতে পাচ্ছে। অতসী চটিটা পায়ে দেয়। বেরিয়ে আসে এঘরে। কুনাল ততক্ষণ একটা কাগজে কী-যেন খসখস করে লিখছিল। অতসী এসে দাঁড়াতেই বললে, এই ওষুধটা দিনে তিনবার খাবেন। খাওয়ার পর। কাল অন্ত্যান্ত কথা হবে।

হাত বাড়িয়ে কাগজখানা ধরিয়ে দেয়। তাতে সাদা বাউসায় লেখা ছিল, 'অনেক কথা আছে। কাল সকাল দশটায় আমার ল্যাবরেটরিতে দেখা কর। ঠিকানা এই প্যাডের কাগজের মাধ্যমে লেখা আছে।'

অতসী তবু থামে না। বলে, ব্লাড-রিপোর্টটা কি—?

—না, কাল সকালে পাবেন। সকাল দশটায়।

রাত সাড়ে আটটা নাগাদ শেষ যে দর্শনার্থীটি কুনালের ডিস্‌পেন্সারিতে পদধূল দিতে এলেন তাঁরও ভবিষ্যৎ সিঁদেল চোরের। চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি দিয়ে দেখে নিলেন পরিবেশটা। নাঃ! ঘরটা ফাঁকা। কুনাল উঠবার উপক্রম করছে। ছাতাটা কোনার দাঁড় করিয়ে বুদ্ধ এগিয়ে এলেন; কুনালের মুখোমুখি চেয়ারটার বসে বললেন, অনেকক্ষণ এসেছি। বাইরে পারচারি করছিলাম। এতক্ষণে ঘরটা ফাঁকা পাওয়া গেছে। তা ভালো, পসার বেশ জমে উঠেছে বাবাজীর। রামতারণ বেঁচে থাকলে দেখে আনন্দ পেত।

কুনাল তার স্বর্গত পিতৃদেবের উল্লেখে খুশি হল, না খচে গেল, বোকা গেল না। সে একটা পত্রিকার উপর নিবদ্ধ দৃষ্টিতে বসেছিল। মুখ না তুলেই বললে, আপনাকে তো বলেছিলাম কাল সকাল দশটার আমার ল্যাবরেটোরিতে আসতে। এখানে এসেছেন কেন? এখানে তো রিপোর্ট নেই।

—জানি বাবাজী, জানি। লিখিত রিপোর্ট তো এখানেই হাতে হাতে নিতে আসিনি। খবরটা শুধু জানতে এসেছি। ফলাফলটা জানা গেছে?

এবারও মুখ তুলল না কুনাল। বললে, গেছে।

—গেছে? কী খবর?

—থারাপ। খুব থারাপ।

—থারাপ? ঐ সেই লিউকোমিয়া নয়?

এতক্ষণে কাগজ থেকে মুখ তুলে পিতৃবন্ধুর দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে তাকালো কুনাল। কী আশ্চর্য ঐ মানুষটা! স্বার্থ ছাড়া কিছু বোঝে না। ঐ ফোঁটাকাটা কুশীদ-জীবীটার অন্তরের অন্তস্তল পর্যন্ত স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে এখন। পরিকার বুঝতে পেরেছে তার পরিকল্পনাটা। তাই একটা চক্ষিণ বছরের তরুণের মৃত্যুদণ্ড মকুব হওয়া ঐ পাণ্ডটার কাছে হুঃসংবাদ। কিন্তু অত্যন্ত বুদ্ধিমান সে। লজ্জা পেতে দিল না করালীকিরক, তাঁর মুখ কসকে বলে-কেলা কথাটার জন্ত। বরং তার লজ্জানিবারণের সুযোগ দিয়ে বললে, আপনি আমার কথাটা শুনতে পাননি—বলেছি, ‘খবর থারাপ’; অর্থাৎ পজেটিভ রিপোর্ট হয়েছে। এ্যাকুট কেস অব লিউকোমিয়া।

করালীকিরকও অত্যন্ত ধূর্ত। তৎক্ষণাৎ সামলে নিয়ে বলেন, বল কী! সর্বনাশ! এরপর মিনিট খানেক কুনালকে অপেক্ষা করতে হল। করালীকিরক ততক্ষণে যোগেশ দত্ত। কথা ফুটেছে না মুখে—মুকাভিনয়ে মানসিক যন্ত্রণা, হতাশা, বেদনার একটা মর্যাদাসিক অভিনয় করতে থাকেন। আহা! এই বয়সে অমন একটা ‘শিবের অসাম্য ব্যামো’ হল। কতটুকুই বা দেখেছে ছুনিয়ার। কত আশা, কত আকাঙ্ক্ষা, কত স্বপ্নমার চিন্তা। নিমেষে সব ব্যর্থ হয়ে গেল। তবে এই তো ছুনিয়ার নিয়ম। ঘড়া ঘড়া চোখের জল ঢাললে তো কারও কোনও লাভ নেই। তবু ছুনিয়ারদারি করে যেতে হবে। রক্ত-রক্তনের স্বর্গগতা গর্ভধারিণী ঔর মঙ্গ-শিলা। উনি ওদের পরিবারের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। সকলের মুখ চেয়ে করণীয় যা কিছু তা তো ঔকেই করতে হবে। এই রকম কতকগুলি অসুভূতির ব্যাধনা ফুটে উঠল ঔর অভিনয়ে। একবার চোখ বুজলেন, হাত দুটি উল্টে দিলেন, কৌচার খুঁটে চশমার কাচটা মুছতে গিয়ে চোখটাও মুছে নিলেন, নড়ে চড়ে

বসলেন, গলাটা মাফা করে বললেন, ভবিতব্য। ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা। তুমি আন্ধী
কী করব বাবাজী ?

—তা তো বটেই।—কুনাল নির্বিকার।

—তা অল্পখটা কী জাতের ? চিকিচ্ছে করালে সারবার সম্ভাবনা নেই ?

—ঐ সোদন আপনি যাকে বলেছিলেন—‘শিবের অসাধ্য ব্যারো’।

—আহা হা ! কদিন টিকবে বলে মনে হয় ?

—ভালে মতন চিকিৎসা করলে মাস ছয়েক। না হলে, মাস-দেড়েকের
মধ্যেই শয্যাশায়ী হয়ে পড়বে। আমার অনুমান আট থেকে দশ সপ্তাহ যুঝতে
পারবে।

বেশ কিছুক্ষণ মেদিনীনিবন্ধ দৃষ্টিতে বৃদ্ধ চুপচাপ বসে থাকেন। তারপর
বলেন, খবরটা শুনেও না জানানোই মজল, কী বল ?

কুনাল বলল, দেখুন, এসব পরামর্শ আমার সঙ্গে করার কোন মানে হয় না।
সংবাদটা অত্যন্ত বেদনাবহ। তবে আমি তো জাতে ডাক্তার, অতটা দাগ কাটে
না মনে। ঠুঁরা আমার কেউ নন—আপনার স্নেহভাজন। আপনিই ভালো
বুঝবেন।

একটু ইতস্তত করে বৃদ্ধ বললেন, ওর সেই ব্লাড-স্লাইডটা কোথায় ?
ল্যাবরেটোরিতে ?

—না। এখানেই—

সেক্রেটারিয়েট টেবিলের একটি ড্রয়ার খুলে খানকতক মুখবন্ধ খাম বার
করল কুনাল। বেছে বেছে একখানা বার করল। রাখল টেবিলের উপর।
খামের উপর লেখা আছে ‘পি-এস : ৪০৩—জীৱজন চক্রবর্তী’। কুনাল
সেই খামের গর্ভ থেকে বার করল একটা রিপোর্ট আর একটা ব্লাড-স্লাইড।
প্রথমোক্তটা খুঁটিয়ে দেখল আবার—কী যেন বিড়বিড় করে হিসাব করল মনে
মনে। ব্লাড-স্লাইডটা আলোর সামনে ধরে একবার দেখল। তারপর সবুজ
খামে ভরে বললে, হ্যাঁ, ঐ দশ সপ্তাহই। বড়জোর এগারো।

খামটা ড্রয়ারে রাখবার উপক্রম করতে বৃদ্ধ বললেন, দেখি ওটা ?

—আপান দেখে কি করবেন ? কী বুঝবেন ?

—দাওই না একবার, দেখি—

কুনাল খামটা বাড়িয়ে ধরে ঠুঁর দিকে।

বৃদ্ধ খামটা নিলেন। খুলে দেখলেন না। সমস্তে রেখে দিলেন বুক পকেটে।

কুনাল বিস্মিত হয়ে বলে, ওটা কি হল ?

—বলছি বাবাজী। দাঁড়াও দোরটা বন্ধ করে দিয়ে আসি।

সত্যই উঠে গেলেন তিনি। ডিস্‌পেন্‌সারির দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ করে দিয়ে এসে বসলেন নিজের চেয়ারে। বললেন, দেখ বাবাজী—প্রথম দিন থেকেই তুমি সন্দেহ করেছ ভিতরে একটা ব্যাপার আছে। সেদিনই বলেছিলে, ‘—আপনার মতলবটা কী বলুন তো?’ আমি তখন বলিনি। শুধু বলেছিলাম, সময় হলে জানাব। এখন সময় হয়েছে। সব কথা তোমাকে খুলে বলছি। তুমি যদি আমার প্রস্তাবে স্বীকৃত হও তাহলে, ঐ যে সেদিন যা বলেছিলাম—

বাধা দিয়ে কুনাল বলে, মনে আছে আমার। বন্ধকী তমস্কটা ছিঁড়ে কেলবেন এবং বাড়ির দলিলটা ফেরত দেবেন। কিন্তু একটা কথা ঠাকুরমশাই—আমি কোন তঞ্চকতার মধ্যে যেতে পারব না—তা আগেই বলে রাখছি। আপনার প্রস্তাবের মধ্যে যদি কোন ‘শেডি বিজনেস’ থাকে, তবে তা আমাকে বলারই দরকার নেই। আমি সেটা না শুনেই প্রত্যাখ্যান করছি। আপনি অন্ত কোনও ডাক্তারের সাহায্য নিন—

বুধ ঘেন মর্মান্বিত হলেন। রীতিমত ক্ষোভম্বনকণ্ঠে বসলেন, কুনাল। তুমি কি আমার অচেনা? জন্ম থেকে যে তোমাকে জানি আমি। তুমি রামতারণ বোসের ব্যাটা, জানতে বাকী আছে আমার? তঞ্চকতার মধ্যে আমি নিজেও নেই—তোমাকেও ডাকছি না।

—বেশ তাহলে বলুন?

করালীকঙ্করের প্রস্তাবটা প্রাঞ্জল। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করলে ব্যাপারটা এইরকম দাঁড়ায়—

রক্ত-রক্তের ‘গব্বোখারিনী’ ঠরকাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন। তিনি স্বর্গে গেছেন; কিন্তু ইহলোকেই থাকুন বা পরলোকেই থাকুন, শিষ্যের প্রতি করালীর কর্তব্য আছে—শিষ্যের সম্মান-সম্মতির মঙ্গল-কামনা যদি তিনি না করেন তবে তিনি কেমনতর কুলগুরু?

রক্তের যে অস্থখ হয়েছে তা চিকিৎসার অতীত। আড়াই-তিন মাসের মধ্যে তার অবস্থারিত যত্ন। এ রোগের চিকিৎসা নেই। ভবিষ্যকে মেনে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর কী আছে? কিন্তু প্রশ্নটা হচ্ছে এই: রোগীকে কি জানানো উচিত যে, সে ফাঁসীর আসামী? তিন মাস পরে ফাঁসীর দড়িতে ঝুলতে হবে তাকে? কুনাল কী বলে? তার কী অভিমত এ বিষয়ে।

কুনাল বলল, এ নিয়ে মেডিকেল জার্নালে অনেক আলোচনা হয়েছে। এক একজন বিশেষজ্ঞ এক-এক রকম মত প্রকাশ করেছেন। কুনাল সে সব প্রবন্ধ

পড়ে এই সিদ্ধান্তে এসেছে যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রোগীকে তার আনবার আশ-
মৃত্যুর কথাটা না জানানোই ভালো। তাতে মৃত্যুপথযাত্রী যে-কদিন বাঁচে
আনন্দে বাঁচে, দুর্মনসাতায় ভুগে ভুগে বাঁচে না, আতঙ্কিতাঙ্কিত ফাঁসীর আসামীর
মত ছটফট করে বাঁচে না।

—হুতরাং তার কাছ থেকে খবরটা গোপন রাখাই মঙ্গল। কী বল
বাবাজী?

—আমার তাই মনে হয়।

—সেক্ষেত্রে তার পরিবারস্থ সকলের কাছ থেকেই খবরটা গোপন রাখতে
হবে।

—তা কেমন করে সম্ভব? আমাকে রিপোর্টটা দিতে হবে তো?

—না! দিতে হবে না। তোমাকে ডেকে নিয়ে গেছিলাম আমি। ‘ফিস’-
এর টাকা দিয়েছি আমি। তোমার সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্ক নেই। বল,
বিবেকে বাধছে?

একটু ভেবে নিয়ে কুনাল বলল, না! আমি রাজী।

—দ্বিতীয় কথা! আমাদের কর্তব্য এই তিন মাস রক্তনের জীবনটা যতখানি
সম্ভব আনন্দঘন করে তোলা? তাই নয়?

—সে তো নিশ্চয়ই।

—তাই আমি স্থির করেছি, তাকে আমার একটি কারবারে স্থায়ী চাকরি
দেব। বেশ মোটা মাইনের। ধর পাঁচ শ’? দু-তিন মাস! যাতে ছেলেটা
ফুটি-ফার্তা করতে পারে। কাজটা তুমি অনুমোদন করছ? বিবেকে বাধছে
না তো?

—কী আশ্চর্য! আপনি তাকে চাকরি দেবেন এতে আমার বিবেকে বাধবে
কেন?

—বলছি বাবাজী, বলছি! আমার সম্পূর্ণ পরিকল্পনাটা আগে পেশ করি।
তাহলে কী দি ডাল? তোমার হিসাবমত তিন মাস, না হয় চার মাসই হল—
আমাকে মা’হনা বাবদ দিতে হল হাজার দুই টাকা। তোমাকে সহকারী
হিসাবে পেতে তের মাস চারশ টাকা হিনাবে—হুদের কথা না হয় ছেড়েই
দিলাম—দাঁড়াল পাঁচ হাজার দু শ’। একুনে সাত হাজার দু শ’। চিকিৎসা
বাবদ, টুকিটাকি বাবদ ধর আরও হাজার-দেড় হাজার। তার মানে, নয়-সাত
নয়, মোটমোট দশ হাজার টাকা আমার গ্যাটগচ্চা যাচ্ছে। ঠিক কি না?

কুনাল বললে, আপনি কী করতে চাইছেন, বলুন তো?

—সেটায় ক্রমশ আসছি বাবাজী। আগে বল, ঐ দশ হাজার টাকার হিসাবে কোনও গল্ফ আছে ?

—না নেই। তাতে কী হল ?

—তার মানে—রজনকে তিন মাসের জন্ত শাস্তি দিতে হলে এবং তোমাকে পিতৃস্বপ্ন পরিণোদনের দখানি থেকে মুক্তি দিতে হলে আমাকে দশ হাজার টাকা খরচ করতে হচ্ছে। এ টাকাটা স্ৰাঘ্যত আমার প্রাপ্য ?

কুনাল বিরক্ত হয়ে বললে, এক কথা কতবার বলব আপনাকে ?

—না, না এবার কাজের কথাই আসি। শোন—

অকপটে উনি মেলে ধরলেন ওঁর পরিকল্পনার সামগ্রিক রূপটা। চক্রবর্তী-পুত্রের কাছাকাছি ওঁর একটা কাঠ-চেরাইয়ের কারখানা আছে। বনবিভাগ থেকে শাল-পিয়াশাল, গামার প্রভৃতির অঙ্গল ইজারা নেওয়া আছে। ট্রাকে করে ঐ কাঠ চেরাই-কলে আসে—সাইজ মত তৈরী হয় এবং বিভিন্ন স্থানে চালান যায়। চেরাই-কলে দশ-বিশ জন মানুষ খাটে। তারা মাহিনা করা ; কিছু লোকে খাটে ফুর্নে। এজন্য একজন ম্যানেজার রাখতে হয় তাঁকে। বর্তমানে পদটি খালি। ইতিপূর্বে যিনি ম্যানেজার ছিলেন তাঁকে উনি মাসে সাড়ে তিনশ করে মাইনে দিতেন। চেরাই-কলের সংলগ্ন দু-কামরার একটা ফ্ল্যাটও আছে। বিনা ভাড়ায় তাতে থাকা যাবে। ঐ ম্যানেজার-কাম-কেশিয়ার পদে তিনি রজন চক্রবর্তীকে অবিলম্বে বহাল করতে ইচ্ছুক। রজন মোটামুটি সুস্থ হলেই। তবে কেশিয়ার হিসাবে তাকে দু-পাঁচ হাজার টাকার লেনদেন করতে হবে—প্রমিকদের মাহিনা বাবদ, ট্রাকের ভাড়া ইত্যাদি বাবদ। খরিদারেরা অবশ্য সবাই চেক-এ পেমেন্ট করেন। তাই ক্যাশিয়ারের সিকিউরিটি হিসাবে চাকরিতে যোগদানের আগে রজন চক্রবর্তী একটা পনের হাজার টাকার ইনসিওরেন্স করবে—তার নমিনি হবেন নিয়োগকর্তা করালীকিঙ্কর।

কুনাল চমকে উঠে বলে, বলেন কি ? তা কেমন করে সম্ভব ? এ তো এস. আই. সি.-কে ঠকানো ! যে ডাক্তার ওকে পরীক্ষা করবে সে কেস-হিস্ট্রি শুনে ব্লাড-রিপোর্ট পরীক্ষা করাতে চাইবে না ?

সামনের দিকে ঘুঁকে পড়ে করালীকিঙ্কর বলেন, না, চাইবে না। কারণ তাকে অগ্রিম পাঁচ হাজার দু শ টাকা ফি দেওয়া হয়েছে।

কুনাল স্তব্ধ বিষ্ময়ে পুরো এক মিনিট তাকিয়ে থাকল।

করালী বললেন, এতে তোমার কোন রিস্ক নেই বাবাজী। এখন রোগের

প্রথমাবস্থা। তুমি ওকে অ্যানিমিক বলে সন্দেহ করছ। ব্লাড-রিপোর্ট পরীক্ষা আদৌ করানো হয়নি। কেমন?

কুনালের নীরবতাকে সম্মতির লক্ষণ বলে ধরে নিলেন করালীকিঙ্কর। তারপর বললেন, আর একটা কথা বাবাজী। আমাকে বুঝিয়ে বলত—মাস দু-তিন আগে ওর রক্ত-পরীক্ষা করালে এ রোগ ধরা পড়ত?

—বলা যায় না। মাস ছয়েক আগে করালে নিশ্চয়ই পড়ত না।

—তাহলে একটি কাজ তোমাকে করতে হবে। তুমি তো সিনিয়র প্যাথলজিস্ট। সব কলকাঠিই তোমার হাতে। মাস ছয়েক আগের তারিখে একটা রিপোর্ট তোমাকে দিতে হবে, যাতে হোয়াইট ব্লাড করপাসুলস্-এর পার্সেন্টেজ বিপদসীমার নীচে।

বিশ্বয়ে স্তম্ভিত হয়ে যায় কুনাল। বললে, লিউকেমিয়া রোগটার সম্বন্ধে এত কথা আপনি জানলেন কেমন করে?

—সামান্য পড়াশুনা করতে হয়েছে, বাবাজী। সব দিকে আটঘাট বেঁধে না রাখলে ‘বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো’ হয়ে যেতে পারে তো?

—বুঝলাম, কিন্তু ছয়মাস আগের ঐ ফলস্ রিপোর্টটা কেন দরকার হচ্ছে?

—তোমার নিরাপত্তার জন্ত, বাবাজী! তুমি রামতারণের ছেলে। তোমার দিকটাও তো আমাকে দেখতে হবে। না কি বল? এ নিয়ে ভবিষ্যতে যদি কোনও এনকোয়ারী হয়, তাহলে তুমি একটা স্ট্যাণ্ড নিতে পারবে: ছয় মাস আগেই তুমি ওর ব্লাড-কাউন্ট পরীক্ষা করেছ! তাই এ জাতীয় সন্দেহ তোমার মনে জাগেনি। ও অ্যানিমিক, ব্লাড-ক্যানসারের রোগী নয়!

কুনাল একটু ভেবে নিয়ে বললে, এটা আপনি ঠিকই বলেছেন ঠাকুরমশাই।

—তাহলে বেলা বারোটা নাগাদ তোমার ল্যাবরেটোরিতে যাব। তুমি একটা ব্যাক-ডেটেড নেগেটিভ রিপোর্ট লিখে রেখ।

বুদ্ধ উঠে দাঁড়ান। কুনাল বলে, বন্ধন। একটা কাজ বাকি আছে করালী-কাকা। আপনার বুক পকেটে রাখা ঐ খামটা আমাকে ফেরত দিতে হবে।

—কেন? এটা আর তোমার কোন কাজে লাগবে? আজকের ডেট-এর পজেটিভ রিপোর্ট তো তোমাকে আদৌ লিখতে হবে না।

কুনাল হাসল। বলল, তা হোক। আপনি আমার হিতাকাঙ্ক্ষী। আমার বাবার বন্ধু। তার চেয়ে আরও নিকটতর সম্পর্ক স্থাপিত হল আপনার সঙ্গে—‘পার্টনার ইন ক্রাইম।’—তবুও ওই খামটা কি আপনার কাছে রাখতে পারি? আজকের তারিখে ‘Px-403. Mr. R. Chakrabarty’-র নাম লেখা ব্লাড-

রিপোর্টটা? রক্তের পনের-বিশ হাজার টাকার পলিসিটাতে ডাক্তার হিসাবে তো আমিই মই করব?

—তুমি আমাকে অবিশ্বাস করছ বাবাজী?

কুনাল সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে। তার চোখ দুটো অগ্নি ওঠে। বলে, করছি। পার্টনার-ইন-ক্রাইম-দের ধর্মই এটা। দুজনেই চিন্তা করে—সহযোগী ডব্লু-ক্রশ করার সুযোগ পাচ্ছে কি না।

করালী খামটা পকেট থেকে বার করে নাড়াচাড়া করেন। বললেন, তুমি এতবড় কথাটা বললে বাবাজী! তুমি আমাকে অবিশ্বাস কর?

—কেন? আপনি করেন না? আপনি আমাকে অবিশ্বাস করছেন না?

—আমি! কেমন করে?

—আমি কি ঘাসের বিচি খাই? আমি কি বুঝি না, কেন ঐ রিপোর্টখানা নিয়ে যেতে চাইছেন আপনি?

—কেন? তুমিই বল?

—দুটি কারণে। প্রথম কথা, আমার যত্নবান আপনার কাছে গচ্ছিত থাকল। খামের উপর ঐ 'Px-403. Mr. R. Chakrabarty' কথাগুলো যে আমার স্বহস্ত-লিখিত তা হস্তরেখা-বিশারদ প্রমাণ করবে। ভিতরের রিপোর্টেও লেখা আছে ঐ নাম, দেওয়া আছে আজকের তারিখ। এ থেকে আমি শুধু ডিগ্রিই খোঁজাব না; জেলেও যেতে পারি। তাই না?

কুনাল হাসল। বুদ্ধ নির্বিকার ভাবে শুধু বললেন, দ্বিতীয় কারণ?

—দ্বিতীয় কারণ, আপনিও আমাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করছেন না। আমি ডব্লু-ক্রশ করছি কি না জানতে ঐ রিপোর্টটা নিয়ে যাচ্ছেন। অস্ত্র হোনও বিশেষজ্ঞকে দিয়ে আপনি যাচাই করে ভেনে নিতে চান ঐ রক্তে কত পার্সেন্ট খেত রক্ত-কণিকা আছে। ঐ বোগী কত দিন বাঁচবে। আমি আপনাকে দোষ দিচ্ছি না, করালীকাকা। ক্রাইম-এর ধর্মই এট! প্রতিটি পদক্ষেপ সাবধানে ফেলতে হয়। পার্টনার ইন-ক্রাইমকে সন্দেহ করতে হয়।

করালী হাসলেন। বললেন, তুমি জীবনে উন্নতি করবে বাবাজী।

কুনাল নীরবে প্রতীক্ষা করে। করালী খাম থেকে ব্লাড-স্লাইড ও রিপোর্টটা বার করলেন। রিপোর্টের মাথায় ঐ যেখানে লেখা আছে 'Px-403 Mr. R. Chakrabarty' সেই অংশটা ছিঁড়ে নিয়ে ফের ঐ খামে ভরলেন। তারপর পকেট থেকে দেশলাই বার করে একটি কাঠি জাললেন। নিপুণ হাতে—যেন এভাবে কাগজ পুড়িয়ে ফেলাই তাঁর পেশা—নিঃশেষে পুড়িয়ে ফেললেন খামটা।

একটি সাফা কাগজে এবার ঐ আইড ও নাম-তারিখহীন রিপোর্টখানা জড়িয়ে নিয়ে পুনরায় বুক পকেটে ভরলেন। একগাল হেসে বললেন : কুইট্‌স্‌। কেউ কারও স্বভাবাণ নিজেই জিন্মায় রাখল না। কাল বারোটায় সময় দেখা হবে। ব্যাকুডেটের রিপোর্টটা ঘেন তৈরী থাকে। আমি তোমাকে কালই নিয়ে যাব বাগুইআটি। ইনসিওরেন্স ফর্ম আমি সঙ্গে নিয়েই আসব। বিকেলটা ফ্রি রেখ। চলি।

টুঠে দাঁড়ালেন করালী। কুনালও। বলল, একটু ভুল হল করালীকাকা। কালকে শুধু ইন্সিওরেন্স ফর্ম আর মেডিকেল ফর্ম আনলেই তো চলবে না, ঐ সঙ্গে—

বাধা দিবে করালী বললেন, মনে আছে বাধাজী !

॥ ৮ ॥

ওরিয়েন্টাল ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটোরিতে অতসীই বোধহয় আজ প্রথম ভিজিটার। কাঁটায় কাঁটায় দশটার সময় সে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে এল। মাঝে একটা ‘হল-কামরা’। সারি সারি বেকি, দেওয়াল ঘেঁষে। মাঝখানে একটা গোল টেবিল। তার চারদিকে চেয়ার। টেবিলে নানান আতের পত্রিকা—বেশ কিছু মেডিক্যাল জার্নাল এবং রোটোরিয়ান অথবা লায়ন্স ক্লাবের পত্রিকা। দু-চারটি ইন্সস্ট্রুটেড টাইকাকও আছে। হল-ঘরের তিনদিকে ডাক্তারদের চেয়ার। এক-দিকে একটি কাউন্টারে একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক বসে আছেন। অতসী তাঁর কাছে এগিয়ে গিয়ে বললে, ডক্টর কুনাল বহু এসেছেন।

—হ্যাঁ, একটু আগেই এসেছেন। আপনি এই ভিজিটার্স স্লিপে নাম-ঠিকানা লিখে দিন, আর একটু অপেক্ষা করুন।

বৃদ্ধের নির্দেশে স্লিপটা নিয়ে একজন ছোকরা সামনের ঘরখানায় ঢুকে গেল।

অতসীর লক্ষ্য হল তাতে কুনালের নেমপ্লেট বসানো আছে।

একটু পরেই ছেলেটি এসে বললে, আপনাকে ডাকছেন।

অতসী স্টুট-ডোর ঠেলে ঘরে প্রবেশ করল। হরতো হাত তুলে নমস্কার করাটাই প্রথা, অতসী তা করল না। বলল সামনের চেয়ারটায়।

কুনাল হাতঘড়ির দিকে একনজর দেখে নিয়ে বললে, ওভার-পারফরম্যান্স।

অতসী জবাব দিল না।

কুনাল বলল, খেয়ে-দেয়ে বেরিয়েছ নিশ্চয়। এখান থেকে অফিস করবে ?

অতসী বললে, খেয়েই বেঁচেছি। তবে অক্লিষ্ট করব কিনা এখনই বলতে পারছি না। সেটা নির্ভর করছে তুমি কী বলবে তার উপর।

কুনাল একটু নড়ে চড়ে বলল। তারপর বলল, তার মানে তুমি বাণ্ডই খাটিও যেতে পার ?

শরদ্বিধ পাখির মতো অতসী বললে, আসল কথাটা বলে দিলেই ভাল হয় না কি ?

কুনাল মনস্থির করেই রেখেছিল। তৎক্ষণাৎ বললে, ব্রাড-রিপোর্টের রিজাল্টটা তো ? সেটা এখনো হাতে পাইনি। রমেন, খানে আমার অ্যানালিস্টেটের কাছে আছে। এখনই এসে পড়বে। সে এলেই সেটা দেখে—

—তার মানে ? তুমি নিজে পরীক্ষা করনি ?

—আমিই করেছি। কিন্তু রিপোর্টটা আমার কাছে নেই।

—তুমি বলতে চাও যে, রিজাল্টটা পজেটিভ না নেগেটিভ তা তোমার মনে নেই।

কুনাল একটু অপ্রস্তুত হল। ইতস্তত করে বললে, দিনে আমি দশ-বিশটা কেস দেখে অতসী। সব কি আর মনে থাকে ?

অতসী অনেকক্ষণ জবাব দিল না। তারপর তার চোখ দুটি জলে ভরে এস। বলল, তুমি মিছে কথা বলছ কুনাল। এ হতে পারে না। তুমি জান, নিশ্চয়ই জান, আমার কাছে ভাঙছে না। তার মানে ওর নিউকেমিয়াই হয়েছে।

—জারে না না।—কুনাল আরও কুণ্ঠিত—রিয়েলি আমার মনে নেই। কাল আমি সাতটা ব্রাড-রিপোর্ট দেখেছি। ব্রাড কাউন্ট করেছি। ঠিক কোনটার কী রিপোর্ট...কিন্তু রমেন এখনই এসে পড়বে। তুমি ব্যস্ত হচ্ছে কেন ?

—ঈশ্বরের দ্বিবি্য করে বলতে পার যে, তোমার মনে নেই ?

যে ঈশ্বর আছেন কি নেই এ বিষয়েই কুনাল স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারেনি তাঁর নাম নিয়ে সে অনায়াসে বলতে পারল : ঈশ্বরের দ্বিবি্য।

এতক্ষণে একটু শান্ত হল অতসী। বললে, আশ্চর্য মানুষ বাপু তোমরা।

—কী করব বল ? প্রত্যহ দশটা করে হলে গড়ে মাসে তিনশ লোকের ফোয়া জারি করতে হয়। কেউ ছাড় পায়, কেউ সম্রাণ কাগজও তোগে, কেউ বা ফাঁসির দাঁড়িতে ঝোলে। আমাদের মনে ঘাটা পড়ে গেছে। রুগীরা আমাদের কাছে পুরুষ নয়, নারী নয়—একটা নয়। রজন চক্রবর্তী বলে আমি কাউকে চিনি না। চিনি—পি, এক্স-403 কে।

অতসী সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে বলল, এ হতে পারে না কুনাল। তুমি

ওর সিরিয়াল নম্বরটা পৰ্বত মুখস্থ রেখেছ অথচ সেটা পজেটিভ না নেগেটিভ, তোমার মনে নেই ?

কুনাল বুঝতে পারে—অসতর্ক মূহুর্তে সে প্রচণ্ড ভুল করে বসেছে। তৎক্ষণাৎ সামলে নিয়ে বলে, নানা, ওটা একটা কথার কথা। রজন চক্রবর্তীর নম্বর পি, কিউ 304ও হতে পারে। আমি উদাহরণ হিসাবে বাহোক একটা নম্বর বললাম।

অতসী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে দেখে কুনাল বললে, অপেক্ষাই যখন করতৈ হবে তখন একটু ‘কফি স্ট্রোক চা’ পাব করা যাক !

—‘কফি স্ট্রোক চা’ মানে ?

—অর্থাৎ আমার কফি, তোমার চা।

এতক্ষণে প্রথম হাসল অতসী। বললে, ভোলনি দেখছি !

কুনাল বেশ বাড়িয়ে ছোকরা-শিয়নটাকে ডাকল, এক কাপ চা আনতে বলল। অর্ডার নিয়ে ছেনেটি চলে যেতেই অতসী বললে, তোমার কফির কথা বললে ২। ?

—আমি বাড়ি থেকেই নিয়ে আসি। ফ্রাঙ্ক আছে।

কফিটা কে বানিয়ে দিয়েছে এ কথা জানতে চাইল না অতসী। বরং বললে, ঠাকুরমশায়ের সেই ইন্সটলমেন্ট শেষ হয়েছে ?

কুনাল বললে, এতদিনে মিটল। এ মাসেই শেষ হচ্ছে।

—যাক, বাঁচলে তাহলে এতদিনে। এবার কি রানাঘাটে চলে যাবে ?

—সেটাই তো পরিকল্পনা ছিল, কিন্তু বন্দনার তাতে আপত্তি।

এই প্রথম একটি মেয়ের নাম উচ্চারিত হল, যে মেয়েটি একজনের সহোদরী অপরাধনের সহধর্মিণী। অতসী বুঝে উঠতে পারে না, পরবর্তী প্রশ্ন করাটা শোভন হবে কিনা। অর্থাৎ কী কারণে ছোটখুঁকি এতবড় সূযোগটা নিতে চাইছে না। রানাঘাটে কুনালের বাবা পশারওয়াল ডাক্তার ছিলেন। তাঁর অতবড় পশারটা কুনাল সহজেই হাত করতে পারবে—অনেকেই তাকে জেনেন, ডাক্তার রামতারণ বোসের ছেলে বলে। তাছাড়া বাড়িটাও বড়। হাত পা মেলে থাকতে পারবে। এখানে ঐ এক কামরার সম্বন্ধ করা পরিবেশে—

কুনাল নিজেকে থেকেই বললে, ও কলকাতা ছাড়তে চায় না। কী যে কলকাতার আকর্ষণ, তা ওই জানে।

অনেকক্ষণ থেকেই ইতস্তত করছিল অতসী। শেষেষ্ট বলেই ফেসল কথাটা, আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ না রাখাটার মূলে কে ? তুমি, না...

‘ছোটখুকি’ বলবে না ‘বন্দনা’, বুকে উঠতে না পারায় বাক্যটা শেষ করে না।
‘তাতে অবশ্য বুঝতে অসুবিধা হল না কুনালের। লগ্নাভিত্তিক মত বললে, যৌথ
ইচ্ছাও তো হতে পারে।

অতসী শুধু লগ্নাক্ষেপে বলল, ও!

এ নিয়ে শব্দব্যবচ্ছেদে সে রাজী নয়। তা তো হতেই পারে। দুজনের একই
রকম ইচ্ছা হওয়াটা অস্বাভাবিক হবে কেন? কুনালের সঙ্গে অতসীর ক্রমাগত
মতের অমিল হত। বন্দনার সঙ্গে হয়তো তা হয় না। এটা তো আনন্দের
কথা। ওদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মনের মিল হলে তার তো খুশিই হওয়া উচিত।

কুনাল বলতে থাকে, প্রথম দিকে ওই আপত্তি ছিল। এখন আমার মনে
হয় ওর যুক্তিটা ঠিক।

এবার অতসী কোন কোতূহল দেখালো না। কুনালই পুনরায় বলে, বন্দনা
জানে যে, আমাকে পেলেও আমার গোটা মনটার উপর তার অধিকার বর্তায়নি।
সেটা সম্ভবও নয়। ওর সে কমতাই নেই। আমার ঘেসব জিনিস ভাল
লাগে, ঘেসব বিষয়ে কথা বলতে ইচ্ছা করে, আলোচনা করতে ইচ্ছা করে ও তার
ধারও ধারে না। খবরের কাগজ ও পড়ে না, কোন সাহিত্য পত্রিকাও নয়।
অথচ আমিও ওর হাত ধরে ওর ‘আনন্দলোকে’র ধান-বাৎ-এ আনন্দ পাই না।
ফলে, সে তোমার বিষয়ে স্বতঃই আতঙ্কিত।

অতসী বলল, এ ধানবাৎ-এ আমিও কিছু আনন্দ পাচ্ছি না কুনাল।

কুনাল কি যেন বলতে যাচ্ছিল তার আগেই ছোকরা-পয়ন এক কাপ চ নিয়ে
প্রবেশ করল। কুনাল উঠে দাঁড়ায় কাপটা নিয়ে অহেতুক অতসীর পিছন
দিয়ে একচকর ঘুরে এসে কাপটা রাখল টেবিলের উপর।

ব্যাপারটা কিন্তু নজর এড়ায়নি অতসীর। বললে, তুমি চায়ের কাপে কী-
একটা মিশিয়ে দিলে কুনাল! কী ওটা?

কুনাল হেসে ফেলে। বলে, তোমার মাথার পিছন দিকেও যে দুটো চোখ
আছে তা তো জানা ছিল না। ও কিছু নয়, পটাশিয়াম সায়ানাইড। খেয়ে
ফেল।

অতসী একটুকণ অস্বাক হয়ে চেয়ে রইল। তারপর নির্বিকারভাবে কাপটা
টেনে নিল। ফ্লাস্ক থেকে কফি ঢেলে নিয়ে কুনালও বসল জুং ধরে।

পানীয় কাপ দুটি শেষ হলে কুনাল উঠল। বলল, বস, দেখে আসি যমেন
এসেছে কিনা। ও, ভাল কথা, কালকে তোমাকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে-
ছিলাম, তুমি তার অবাব দাওনি।

অতসী বললে, সেটা শুনে আমিও একটা প্রাণপ্রশ্ন করেছিলাম—জিজ্ঞাসা করেছিলাম—কোন অধিকারে এ প্রশ্নটা তুমি জিজ্ঞাসা করেছ ?

—কাল তার জবাব দিইনি। আজ দিচ্ছি। তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী বলে। যে অধিকারে আমি তোমার চারের কাপে পটাশিয়াম সায়ানাইড মিশিয়ে দিয়েছি বলার পরেও তুমি নির্বিকার চিত্তে ওটা খেয়ে ফেললে, সেই অধিকারে।

অতসী বললে, তুমি হাতে তুলে দিলে বিষ হয়তো খেতে পারি, কিন্তু আমার ব্যক্তিগত জীবনের বেদনা দিয়ে তোমার সুখী জীবন বিবিয়ে দিতে পারি না।

অভিমান। এ অভিমান করবার হক আছে অতসীর। আছে কি ? সেই তো ক্রমাগত প্রত্যাখ্যান করে গেছে কুনালকে। এখন এসব সেন্টিমেন্টাল হা-হুতাসের ষোড়শিকতা কোথায় ? ‘আমি জেনেওনে বিষ করেছি পান’, এখন এ উক্তি মেলোড্রামাটিক।

কুনাল সুইং ডোর ঠেলে বাইরে বেরিয়ে গেল। খানিক পরে ফিরে এসে বসল তার চেয়ারে। তার হাতে একখানা কাগজ। আর যেন চোখে চোখে তাকাতে পারছে না। অতসী খুঁকে পড়ল সামনের দিকে। কুনাল দেখতে পেল—টেবিলের প্রান্তটা সে শক্ত করে ধরে আছে। অতসী উত্তোষিত। অত্যন্ত উত্তোষিত। বললে, রিপোর্টটা পেরেছ ?

কুনাল অশ্রুতে বললে, ইয়েস ! আরাম করি।

বিল্যাক্স। অতসী ধীরে ধীরে চেয়ারে পিঠ হেলান দিয়ে বসল। নির্বাক দৃষ্টিতে ঘূর্ণ্যমান সিলিং ফ্যানটার দিকে তাকিয়ে রইল কয়েকটা মুহূর্ত। কুনাল তাকে লক্ষ্য করছে। সে জানে অতসী অজ্ঞান হয়ে যাবে না, নার্ভাস ব্রেকডাউন তার হবে না। ট্যাবলেটটা এতক্ষণে ওর সারা স্নায়ুতন্ত্রীতে কাজ করেছে। কুনালই পুনরায় বললে, একটু আগে বলছিলাম—আমার মনে ঘাঁটা পড়ে গেছে। জীবন আর মৃত্যুর মধ্যে আমরা কাছে পার্থক্য বতবগুলো মেটাবলিক সিমটম্‌স্। ভুল বলেছিলাম অতসী। ঐ ছেলেটার জন্ত এখন আমরা ...

কথাটা ওর শেষ হল না। অতসীর দু'গাল বেয়ে নেমে এল ওর অসমাপ্ত পাদপূরণ।

কুনাল বললে, একটু বিশ্রাম কর এখানেই। অফিস আর যেও না। আফি তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দেব এখন।

অতসী ধীরে ধীরে বলল, শুনেছি ব্লাড-ক্যান্সারের চিকিৎসা নেই এমপেচমেন্টিয় ?

—সত্যি।

—কতদিন ও বাঁচবে বলে আশা কর ?

—বলা শক্ত । যত তাড়াতাড়ি মুক্তি পায় ততই তো ভাল । অন্তত আমার তো তাই মনে হয় । চার মাসের বেশি নয়, আগেও হতে পারে ।

অতসী প্রতিধরের মত বলল : চার মাসের বেশি নয়, আগেও হতে পারে !

আরও কিছুকণ নির্বাক অপেক্ষা করার পর কুনাল বলে, অতসী, আমি তখন তোমাকে মিথ্যা কথা বলেছিলাম । তুমি ঠিকই ধরেছিনে । কেসটার কথা আমার অজানা ছিল না । কাল থেকেই আমি জানি, রক্তন চক্রবর্তী মৃত্যুর পরোয়ানা পেয়েছে ।

যা আশা করেছিল তা হল না । অতসী জানতে চাইল না, এমন অহেতুক মিথ্যাচরণ কেন করল সে । কুনাল চাইছিল, কথাবার্তা বলে অতসীর স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনতে, তার মানসিক ভারসাম্য ফিরিয়ে আনতে । তা হল না । অতসী নিশ্চুপ থাকিয়ে রইল তার দিকে । কৌতূহলী হল না আদৌ । তখন কুনাল নিজে থেকেই আবার বলল, তোমাকে আমি অহেতুক ঐ প্রশ্নটা করেছিলাম, যার জবাব তুমি দিলে না । আমি জানতাম, তুমি প্রচণ্ড একটা আঘাত পাবে । তাই ডাক্তার হিসাবে একটু সাবধান হতে চেয়েছিলাম । ঐ ট্যাবলেটটা আগে খাইয়ে দিয়ে খবরটা দিয়েছি । ঈশ্বরের নামে মিথ্যা শপথ করেছি সেজন্যই ।

তবু কোন ভাবান্তর হল না অতসীর । এসব কথাই কোনও অর্থ বোধহয় তার কাছে ছিল না তখন । আরও কিছুকণ অপেক্ষা করার পর অতসী যা বলল তার সঙ্গে কুনালের আলাপচারিত্তির কোনও প্রাসঙ্গিকতা রইল না । বললে, জান কুনাল, আমার মন বলছিল তুমি পড়েটিত রিপোর্টই পাবে ।

—কেন ? এমন সঙ্গে কেন হল তোমার ?

—বোকা ছেলেটা কেন আমাকে বুকে টেনে নিয়েছিল ?

এবার কুনালকেই চুপ করে যেতে হয় । বুকে উঠতে পারে না, এমন অন্তরঙ্গ গোপন কথাটা কেন বলছে অতসী । ঐ সঙ্গে তার একথাও মনে পড়ে গেল—দীর্ঘ পাঁচ-ছয় বছরের ঘান্ঠ পরিচরে সে কোনদিন অতসীকে বুকে টেনে নেয়নি ।

—একবার নয় । বার বার ! গত একমাসে অন্তত দশবার !

এবারে কুনাল একটু অসহায় বোধ করে । এ জাতীয় সংখ্যাতত্ত্ব উঠে পড়তে পারে তা যেন ভাবতেই পারেনি । একটু অস্বস্তি হয় । অতসীর ভিলিফ্লিয়ার হওয়ার মত কোন কিছু ঘটেনি । তাহলে এসব কথা উঠছে কেন ?

না, ভিলি'রিয়াম নয়। অতসীই রহস্যটা পরিকার করে দেয়। বলে, না, ভূমি যা ভাবছ তা নয়। আমরা দুজনেই অফিস-থিয়েটারে পার্ট নিয়েছি। গ্রিহার্গালের সময় একটি দৃষ্টে রজন আমাদের জড়িয়ে ধরে। কিন্তু...বুঝতে পারছ...আমার নিঃশ্বাসেই ওর...

বুঝেছে। বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। সেই বিশিষ্ট স্থপাতিশান।
কুনাল প্রতিবাদ করে, কী পাগলামি করছ অতসী? তাই কখন হয়? তোমার নিঃশ্বাসে ওর ব্রাড ক্যামার হল?

অতসী কি যেন বলতে যাচ্ছিল, তাকে ধামিয়ে দিবে কুনাল আবার বলে ওঠে, থাক অতসী। এ নিয়ে তর্ক করতে চাই না আমি। বহু তর্ক করেছি। তোমার সংস্কারকে তাড়াতে পারিনি। সে যাই হোক, অল্প কয়েকটি জরুরী কথা তোমাকে বলে নিতে চাই। প্রথম কথা, এইমাত্র যে খবরটা তোমাকে জানালাম সেটা যেন সম্পূর্ণ গোপন থাকে।

—কেন কুনাল?—জানতে চায় অতসী।

—আমরা চাই না, রুগী জানতে পারে তার লিউকেমিয়া হয়েছে। কেন? একটু ভেবে দেখ ব্যাপারটা—

যুক্তি দিয়ে কুনাল বোঝাতে থাকে। অনেক অনেক কথা বলল সে।

এ জাতীয় রোগীকে প্রগ্নসিস্টা জানানো উচিত কি অসুচিত এ বিষয়ে চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা দ্বিমত। বহু তর্ক, আলোচনা, লেখালেখির পর তাঁরা যে সিদ্ধান্তে এসেছেন তা এই রকম—

লিউকেমিয়ার রোগী দু-জাতের হতে পারে। শতকরা পঁচানব্বই জন হচ্ছে সাধারণ মানুষ। তাদের ক্ষেত্রে রোগের কথাটা গোপন রাখাই বাঞ্ছনীয়। যেদিন রোগ নির্ণয় হল, সেদিন থেকে কয়েকমাসের মধ্যেই রোগীর জীবনাবসান হবে। অস্বাভাবিক ভাবে। তার যত্নকার কিছু ব্যবসান হয়তো করতে পার, কিন্তু দুর্বীর-বেগে মৃত্যু যে তার কাছে প্রতিটি সেকেন্ডে এগিয়ে আসছে তা ঠেকাবার ক্ষমতা বিজ্ঞানের নেই। এক্ষেত্রে ঐ যে-কটা দিন সে বাঁচবে তাকে স্তব্ধে স্বচ্ছন্দে বাঁচতে দেওয়াই কি বাঞ্ছনীয় নয়? তার আত্মীয়-স্বজন-বন্ধুর দল যদি ক্রমাগত অশ্রুর বজ্র তার ঐ সীমিত যাত্রাপথটুকু পিচ্ছিল করে দেয়, তাহলে কোন চতুর্ভুজ লাভ হবে? তার চেয়ে অনেক অনেক ভাল—খবরটা গোপন রাখা। হয়তো আত্মীয়-স্বজন-বন্ধুর পক্ষে সেটা কষ্টকর। অস্বচ্ছন্দে যখন ভিতরে ভিতরে পুড়ে থাক তবু যাচ্ছ তখন তাদের গান গাইতে হয়, রসিকতা করতে হয়, হৈ-হুল্লোড়ের পরিবেশটা হালকা রাখতে হয়। কিন্তু এটুকু কষ্ট তোমাকে স্বীকার করতে হবে

—ঐ হতভাগার মুখ চেয়ে—সে আর কদিন ? তোমাদের এ যন্ত্রণার অবসান হতে তো আর বাকি নেই ! দাঁও না শুকে একটা স্থযোগ—এ কটা মাস হেলে যেতে !

ভেবে দেখ যাঁধিটির নেই জবাবটা—‘কমাশ্চর্যমতঃপরম্ !’ যত্ন তোমার শিরের দাঁড়িয়ে আছে । অনিবার্যভাবে । তবু তুমি হাসছ, খেলছ, গান গাইছ, নাচছ । কেন পারছ ? যেহেতু তোমার জানা নেই সে দিনটা কবে আসবে । সেই অনিবার্য কালো ঘোড়সওয়ার কতদূরে । করে পড়া কদম্বের কেশর সুগন্ধির আশ্রয় লিপি নিয়ে যে দিন সেই অতিথি এসে দাঁড়াবে তখনই তোমাকে হত হতে হবে—তুমি প্রস্তুত কি অপ্রস্তুত সে জানতে চাইবে না । তুমি জান না যে দিনটা কেমন : শিউলি ঝরার শুক্লরাত, দক্ষিণের দোলালাগা বসন্ত প্রভাত, হেমন্তের দিনান্ত বেলা, অথবা ঝিল্লিসঘন-সঘন বাইশে শ্রাবণ ।

আর জানা না বলেই সে বিষয়ে তুমি সচেতন নও—নিজেকে অজ্ঞ অমং বলে ধরে নিয়েছ । হেলে খেলে কাটিয়ে দিচ্ছ জীবনটা । কিন্তু যে মুহূর্তে তোমাকে বলে দেওয়া হল : তোমার জীবনের মেয়াদ এতদিন—অমান ছুনিয়া হারিয়ে গেল তোমার দৃষ্টি থেকে, ডেগে রইল শুধুমাত্র সেই কালো ঘোড়সওয়ারের মূর্তিটা । কৃষ্টির ধারা পতনে, তবলার তেহাইয়ে, সেতারের ঝালায় এবং ঘাড়ের পেণ্ডুলামে তুমি শুধুই গুন্তে পাবে সেই কালো-ঘোড়সওয়ারের অশঙ্কুধ্বনি—অনিবার্য ভাবে সে এগিয়ে আসছে, তিল তিল করে প্রতিটি ঘণ্টা-মিনিট সেকেন্ড প্রতিটি খণ্ড মুহূর্তে !

যদি পার, তাতলে ঐ হতভাগাকে মুক্তি দাঁও এ যন্ত্রণা থেকে । কেন পারবে না ? তোমাদের হাতে তো আছে আরও অনেক অনেক শিউলি-ঝরার শুক্লরাত, দোলা-লাগা বসন্ত, ঝিল্লিসঘন শ্রাবণসন্ধ্যা অথবা হেমন্তের শিশিরস্নাত প্রভাত । সে সব দিনে তো ঐ হতভাগাটার পায়ে চিহ্ন পড়বে না তোমাদের বাটে, সে তোমাদের আনন্দের পশরায় ভাগ বসাতে আসবে না । তাহলে কেন পারবে না ঐ কটা দিন তাকে হেসে-খেলে গান গেরে কুরিয়ে যেতে ?

তাই ডাক্তারবাবু বলেন, শতকরা ঐ পঁচানব্বইটি ক্ষেত্রে সংবাদটা গোপন রাখাই বিধেয় ।

অতীত এতক্ষণে অনেকটা স্বাভাবিক হয়েছে । বললে, বাকি পাঁচটি ক্ষেত্রে ?

—সংখ্যাতত্ত্ব বলছে, বাকি ঐ পাঁচটি ক্ষেত্রে সংবাদটা রোগীকে জানানোই মঙ্গল । তাঁরা ব্যতিক্রম ; তাঁরা সাধারণ মানুষ নন । হয় বিজ্ঞান, নয় দর্শন, অথবা ধর্মের মাধ্যমে তাঁরা সাধারণের সমভূমি থেকে স্থিতপ্রজ্ঞের মালভূমিতে

উঠে গেছেন। তাঁরা শান্ত সমাহিত চিত্তে আঘাতটা গ্রহণ করেন। কালো-ঘোড়সওয়ারটা তাঁদের কাছে এসে দাঁড়াতে লজ্জা পায়। আসতে তাকে হয়ই; কিন্তু জানে, তার সবটুকু ভয়াল ক্রকুটিই বার্থ। সে এসে দাঁড়ালেই মৃত্যুপথযাত্রী বলে বসবে। এসেছ বন্ধু, নাও হাতটা ধর, আমি প্রস্তুত।

কুনাল ওকে শোনাল অনেক অনেক রোগীর কথা। স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের দেহাবসান হয় ক্যালিফোর্নিয়ার আক্রমণে—ব্রাউ ক্যালিফোর্নিয়ায় নর যদিও। শোনাল নির্ভীক বৈমানিক চার্লস অগস্টাস লিওবার্গের কথা—সেই যিনি 1927 সালে একা একটি বিমান নিয়ে প্রথম অতলান্তিক মহাসাগর পাড়ি দিয়েছিলেন। শেষ বয়সে তিনি যখন অসুস্থ হয়ে পড়লেন তখন ডাক্তার এল তাঁকে দেখতে। রক্তপরীক্ষা করে দেখা গেল—লিউকেমিয়া। ঠুঁর মেয়াদ আর ছয় মাস। ডাক্তারবাবু জনান্তিকে মিসেস লিওবার্গকে ডেকে বলেছিলেন, খবরটা ঠুঁর কাছ থেকে গোপন রাখাই বাঞ্ছনীয়।

রাজী হতে পারেননি মিসেস লিওবার্গ। বলেছিলেন, আমি জীবনে কোন কিছু তাঁর কাছ থেকে গোপন করিনি। আজও করব না। তাঁকে আমি চিনি। তাঁকে সব কথা খুলে বলাই ভালো।

তাই হয়েছিল। চার্লস লিওবার্গ শুনে বলেছিলেন, খবরটা আমাকে জানিয়ে খুব বুদ্ধিমতীর মতো কাজ করেছে, স্যার। ছ-মাস সময় তো অনেক। ছেলেরা-মেয়েদের টেলিগ্রাফ পাঠাও। সকলকে একবার শেষবারের মত দেখে যাব। আর আমার আত্মজীবনীটাও শেষ করতে হবে।

কালো ঘোড়সওয়ারটা লজ্জায় অধোবদন হয়েছিল সেদিন।

রঞ্জন চক্রবর্তী সেজাভের মাহুষ নয়। সে রামকৃষ্ণও নয়, চার্লস লিওবার্গও নয়।

অতসী স্বীকার করল এই যুক্তি।

কুনাল বলল, আর একটা কথা অতসী। সেই কথাটা বলবার জন্তই তোমাকে বিশেষ করে ডেকেছি। আর সেজন্তই গোপন কথাটা তোমাকে জানালাম। আসলে রঞ্জনের দাদা-বৌদিকেও খবরটা জানানো হয়নি। তাঁরা হয়তো সব জেনে শুনে অতবড় অভিনয় করতে পারতেন না। একথা জানেন শুধু ঐ ঠাকুর মশাই, তুমি আর আমি। বুঝলে?

অতসী বললে, বিশেষ কথাটা কী? কা জন্তে আমাকে একথা জানালে?

কুনাল একটু অপেক্ষা করল। তারপর যেন মনস্থির করে বলল, না, ঠুনকো

লোকলজ্জার দোহাই দিয়ে আমরা যদি নীরব থাকি তাহলে সেই হতভাগার প্রতি অবিচার করা হবে—

—কী বলতে চাইছ তুমি ?

হঠাৎ সামনের দিকে খুঁকে বসে কুনাল। অতসীর হাতখানা তুলে নিয়ে দুটি মুঠিতে বন্দী করে। আবেগঘন কণ্ঠে বলে, অতসী! একমাত্র তুমিই পার ওর এই তিনমাসের জীবনটাকে আনন্দঘন করে তুলতে। সার্থক করে তুলতে।

ধীরে ধীরে হাতটা ছাড়িয়ে নেয়। বলে, তোমার তাতে কিসের আগ্রহ ?

কুনাল বললে, জানি না আমার মুখ থেকে কথাটা তুমি কী ভাবে নেবে। আমি খুশি হব, যদি ঐ চক্ৰিশ বছরের কবিটা একেবারে খালি হাতে বিদায় না নেয়।

অতসী ওর চোখে চোখে তাকায়। জবাব দেয় না। কুনালই পাদপূরণ করে, আমি খুশি হব, যদি ঐ চক্ৰিশ বছরের ছেলেটা একেবারে খালি হাতে তোমাকে ফেলে রেখে না যায়। আমি যা দিতে পারিনি...

অতসী উঠে দাঁড়ায়। কুনাল বলে, বস। আরও কয়েকটা কথা বলে নিই। তোমার জানা থাকা ভাল। তোমাদের ঠাকুরমশাই লোকটা যতবড় পাণ্ডুই হন, একেত্রে বদান্ধতা দেখিয়েছেন। তিনি রঞ্জন চক্রবর্তীকে তাঁর কারবারে ম্যানেজারের পদে বহাল করেছেন। পাঁচশ টাকা মাস মাহিনায়। পার্মানেন্ট অ্যাপয়েন্টমেন্ট। অবশ্য তিনি জানেন, মাস তিন-চারের বেশি মাইনে যোগাতে হবে না তাঁকে। রঞ্জন একটু হুহু হলেই তার এই নতুন চাকরির কর্মস্থলে চলে যাবে।

—সেটা কোথায় ? কতদূর ?

—ঠিক জানি না। উড়িষ্যা। শুনেছি চক্রধরপুর থেকে বাসে যেতে হয়। সরাইবেল্লার কাছাকাছি।

—এ অবস্থায় কি ওর সেখানে গিয়ে থাকাটা উচিত হবে ? সেখানে ডাক্তার বাড়ি...

—ডাক্তার-বাড়ির কোনও প্রয়োজন ওর আর হবে না অতসী।

—কিন্তু একেবারে একা-একা...

—একেবারে একা একা নাও তা হতে পারে! হয়তো ওর কোনও বাস্ববী স্বামী হয়ে যাবে 'ঐ কটা দিন স্বখার ভরে দিতে।' এমন কোনও বাস্ববী ওর নেই, এটাই বা ধরে নিচ্ছ কেন ?

অতসী অনেকক্ষণ জবাব দিল না। তারপর তার আয়ত চোখ দুটি কুনালের দিকে মেলে ধরে বললে, তুমি কি ব্যঙ্গ করছ কুনাল ?

কুনাল সত্যই লজ্জা পেয়ে বলে, আয়ান নহি।

কেন জানে না, অতসী হঠাৎ বলে বসল, এ থেকে প্রমাণ হয় আমাদের গেছে যে দিন, একেবারেই তা গেছে, কিছু বাকি নেই—

কুনাল অবাক হয়ে বলে, হঠাৎ এ কথা কেন?

অতসী অসতর্কভাবে বলে বসল, ‘ল্যভ-স্টোরি’র সেই অনবদ্য উক্তিটা :

—Love means not ever having to say you’re sorry !

। ৯ ।

অহেতুক কেন যে দুদিন কামাই করল তার মানে নেই। বাড়ি বসে থাকলেই কি মনটা চাফা হয়ে উঠবে? ঐ নিবান্ধব বাড়িতে? বড়মামা জানতে এসেছিল, শরীর-গাতক কি ভাল লাগছে না রে অতু? অতসী এড়িয়ে গিয়ে বলেছিল, ই্যা, ইনফ্লুয়েন্সায়ত হয়েছে। দু-দিন চুপচাপ শুয়ে থাকলেই গেরে যাবে।

বড়মামা বিশ্বাস করেছিল। চুপচাপ বাড়িতেই পড়ে ছিল। কোথাও যায়নি। ওর ডায়েরি লেখার বাতিক। বড়মামা দুটো নাক-মুখে গুঁজে কোথায় বেরিয়ে যেতেই ও খুলে বসত পুরানো দিনের ডায়েরিগুলো, হারিয়ে যাওয়া-দিনের চিঠিপত্র। এ কয়মাসের অল্পভূতিগুলো লিখত দিনপঞ্জিকার পাতায়।

এতদিনে ও মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছে জ্যোতিষশাস্ত্রের নির্দেশ। না মেনে উপায় নেই। উপর্যুপরি এতগুলি ঘটনা কাকতালীয় হতে পারে না। এ কথা কেমন করে অস্বীকার করবে—যে এসেছে অতসীর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে সে জলে পুড়ে থাকে চয়ে গেছে। শেষ উদাহরণ ঐ আধ-পাগলা ছেলেটা! তার বৌদিকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল টেলিকোনে জানাবে। কথা রাখতে পারেনি। মিথ্যা কথা বলবার মতো সাহস সঞ্চয় করে উঠতে পারেনি। যা পারেন ঠাকুরমশাই করবেন। কুনাল তো বলেছে, খবরটা শুঁদের এখনই জানানো হচ্ছে না।

বুধবার অফিসে যেতেই প্রমীলা বলল, কী খবর অতসীদি? দুদিন আসেননি-যে? জ্বর-জ্বর হয়নি তো?

...জ্বরই হয়েছিল। আজ ভাত খেয়েছি।

—এদিককার লেটেস্ট খবর শুনেছেন নিশ্চয়? অফিসের খবর—?

—না, কী?

—‘মাটির ঘর’ ধসে গেছে। থিয়েটার পোস্টপোনড।

—তাই নাকি ! কেন, কি হল আবার ?

জয়ন্তী শোব আগ বাড়িয়ে শুনিবে দিল বড়বাবুর ডায়ালগ —

“আমার জামাই, আমার একমাত্র আশা-ভরসার স্থল কল্যাণ মরে যাচ্ছে !
অথচ আমার চোখে জল নেই— একটা বিপদ ! কাঁদো সভ্যগ্রন্থ, দয়া
করে একটু কাঁদো ! না কাঁদলে লোকে যে তোমার নিন্দা করবে ।”

বেথা বিবাস বধারোতি খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে ।

আর অতসী ভীষণ চমকে ওঠে । বলে, কে ? কে মারা গেছে ।

প্রমীলা অতসীর হাতখানা চেপে ধরে বলে, কী হল । আপনি অমন করছেন
কেন ? না, না মারা যাবনি কেউ । রজনবাবু রিভাইন দিয়েছেন ।

অতসী কোনরকমে সামলে নিল নিজেকে, ও ! তাই বল !

—হ্যা, কাল উনি এসেছিলেন । আপনার খোঁজ করেছিলেন । উনি মধ্যপ্রদেশ
না উড়িষ্যার কোথায় যেন একটা ভালো চাকরি পেয়ে চলে যাচ্ছেন—

অতসী বলল না । জয়ন্তীয়েই বলল কথাটা, পিস অব শুভ নিউজ ।

অতসী বলে, কাল সে এসেছিল বুঝি ? কবে যাচ্ছে বলল ?

—তা তেঁা জানি না । আপনার হোম-অ্যাড্রেস নিয়ে গেছেন ।

কথা ঘোরাবার স্তম্ভ অতসী বলে, বড়বাবু শুনে কি বললেন ?

জয়ন্তী বললে : ‘হেড-অফিসের বড়বাবু লোকটি বড় শান্ত । তাঁর যে এমন
মাথার ব্যামো কেউ কখন জানত ?’ রজনবাবু রিভাইন দিয়েছেন শুনেই তিনি
চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন । সিলিং ফ্যানটার দিকে তর্জনী নির্দেশ করে নাটকের
শেষ ডায়ালগটা আউড়ে গেলেন, “স্টুপিড ! তুমি স্টুপিড ! আমি তোমাকে
চ্যালেঞ্জ করছি—আমাকে তুমি কাঁদাও ! আমি কাঁদব না—আমি কাঁদব না ।”

বেথা বিবাস যেন তন্দ্রায় রোল করছে ঐ দৃশ্যে—‘তন্দ্রা খিলখিল করিয়া
হাসিয়া উঠিল ।’

একটু পরে অতসী নিজেই উঠে গেল বড়বাবুর কাছে । ছুটির দরখাস্তটা হাতে
হাতে দিতে । বড়বাবু বললেন, ‘শ্রাভ কেম অতসী । ‘কল্যাণ’ আমাদের ছেড়ে
গেল ।’

অতসী বলল, ‘শ্রাভ কেম’ কেন হবে বড়বাবু ? তনছি সে ভাল চাকরি
পেয়েছে । এ তো আনন্দের কথাই ।

—না, হ্যা ; তা তো বটেই । যেখানে জয়েন করছে সেখানে কোনও ‘ড্রামাটিক
ক্লাব’ থাকলে তাদের তো লাভই । আমাদের তো লোকসান হল । আমি
আপাতত ‘মাটির ঘর’ পোস্টপোণ্ড করেছি ।

অতসী বললে, তা তো করতেই হবে। আমি কিন্তু আজ অন্য একটা কথা বলতে এসেছিলাম বড়বাবু—

—বল মা ?

—আমি দিন-সাতকের ছুটি চাইতে এসেছিলাম। আগামী মণ্ডাহটা। শরীরটা ভাল যাচ্ছে না, মন-যেজাজও ভাল নেই। সাংসারিক অশান্তি। হুপ্তা-থানেক পুরী কি হার্জিলিঙ ঘুরে আসব।

—খিয়েটার যখন পিছিয়ে গেল তখন আমার আর অসুবিধা কি ? তবে হার্জিলিঙ এখন যেও না। বর্ষা নেমে গেছে সেখানে। পুরী অবশ্য যেতে পার। আরও একটা সাজেশান দিতে পারি—পশুপত্তিনাথ ঘুরে এস বরং। ঐ যে কুতু স্পেক্যাল না কুতু ট্রাভেলস কি যেন আছে, ওরা যাচ্ছে।

অতসী বললে, কোথায় যাব ভেবে দেখিনি। দিন পাঁচ-সাত কোথা থেকে ঘুরে আসব ভেবেছি।

এ সিদ্ধান্তটা কাল রাতে নেওয়া। শরীর নয়, মনের উপর হঠাৎ চাপ পড়েছে ওর। অপ্রত্যাশিত কতকগুলো ঘটনা পর পর ঘটে যাওয়ায়। রক্তনের অসুস্থতা, কুনালের সঙ্গে দেখা হওয়া এবং সবচেয়ে বড় কথা রক্তন চক্রবর্তীর মৃত্যু পরোয়ানা। সেই ছেলেটার মুখোমুখি হলে সে কী করবে, কী বলবে, ভেবে পাচ্ছিল না। শুধু সেই ছেলেটাই বা কেন—তার দাদা, বৌদি, ভাইবির। তাঁরা তো কেউ কিছুই জানেন না এখনো। অতসী জানে। জেনেও তাকে না-জানার অভিনয় করতে হবে। শুধু তাই নয়, অতসী জানে—রোগটার মূলে সে নিজেই।

সারাদিন আজও ঘোরের মধ্যে কাটল। তবে অকস্মে কাজের চাপ ছিল। বেশ কিছু ডিক্টেশন নিতে হল। সারাটা দুপুর খটাখট করে তা শেষও করতে হল। আজ বারে বারেই ভুল বোতামে আঙুল চলে যাচ্ছে। দু-একখানি চিঠিতে এত বেশি ভুল হল যে, নিজেই রিটাইপ করল। বার দুয়েক সাহেবকে বলতে হল, ‘বেগ-রোর পার্ডন, স্যার ?’

নজর করে দেখল—ভারতের সিংহাসনের মত ডেসপ্যাচ সেকশানের চেয়ারটাও খালি নেই। একজন অপরিচিত ভদ্রলোক বসে আছেন। সে কার ভাইপো ভাগ্নে জানবার কৌতূহল হল না। ঘড়ির কাঁটাটা অপরাহ্নে যথারীতি ক্লাস্টিতে চলে পড়ল।

ছুটির মুখোমুখি হঠাৎ চমকে ওঠে একটি পরিচিত কণ্ঠস্বরে, বাঃ। বেশ মোক তো মশাই আপনি। খুব ঘোরালেন নাকে দড়ি দিয়ে।

অতসী টাইপ-রাইটারের উপর থেকে মুখ তুলে দেখে—ভিজিটার্স চেয়ারে বসে আছে রঞ্জন। এক নাগাড়ে বলে চলেছে—খুঁজে খুঁজে বাড়ি পেলাম তা মাল্কিনকে দেখতে পেলাম না। অফিস বলে—ছুটিতে আছেন, তো বাড়ির লোক বলে—অফিসে আছেন।

প্রমীলা পট্টনায়ক বলে, জ্বর থেকে উঠেছেন। এত ঘোরাঘুরি নাই করতেন ?

অতসী জবাব দিল না। তার চোখে বোধ হয় কঁকর পড়েছিল। ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে রুমালটা বার করে চোখটা মুছে নিল।

রঞ্জন বললে, বাঃ, কাল-বাদে পরন্তু দেশান্তরী হচ্ছি। অতসীদির সঙ্গে দেখা মা করে গেলে চলে ?

এতক্ষণে কথা বলল অতসী, ঠিকই বলেছে প্রমীলা। অল্পস্থ শরীরে এত দৌড়াদৌড়ি করা ঠিক নয়। শনিবারেই তো প্রথম ভাত খেয়েছ।

রঞ্জন প্রমীলাকেই সাক্ষী মানে, দেখুন প্রমীলাদি। অতসীদির কাণ্ড দেখুন। ঘর জন্ত চুরি করি সেই বলে চোর।

জয়ন্তী ঠাট্টা করে বলে, কী করবেন বলুন রঞ্জনবাবু ? এটাই হচ্ছে দুনিয়ার নিয়ম ! তা বড় চাকরি পেলেন, আমাদের খাওয়ালেন না ?

—নিশ্চয়ই ! কী খাবেন বলুন ?

প্রমীলা বলে, না না, আজই নয়। আপনি জরেন করুন। মাইনে হাতে পান। এরপর যখন কলকাতায় আসবেন তখন খাওয়াবেন। আমরা তো আর পালিয়ে যাচ্ছি না ?

রঞ্জন বললে, না প্রমীলাদি, কথাটা যখন উঠেছে তখন মিটিয়ে দিবে যাওয়াই ভাল। আবার কবে দেখা হবে কে জানে ? মানুষের জীবন তো পদ্রুপত্রে নীর।

অতসী রীতিমত চমকে ওঠে। বলে, ও আবার কি কথার ছিঁরি ?

রঞ্জন শুনল না। বংশীকে ডেকে একটা দশ টাকার নোট খরিয়ে দিয়ে বললে, সিঁটাড়া আর সন্দেশ নিয়ে এস তো ভাই, আর চা।

বংশী বলে, চা-টা ক্রি রঞ্জনদা। ওটা আমি খাওয়াচ্ছি আপনাকে। আপনার কেয়ারওয়েল।

অগত্যা চা এল, সিঁটাড়া-সন্দেশ এল। হৈ হৈ করল সবাই।

সন্দেশ যে এত তেতো হয়, অতসীর কল্পনায় ছিল না।

ছুটির পর রঞ্জন বললে, চলুন অতসীদি, আপনাকে বাসে তুলে দিবে আমি।

—বেশ তো, এস।

অফিস থেকে বাইরে এসে রঞ্জন বললে, সেই চায়ের দোকানটার যাবেন ?

—কেন ? এইমাত্র তো সন্দেশ-চা খাওয়ালে ।

—না, যানে, কিছু গল্প-গুজব করতায় । কতদিন আবার দেখা হবে না—

—আচ্ছা চল, আমারও এখন হাতে কোন কাজ নেই ।

আবার ওরা হাঁটতে হাঁটতে চলে আসে এস্প্রানেড অঞ্চলে, সেই দোকানটিতে । রঞ্জনই এক নাগাড়ে বকবক করে চলেছে । বেশ মনে হল ওর ছপ্পড়-ফোড়ো সৌভাগ্যটাকে ও যেন এখনও ঠিক বিশ্বাস করে উঠতে পারছে না । ঠাকুর-মশাই যে হঠাৎ এমন একটা প্রস্তাব করে বসবেন, এটা সকলের কাছেই বেশ অভাবনীয় মনে হয়েছে । সোমবার বিকেলে ঠাকুরমশাই এসেছিলেন ঐ ব্লাড-রিপোর্টটা নিয়ে । রক্তে কিছুই পাওয়া যায়নি । নিতান্ত কথার পিঠে কথা । রঞ্জন বলেছিল, সে সোমবারেই চাকরিতে জয়েন করবে । তাতে ঠাকুরমশাই বললেন, কলকাতা তোমার স্মৃতি করছে না রঞ্জন । তুমি কোথাও চেঞ্জে যাও ! বেশ স্বাস্থ্যকর কোন জায়গায় । স্মাচারালি রঞ্জন বলেছিল, কত খরচ ! আর তখনই উনি একটা অদ্ভুত প্রস্তাব দিয়ে বসেন, চক্রধরপুরের কাছে ওঁর নিজেরই একটা কাঠ-চেরাই কলে রঞ্জনের চাকরি হতে পারে ! বুনুন কাণ্ড !

অতসী বাধা দিয়ে বলে, রিপোর্টটা কই ?

—দাদার কাছে আছে বোধ হয় । সেটার আবার কি দরকার হবে ?

অতসী একটু অবাক হয়ে যায় । বলে, ডক্টর কুনাল বোসের সই আছে রিপোর্টটায় ?

এবার অবাক হবার পালা রঞ্জনের । সে প্রতিপ্রশ্ন করে, কেন বলুন তো ?

অতসী নিজেকে সামলে নেয় । বলে, আমি গিয়েছিলাম ডক্টর বোসের ল্যাবরেটোরিতে, তোমার ব্লাড-রিপোর্টটা চেয়েছিলাম । উনি দিলেন না । বললেন, আপনারা নিলেই তো হারিয়ে ফেলবেন, ওটা আমার কাছে থাক, রঞ্জন চক্রবর্তীর ফাইলে । ভবিষ্যতে আবার রক্ত পরীক্ষার প্রয়োজন হলে কম্পেন্সার করতে পারব ।

রঞ্জন অবাক হয়ে বললে, আরে-আরে-আরে ! আশ্চর্য কোয়েলিডেন্স তো ! ঠিক ঐ ঘটনাই যে সোমবার বিকালে আমাদের বাড়িতে ঘটল । প্রায় একই জাতের কথোপকথন—

—কি রকম ?

—এতকণে মনে পড়েছে । ব্লাড-রিপোর্টটা দাদার কাছে নেই, আন্টিমেটলি ওটা ঠাকুরমশায়ের কাছেই রয়ে গেল । উনি রিপোর্টটা দাদাকে দেখালেন । দাদা বললে—ও দেখে আমি কী বুঝব ? ডক্টর বোস কী বললেন বলুন ? তাতে

ঠাকুরমশাই বললেন, উনি বলেছেন—‘রক্ত নির্দোষ । কতকগুলো ক্যাপসুল আর একটা টনিক দিচ্ছি । এগুলো খেলেই ভাল হয়ে যাবে ।’ দাদা যখন ঐ ব্লাড-রিপোর্টটা হাত বাড়িয়ে নিতে চাইলেন, তখন ঠাকুরমশাই ঠিক ঐ কথাই বললেন—‘তুমি ভুলো মানুষ, কোথায় ফেলতে কোথায় ফেলবে, এটা আমার কাছেই থাক । ভবিষ্যতে আবার যদি কখনও রক্ত পরীক্ষা করানোর প্রয়োজন হয় তখন এটা তুলনা করে দেখার দরকার হবে ।’ এই বলে রিপোর্টটা ওর পকেটেই রাখলেন !

অতসী বললে, এটা তোমার কাছে কোয়েন্সিডেন্স মনে হল রক্তন ? আমার কাছে তো ধাঁধার মতো মনে হচ্ছে । ভক্টর বোস আমাকে দিলেন না, নিজের কাইলে রাখলেন, অথচ ঠাকুরমশাই—

বাধা দিয়ে রক্তন বলে, আপনি দেখা করার পরে নিশ্চয় ঠাকুরমশাই তাঁর সঙ্গে দেখা করেন এবং গুটা নিয়ে আসেন—

—তাই হবে । —অতসী প্রসঙ্গটা চাপা দেয় ।

বয় দু’পেরালা চা দিয়ে গেল ।

রক্তন পকেট থেকে সিগ্রেট-দেশলাই বার করল । হুজনেই কিছুটা চূপচাপ । শেষে রক্তন বললে, আপনাকে আজ খুব গভীর গভীর লাগছে । কী ভাবছেন এত ?

—কই, কিছু না তো ।

—মনটা ধারাপ ?

—কে বলল ?

—আমি ! এবং এও জানি, কেন আপনার মন ধারাপ !

—তাই নাকি ? তুমি যে দৈবজ্ঞ হয়ে উঠেছ দেখছি । বল তো কেন ?

—আমি চাকরি ছেড়ে দিয়ে বিদেশে চলে যাচ্ছি বলে !

অতসী কষ্ট করে হাসল । বলল, নিজেকে বড় বেশি ইম্পটেন্স দিচ্ছ রক্তন !

—তা হয় তো দিচ্ছি । কিন্তু এই কদিনে আপনার পরিবর্তনটা বেশ লক্ষণীয় ।

অতসী কথা ঘোঁরায় । বলে, সেটা তো তোমার তরফেও সত্য । তুমি আবার আমাকে ‘অতসীদি’ বলছ, ‘আপনি-আপনি’ করছ !

—তা তো করতেই হবে । আপনি তো মার আমার ‘তুল্লা’ নন । ‘কল্যাণ’-এর মৃত্যু পরোয়ানা তো ঘোষিত হয়ে গেছে—

—মৃত্যু পরোয়ানা ।

—নয় ? আমি চাকরি ছেড়ে দিয়েছি । ‘কল্যাণ’ করছি না । ‘মাটির বর’ ধলে গেছে । ফলে আপনি আবার ‘অতসীহি’ হয়ে গেছেন ।

আশ্চর্য ছেনেটা । ও যেন ধরা-ছোঁয়ার বাইরে । আবার কিছুক্ষণ নীয়ে চা-পানের পর রঞ্জন বলে, ছুঁদিন কাটাই করলেন কেন ? জ্বর হয়েছিল ?

—হ্যাঁ, শরীরটা ভাল নেই । আজ ছুটি নিলাম । দিন-সাতেকের । আগামী সোমবার থেকে । ভাবছি কদিন কোথা থেকে ঘুরে আসব ।

—কোথায় যাবেন ?

—তা এখনও ঠিক করিনি । আমসেতপুরে আমার এক বাস্ববী আছে । কলেজে একসঙ্গে পড়তাম । ওর বর টাটার এজিনিয়ার । একটা বাচ্চা হয়েছে । অনেক দিন থেকে লিখছে ওদের ওখানে যেতে । ভাবছি কদিন ঘুরে আসব ।

হঠাৎ উৎসাহিত হয়ে ওঠে রঞ্জন, আমসেতপুর । ডি-লা-গ্র্যাণ্ডি ! শুন্ন । আমি শনিবার ইম্পাত এক্সপ্রেসে যাচ্ছি । আমি যাব চক্রধরপুর । মানে টাটানগরের পরের স্টেশান । চলুন, আমার সঙ্গে একই ট্রেনে । বেশ হৈ হৈ করতে করতে যাওয়া যাবে । চাই কি আমিও আপনার সঙ্গে টাটানগরে নেমে পড়তে পারি । আপনাকে বাস্ববীর বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে নেম্বট ট্রেনে অথবা বাসে চক্রধরপুর চলে যেতে পারি ।

অতসী হেসে ফেলে । বলে, বাস্ববীর কাছে তোমার কী পরিচয় দেব ?

—কেন ? যা সত্যি পরিচয় । আমি আপনার অফিসে কাজ করতাম । এখন নতুন চাকরি পেয়ে মাদুডিহি যাচ্ছি—

—কোথায় যাচ্ছ ?

—মাদুডিহি । একটা সাঁওতালী গ্রাম । খড়খাই নদীর ধারে ।

—সেখানে কী আছে ?

—ঠাকুরমশাই জঙ্গল ইজারাদার নিয়েছেন । ওর একটা কাঠ-চেরাই-এর কারখানা আছে । জঙ্গল থেকে শালের লগ আসে, চেরাইকলে সাইজ-মত কাটা হয় । তারপর নানান আয়গার চালান যায়—টাটানগর, চক্রধরপুর, মায়—রাউরকেল্লা । আমি তার ম্যানেজার হিসাবে অরেন করতে যাচ্ছি । পাঁচশ টাকা মাইনে আর ফ্রি কোয়ার্টার্স ।

অতসী চায়ে চুমুক দিয়ে সংক্ষেপে বললে, বোকা ছেলে ! পুরুষমানুষকে তার মাহিনার অঙ্ক আর মেয়েদের ক্ষেত্রে তার বয়স প্রকাশ্যে বলতে নেই, জান না ?

কথা রঞ্জন বললে, বা-রে । বাইরের লোককে তো বলতে যাইনি । এখন আসল কথাটা বলুন, আমার সঙ্গে একই ট্রেনে যাবেন ? দ্য লাস্ট রাইড টোগেদার ?

অতসী বলে, কাজিল ছেলে ! তা কেমন করে সম্ভব ? আমার ছুটি ভো
শোমবার থেকে । তুমি যাচ্ছ শনিবার—

—বেশ, আমি তাহলে রোবার সকালের ট্রেনে যাব ।

হঠাৎ মনস্থির করে ফেলল অতসী । বেশ ! তাই সই ।

—ভে—বি ওভ । আপনি সত্যিই তা—বি ভালো ।

॥ ১০ ॥

দ্য লাস্ট রাইড টুগেদার !

কথাটা কিন্তু রক্তনের কণ্ঠে মেলোড্রামাটিক লাগেনি—কারণ সে তো ঐ চতুর
বাক্য প্রয়োগের—যে অর্থে অতসী গ্রহণ করেছিল—বহুশ্রুতা জানে না ।

কিন্তু অতসী রাজী হয়ে গেল কেন ? কতিই বা কী ? অনেকদিন ধরেই
রমলা ওকে লিখছে কয়েকদিনের অন্ত টাটানগর ঘুরে আসতে । রমলা ওর
সহপাঠিনী । একই বছরে বি. এ. পাস করে । রমলার স্বামী বিভাসও তার
অপরিচিত নয় । কলেজজীবন থেকেই ওদের মেলামেশা, আর সেটা অজানা
ছিল না অতসীর । বিভাসবাবুও ওকে বলেছিলেন—সেবার মিঠুর বিষয়ে যখন
বেখা হল—কদিন ঘুরে আসবেন চলুন না আমসেদপুরে ? আমাদের বোঝি
লাগে—কিন্তু সপ্তাহ-খানেকের অন্ত যারা যায়, তাদের ভালই লাগে । একদিন
ভোপ-টাটিতে কিংবা রিভার্স-মীটে পিকনিকও করা যাবে ।

সে নিমন্ত্রণ প্রায় তামাদি হয়ে যাবার জোগাড় । তারপর ওদের একটা বাচ্চা
হয়েছে । রমলা তার ফটো পাঠিয়েছে । এতদিনে তার বছর-খানেক বয়স হল ।
অতসী অনেকবারই ভেবেছে সপ্তাহান্তের সঙ্গে দু-একদিন ছুটি নিয়ে ঘুরে আসবে
—কিন্তু ঐ বড়মামার অন্ত হয়ে ওঠেনি । এবার সে মনস্থির করে ফেলল ।
বড়মামা আপত্তি করল না । বরং বলল, তুই ঘুরে আর, আমি ঠিক চালিয়ে নেব ।
অতসী সামনে পাঞ্জাবী হোটেলের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে দিয়ে গেল । অগ্রিম টাকাও
কিছু দিয়ে গেল হোটেল মালিককে । সাবধান করে দিতে ভুলল না—বাবু টাকা
খার চাইলে দেবেন না, তবে দুবেলা উনি খেয়ে যাবেন, যতদিন আমি না ফিরে
আসি ।

সর্দারজী বলাই গাঙ্গুলীকে ভাল মতই চেনে ; জানে অতসীকে—পাড়ার উপা-
ধনকর্ম দ্বিদিমবি বলে । সে নিশ্চিত করেছিল, আপ বে-ফিকর রহিয়ে দ্বিদি ।
কলাইবাবুর কুছ অস্থবিধা হোবে না ।

বহিবার ভোরবেলার ট্রেন। স্ট্রটকেন্স ওছিরেই রাখা ছিল। বহু-ঘোর বহু-
ছন্দ করে যামাকে যাবতীয় নির্দেশ দিয়ে অতসী যখন বসনা হল তখনও তালো
বরে সকাল হয়নি। সলাই গাঙ্গুলী বললে, কবে কিরছিস ?

—দিন সাতকের মধ্যে। পৌছে চিঠি দেব।

—ঠিক আছে, আর। হুর্গা হুর্গা।

সকালের হাওড়া স্টেশন তখন ফাঁকা ফাঁকা। বাবো নব্বয় গেটের কাছে
দাঁড়িয়ে ছিল রজন। বললে, তাড়াহড়ায় কিছু নেই। ট্রেন ফাঁকা।

কুলির মাথায় মালপত্র চাপিয়ে ওরা ট্রেনে এসে উঠল। সত্যি ট্রেনটা এখনও
ফাঁকা। জানলার ধারে সুবিধামত বসল অতসী। রজন বসল মুখোমুখি।
বললে, সকালে নিশ্চয় কিছু খেয়ে আসেননি। তাতে অসুবিধা নেই। বৌদি
লুচি তরকারী করে দিয়েছেন।

অতসী বললে, আমি সন্দেশ নিয়ে এসেছি।

—ভি লা-গ্র্যাতি! লুচি-তরকারী-সন্দেশ! দাঁড়ান ট্রেনটা ছাড়ুক বল
আছে সঙ্গে ?

—না তো ?

—আমার কাছে আছে, তাছাড়া এটা করিডর-ট্রেন। ‘ভাইনিং কার’ও
আছে।

ট্রেন ছাড়ল। এতক্ষণে সকালের আলো বেশ ছুটেছে। ট্রেন ছাড়ার মুখোমুখি
বেশ কিছু যাত্রী উঠেছে। দু’চারটি ভেঙারও আসতে শুরু করেছে। টকি-
লজেন্স, চিকনি-ভালা, গল্পের বই, কার্ডস্টেন পেন। অনেক অনেকদিন পরে
অতসী দূরপাল্লার ট্রেনে চেপেছে। ইতিমধ্যে দু’চারবার লোকাল ট্রেনে কাছাকাছি
ঘেঁটে হয়েছে বটে ; কিন্তু ঘুরের যাত্রার সুযোগ আসেনি।

—ঘাঁর কাছে যাচ্ছেন তিনি আপনার ক্লাসফ্রেণ্ড ?

—হ্যাঁ। আমরা একই কলেজ থেকে বি. এ. পাস করি। ওর খামো টাটার
এজিনিয়ার। সেও আমাদের কলেজে পড়ত—বহু দুয়েকের সিনিয়ার।

—তার মানে প্রেম করে বিয়ে ?

—হ্যাঁচারালি।

রজন বলে, কলেজ জীবনে আপনার কোন ছেলের সঙ্গে প্রেম-ট্রেন হয়নি ?

অতসী তাকিয়ে দেখল ওর দিকে। না, কোনও কৌতুকের আভাস নেই,
কাজলারিও নেই। শ্রেক কুশলপ্রসন্ন করার মতো নির্বিকার। যেন কলেজে ওর
কম্বিনেশন কী ছিল জানতে চাইছে। অতসী বলল, হয়েছিল। খোপে-টিকল না।

—ও! আমারও হয়েছিল, জানেন। তবে একতরফা। যানে, আমিই মেয়েটাকে ভালবাসতাম, সে আমাকে পাত্তা দেয়নি।

—প্রেম নিবেদন করেছিলে কোন দিন?

—দু-র! সাহসই হল না। বড়লোকের মেয়ে যে।

—তা অত উচু নজর করতে গেলে কেন? মধ্যবিত্তদের একটা ফুটফুটে মেয়ের সঙ্গে প্রেম-ট্রেম করলেই পারতে।

—ওই তো মুশকিল! প্রেম জিনিষটা ওরকম হিসেব করে করা যায় না।

—তারি মুশকিলের কথা। ‘যার যাতে মজে মন’, তাই নয়?

রঞ্জন এক ঠোঙা চিনেবাদাম কিনল। অগ্নানবধনে ঢেলে দিল আসনপিণ্ডি হয়ে বসে থাকা অতনীর কোঁচড়ে। আর নির্বিবাদে টুকিয়ে টুকিয়ে খেতে থাকে। ব্যাপারটা হয়তো সামান্যই, কিন্তু অতনী ব্যাপারটাকে বুঝে নিতে চাইল। অনাখ্যায় প্রায় সববয়সী মহিলার কোল-আঁচড়ে এভাবে চিনেবাদাম ঢেলে দিয়ে খুঁটে খুঁটে খাওয়া যে কচিসম্মত নয়, তা কি ও জানে না? যদি না জানে তবে তার ব্যাখ্যা—ও এখনও রীতিমতো ছেলেমানুষ। এমন ছেলেমানুষের পক্ষে আসন্ন স্বত্বের সংবাদটা সহ্য করা অস্বাভাবিক; অর্থাৎ ঠিকই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল কুনাল। আর যদি এটা ওর জানা থাকে, তবে তার এক মাত্র ব্যাখ্যা—অতনীকে সে নিতান্ত আপনজন বলে ভাবতে শিখেছে। আরবা যেমন দিদির কোলে চিনেবাদাম ঢেলে দিয়ে বলি, খা না।

হঠাৎ আবার বলে, আচ্ছা অতনীদি, আপনি সেই যে ছেলেটিকে ভালবেসে ছিলেন তার সঙ্গে প্রেম-ট্রেম ধোপে টিকল না কেন? ছেলেটাই কেটে পড়ল, না আপনি সরে এলেন?

অতনী বলে, তোমার কি মনে হয়?

—আমার মনে হয় ছেলেটার দোষ ছিল না, আপনি তাকে পাত্তা দেননি।

—কেন? এমন ধারণা হল কেন তোমার?

—এমনিই। বলুন, ঠিক বলেছি কি না?

—হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ। সে আমাকে বিয়েই করতে চেয়েছিল, আমি রাজি হইনি।

—হেথলেন! কী দারুণ প্রোডক্ট করেছি! কিন্তু কেন? প্রেম-ট্রেম করতে পারলেন, অথচ বিয়ে করতে রাজী হলেন না কেন?

—সব কথা তোমাকে কেন বলতে গেলাম?

—না, মানে এমনিই জিজ্ঞাসা করছি। আচ্ছা, সে ভ্রলোক কিভাবে করেছেন?

—হ্যাঁ, বছর দেড়েক।

—এখনও আপনার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হয়?

—কালই হয়েছিল।

—এখন তাঁর অ্যাটিচুড কেমন?

অতসী হেসে ফেলে। বলে, আরে, তুমি কি আমাকে কাঠগড়ার আসামী বলে নাকি?

রঞ্জন এক টিপ কাল-মুন মুখগহ্বরে ফেলে বলে, না, মানে আমার জানতে ইচ্ছে করে—বিয়ের পরে, প্রাক্তন-প্রেমিকার সঙ্গে লোকে কেমন ব্যবহার করে।

অতসী জবাব দিল না। ট্রেন থড়গপুরে পৌঁছালো। ওদের পাশের বেকির একদল লোক নেমে গেল। রঞ্জন বললে, এবার ব্রেকফাস্টটা সেরে নেওয়া যাক অতসাদি।

কথাটা ঘুরে কিরেই আগে উঠছে অতসীর মনে: ছ লাস্ট রাইড টুগেদার! প্রাণচঞ্চল ঐ ছেলেটাকে ছেড়ে সে নেমে যাবে পরের স্টেশানে, আর তার সঙ্গে জীবনে দেখাই হবে না। বিদায় নিতে হবে শাস্ত অচঞ্চলভাবে—ও যেন বুঝতে না পারে—এই ওদের শেষ সাক্ষাৎ। ও হয়তো বলবে, 'চিঠিপত্র লিখলে জবাব দেবেন তো'? অথবা, 'চলুন না অতসাদি, নেক্সট গুল্লোর ছুটিতে একসঙ্গে কোথাও বেড়াতে যাই'।

কী জবাব দেবে অতসী?

ট্রেন একটা বড় স্টেশানে প্রবেশ করছে। অতসী বললে, টাটানগর এসে গেল নাকি? মুখ বাড়িয়ে কী দেখে নিয়ে রঞ্জন বললে, হ্যাঁ। কী? আপনার সঙ্গে নেমে পড়ব? এখনও বলুন?

অতসী তো পাগল নয়? অনাস্থীয় একজন যুবককে নিয়ে বাস্তবীর বাড়ি হাজির হবে। বললে, তা হয় না রঞ্জন। ওরা কী ভাববে?

—কী আবার ভাববে? আমি তো বিকালের দিকেই চলে যাব চক্রধরপুর?

—কিন্তু কী লাভ তাতে?

—আরও কয়েক ঘণ্টা আপনার সঙ্গে একসঙ্গে থাকা যাবে।

অতসী নিশ্চুপ কয়েকটি মুহূর্ত তাকিয়ে রইল। রঞ্জনের কথাটা কানে যেতে ওর হঠাৎ মনে পড়ে গেল কুনালের সেই অদ্ভুত কথাটা। 'ঐ কটা দিন সুখায় ভরে দিতে'!

গাড়ি টাটানগরে এসে থেমেছে।

রঞ্জন অতসীর স্মার্টকেসটা হাতে তুলে নিয়ে বললে, থাক আপনাকে বলতে হবে না। আমি বুঝতে পেরেছি—

—কী বুঝতে পেরেছ ?

—আপনি চান না, আমিও আপনার সঙ্গে টাটানগরে নাগি !

অতসী হঠাৎ মনস্থির করেছে। হেসে বললে, ঠিক তাই, কিন্তু কারণটা কি জান ?

—কারণ তো একটাই, আপনি আমাকে এড়িয়ে যেতে চাইছেন।

—না ! কারণটা তা নয়। কারণটা এই—আমি টাটানগরে নাগছি না।

রঞ্জন হাঁ হয়ে যায়। বলে, মানে ?

ওর হাত থেকে স্মার্টকেসটা টেনে নিয়ে অতসী বলে, চা-ওয়ানাটাকে ডাক দিকিনি।

রঞ্জন কথাটা শুনতে পায় না। সামনের বেকিটার বসে পড়ে বলে, তার মানে ?

—তার মানে, আমি তোমার সঙ্গে চক্রধরপুরে যাচ্ছি। তোমাকে তোমার বাসায় পৌঁছে দিয়ে সন্ধ্যাবেলার বাসে করে টাটানগর চলে আসব !

লাকিয়ে ওঠে রঞ্জন, ডি লা-গ্রাণ্ডি ! আপনি সিম্প্লি মার্ভেলাস !

বাকি রাস্তাটা রঞ্জন কত কী বকুবকু করে গেল তা কানেই গেল না তার। ও শুধু নিশ্চুপ ভাবছে, এমন একটা অদ্ভুত সিদ্ধান্ত হঠাৎ কেন নিয়ে বসল সে ? এই ছেলেটার বাকি জীবনের সুনির্দিষ্ট তিন-চার হাজার ঘণ্টার ভিতর মাত্র তিন-চার ঘণ্টার সাহচর্যে সে কী এমন সম্পদ দিতে পারে ? কিন্তু শুধুই কি দেওয়া ? পাওয়ার জন্যও কি অধীর আগ্রহে সে নিজেই উন্মাদ হয়ে যেতে কসেনি ?

চক্রধরপুর স্টেশানে নেমে প্রথমেই রেলওয়ে রেষ্টোরাঁয় খেয়ে নিল দুজনে। তারপর মালপত্র নিয়ে বাইরে এসে দাঁড়ালো। বাসের গুমটিতে। রাউরকেল্লার দিক থেকে বাসটা আসবে, যাবে সরাইকেল্লার দিকে। সেই বাসেই যেতে হবে ওদের,—কী এক মাজুভিহি গ্রামে। বাসের মড়ক থেকে মাইল পাঁচেক জঙ্গলে রাস্তা। ঠাকুরমশাই বলেছেন, খবর দেওয়া আছে, দুবেজি গো-গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করবে বাসের রাস্তায়। নেহাত গো-গাড়ি না পেলো কুলি নিয়ে আসবে সে, যাতে মালটা বইতে অসুবিধা না হয়। রঞ্জন বলে, পাঁচ মাইল তো রাস্তা, হাটতে পারবেন না ?

অতসী বলে, এসব কথা আগে বলনি কেন? কোথায় পাঁচ মাইল? যাতা-
য়াতে তো দশ মাইল! আজ সন্ধ্যায় তাহলে কেমন করে ফিরব?

—না-ই ফিরলেন? কাল সকালে আমি নিজে এসে আপনাকে বাসে ভুলে
দিয়ে যাব। গোকর-গাড়ি নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। ভাবছেন কেন অত?
ঠাকুরমশাই বলেছেন, হু-কামরার কোয়ার্টার্স। আমি বাইরের ঘরে শোব বরং।

অতসী আর কথা বাড়ায় না।

বাসে ভিড় যথেষ্ট। তাও তো আজ হাট বার নয়। হাটের দিন এ বাসে
পা রাখাই দায়। রাস্তাটা ভালই, পীচমোড়া। রঞ্জন বসার জায়গা পারনি,
অতসী পেয়েছিল। বিসপিল পথে রওনা দিল চক্রবান।

কণ্ঠাকটারকে বলা ছিল। ঘন্টাবানেক পরে সে হাঁকাড় দিল—মাদুড়িহি,
মাদুড়িহি।

মালপত্র নিয়ে ওরা নেমে পড়ল। শুধু ওরা দুজনেই নামল এখানে। বাগটা
পরমুহূর্তেই রওনা হয়ে গেল সবাইকেজার দিকে।

ঠিক তখনই এগিয়ে এসে একজন বিহারী লোক। পারে তারি নাগরাই,
উর্ধ্বাঙ্গে মেঘজাই, মাথায় বিরাট পাগড়ী এবং হাতে মস্ত লাঠি। অভিবাধন করে
রঞ্জনকে বললে, কাঁহা ঘাইবন বাবু?

রঞ্জন ওকে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বললে, ছুবেজী?

পুনরায় অভিবাধন করে ছুবেজী বলে, জী হাঁ। আইয়ে আইয়ে ইধাব
পদারিয়ে।

তার পরেই ছুবেজীর নজর পড়ে অতসীর দিকে। যুক্তকরে নমস্কার করে,
নমস্তে মাইজী, আইয়ে—

অতসী প্রতিনমস্কার করতে ভুলে যায়। তার হাত থেকে বাগটা নিয়ে
ছুবেজী রঞ্জনকে যুছু ধমক দেয়। খবর দেনা চাহিয়ে থা কী মাইজী তি আতি হৈ।

রঞ্জন কিছু বলার আগেই অতসী বলে ওঠে, আমার আসার কথা ছিল না
ছুবেজী; শেষ-মেঘ আমিও চলে এলাম। হু-এক দিনের মধ্যেই আমি ফিরে
যাব।

—আপ, বে-ফিকর রহিয়ে মাইজী, সব ইন্তেজাম হইয়ে যাবে। আমি
যখন পড়েন হু-চার বোজ ঠাহ্‌রিয়েই যান। জগাহ্‌ আচ্ছাই আছে!

অতসী বলে, গোকর গাড়ি পাওয়া গেছে?

বিজের হাসি হাসল ছুবেজী, জী না। আমি বোলেছি কি না, বে-ফিকর
রহিয়ে। বয়েল-গাড়ি নেহি, মায় উস্‌মে তি আচ্ছা ইন্তেজাম কিয়া।

উৎকৃষ্টতর যানের মালিক সিংজী এক পা এগিয়ে এসে নমস্কে করল।

দুবেজী করিতকর্মা ব্যক্তি। নতুন ম্যানেজারের অভ্যর্থনার ভাগই ইন্তেজাম করেছে। জঙ্গী কাঠ আসে যে ট্রাকে তারই একখানা দাঁড়িয়ে আছে বোকাই-কাঠ নিয়ে। পাঁচ মাইল রাস্তা গোয়ানে পাড়ি দিতে হবে না শুনে মনে মনে খুশি হয়ে উঠল অতসী; কিন্তু আশঙ্কিতও হল কিছুটা। ঐ দুবেজী, ঐ সিংজী—আরও না-জানি কারা কারা প্রথম থেকেই একটা ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে গেল : নতুন ম্যানেজারবাবু বিবাহিত, এবং সস্ত্রীক এসেছেন কর্মস্থলে।

তা হোক ! রক্তনের মেয়াদ তো দু-তিন মাসের। অতসীর আরও কম—দু-তিন দিনের।

॥ ১১ ॥

আশ্চর্য আরণ্যক পরিবেশ ! আজন্ম শহরে মানুষ অতসী মুগ্ধ হয়ে গেল। কাছার দেওয়াল, ছড়িয়া টালির ছাদ, দু-কামরা ছোট বাড়িটি কঙ্কির বেড়া দিয়ে ঘেরা। পূর্ববর্তী বাসিন্দা একটু বস্তুতান্ত্রিক ছিলেন মনে হয়—বেড়া-দেওয়া বাগানে ফুলের গাছ নেই, আছে ফলের গাছ—পেয়ারা, ডুমুর, পেঁপে, আতা। ভিতরের উঠানের ও-প্রান্তে রান্নাঘর—তার সামনে বাঁশের খুঁটি-দেওয়া একচাল্লা, বোধকরি আসন পিঁড়ি হয়ে ওখানে আহারের আয়োজন হত। ভিতরের উঠানেও লাউ-কুমড়া-ঝিঙের শুকিয়ে যাওয়া চারাগাছ। মাঝখানে একটি কাঁচা পাতকুয়া—ওপাশে একটি ভেঙেপড়া তুলসীমঞ্চ তুলসীর চারাগাছটা কিন্তু টিকে আছে।

দু-কামরা বাড়ির সামনের ঘরটা ছোট। সেখানে খান-দুই বেতের মোড়া, একটি পিরাশালের চেয়ার টেবিল। প্যাকিং বাক্স ভেঙে তাক বানানো হয়েছে। দেওয়ালে একটা ক্যালেন্ডার, যদিও গত বছরের। ভিতরের ঘরটি আকাংক্ষা কিছু বড়। তাতে একটি নেয়ারের খাটিয়া পাতা। এঘরে একটি কুন্ডলি আছে—বর্তমানে শূন্যগর্ত, কিন্তু প্রদীপ শিখার কজল-চিহ্ন প্রমাণ দেয়, ওখানে কোন ঠাকুরের মূর্তি বা পটের সামনে এককালে প্রদীপ জালানো হত।

অতসীর গৃহ-পরিদর্শন শেষ হয়েছিল। দুবেজীকে প্রণাম করে, ‘লছমি’ কার নাম ? শুধু দুবেজী নয়, রক্তনও অবাক হয়ে যায় এ-প্রশ্নে। দুবেজীকে স্বীকার করতে হয়, লছমি তার একমাত্র কন্যা, চার বছর বয়স—লছমির মা থাকে পাশের কোয়ার্টার্সে। একটু পরেই সে আসবে। জানতে চায়, অতসী কেমন করে তার নাম জানল।

অতসী সে কথার জবাব না দিয়ে বলে, আগেকার ম্যানেজারবাবুর একটা মেয়ে ছিল, ছোট্ট মেয়ে, নয় ?

—জী নেহী, এক লেড়কা থা। কাইসে সমঝলেন ?

অতসী এবারও ওদের কোতুল নিবৃত্ত না করে প্রশ্ন করে, বাগ্নার বাসন আছে তো ? আমরা তো সে সব কিছু আনিনি।

দুবেজী তার বাধা লঙ্ঘি ফিরে যায় : বে-ফিকর রহিয়ে। আগামীকাল হাট-বার। সব কিছুই পাওয়া যাবে। মাটির হাড়ি, আলুমিনিয়ামের থালা, গ্লাস, লোহার হাতা-খুস্তি। ঐ সঙ্গে জানায়, আজ রাত্রে অতসীকে বাগ্না করতে হবে না। আজ রাত্রে লছমীর মা ওদের দুজনকে নিমন্ত্রণ করছে। তবে ইঁা, দুবেজীরা নিরামিষানী, ফলে—

বুধন বাধা দিয়ে বলে, বে-ফিকর রহিয়ে দুবেজী। আমরা আশ্রি নিরামিষ ছই-ই খেতে অভ্যস্ত।

ঘরের প্রান্তে একটি বছর পনেরোর উদোষ-গা ছোকরা উঁকি মারছিল। দুবেজী তাকে ডেকে নিয়ে এসে তার বিচিত্র ভাবার বলল, এর নাম বুধন, এ আপনাদের দেখ্‌ভাল করবে। মাইজী স্বয়ং আসছেন একথা তো জানা ছিল না, তাই বুধনকে বলে রেখেছিল। বুধন পূর্ববর্তী ম্যানেজারের কখাইও-হ্যাও ছিল—অর্থাৎ ঘর দোর সাফা করা, জামা-কাপড় কাচা, জল তোলা থেকে বাঙালী থানাও সে কুছু-কুছু পাকাতে পারে।

বুধন এসে সলজ্জে সেলাম করল মাইজীকে।

অতসী তাকে প্রশ্ন করে, চা বানাতে পারিস ?

বুধন ঘাড় নেড়ে মাথ দেয়।

অতসী ওকে তিনকাপ চা বানাতে বলল। তারপর শুধরে নিয়ে বলে, চার কাপই বানা। তুইও তো চা খাস ? না কি রে ?

—হিঁ ! —একগাল হাসল বুধন।

বুধন চলে গেল বাগ্নাঘরের দিকে। উত্তন তৈরীই আছে, কাঠও জমা করা আছে ভাঁড়ারে। দুবেজী বুদ্ধি করে চায়ের পাতা, চিনি ও দুধ রেখেছিল জমিয়ে।

অতসীকে সংসার গুছিয়ে নেবার স্বযোগ দিতে দুবেজী ম্যানেজারবাবুকে ডেকে নিয়ে বাইরের দাওয়ায় মোড়া টেনে নিয়ে বসল। দুবেজী এ কাঠের কারখানায় আজ আট-দশ বছর আছে। আংরেজী জানে না, তবে কাঠের হিসাব বোঝে। পাঁচ-ছয়-সাত ইঞ্চি ব্যাসের গুঁড়িতে কত দৈর্ঘ্যে কত 'সিয়েফটি' কাঠ

পাওয়া যাবে যুগে যুগে হিসাব জুড়ে বলতে পারে। কাঠচেরাই কলে বিদ্যায় নেই—হাত-করাতে চেরাই হয় কাঠ। দশ-বিশ জন মুনিষ খাটে। সেকশান অনুযায়ী কাঠ লাধ দেওয়া হয়, নম্বর দেওয়া হয়। তারপর হাওয়ায় সিজনিং করা হয়। কীভাবে কাঠ সাজালে রসস্থ আপওয়াল কাঠ স্বল্পসময়ে উপযুক্ত ‘সিজও-কাঠে’ রূপান্তরিত হয় এসব তত্ত্ব ছবেজ’র ভালমতন জানা। নতুন ম্যানেজারবাবু আংরেজী জানেন, কিন্তু কাঠ-বিজ্ঞানের এসব গুহ্য গুরুমুখী বিদ্যা যে তাঁর জানা নেই তা অচিরেই সমঝে নিল ‘কাঠবুড়ো’। রঞ্জন অকপটে স্বীকারও করল অজ্ঞতা। ছবেজী ওকে আশ্বাস দিল তার বাধাবন্ধ লজ্জা : আপ বে-ফিকরু রহিয়ে।

একটু পরে কাচের গ্লাসে দু-গ্রাস চা নিয়ে এল বৃধন, সঙ্গে একটা কলাইয়ের খালার খানকর বিস্কুট অতসীর বাক্সে তখনও কিছু বিস্কুট অবশিষ্ট ছিল। চা পানান্তে ছবেজী রঞ্জনকে নিয়ে কাঠ চেরাই-এর কারখানা দেখাতে নিয়ে গেল। অতসী বৃধনকেও বিদায় দিয়ে দরজায় আগড় দিল। সারাদিন ঘায়ে ভিজে ব্লাউসটা জবজব করছে। কুয়ো থেকে জল তুলে এবার সে গা ধোবে। স্নানঘর নেই এ বাড়িতে—অবশ্য উঠানের চারিদিকেই বেড়া তোলা—গা খুলে স্নান করার অনুবিধা নেই কিছু, তবু আজন্ম সংস্কারে বাথরুমের চার-দেওয়ালের অভাবটা আজ অনুভব করল বিশেষ করে। সদর বন্ধ করে হ্যাটকেস খুলে তোয়ালে, সাগান, শাড়ি ব্লাউস বার করতে করতেই আবার সদর দরজায় ঢোকা পড়ল। বাধ্য হয়ে উঠে আসতে হল আবার। দরজা খুলে দিয়ে দেখে ওরই বয়সী—ম্যা ওর চেয়ে কিছু ছোটই হবে, বন্দনার বয়সী একটি মেয়ে। হিন্দুগানা। একটা ছাপা শাড়ি ডানদিকে আঁচলা দিয়ে পরেছে, বাঁ হাতে সবুজ-লাল-হলুদ কাচের চুড়ি ; কপালে একটা কাচপোকায় টিপ। আন্দাজে মনে হল, এ নিশ্চয় ছবেজার ঘরনী ; কিন্তু ঠিক কি তাই? ছবেজী চল্লিশের কোঠায়, তার বউ এতটুকুন? অতসী বললে, আইয়ে ভিতর।

মেয়েটি সাদা বাংলায় বললে, আপনি আসছেন আমরা জানতুমই না—

অতসী অবাক হল। বিশেষ করে ‘জান’ খাতুতে ‘তুম’ প্রয়োগে। বলে, এত ভাল বাংলা কোথায় শিখলেন?

—আমার পিতাজী বার্নপুরের কারখানায় কাজ করতেন! ছেলেবেলায় বাঙালী ছেলেমেয়েরাই আমার সাথী ছিল। আশ্রয় করতে যাচ্ছিলেন বুঝি?

অতসীর হাতে তখনও ধরা আছে সাবান তোয়ালে। স্বীকার করে বললে,

ইয়া, তা জান না হয় পরেই করা যাবে। আপনি বহন ভিতরে এসে। আমার নাম অতসী, আপান—

—আমি লছমীর-মা। আমাকে ‘যমুনা’ বলে ডাকবেন। আর তুমিই বলবেন। তা শুধু বসব কেন, চলুন আপনার জল তুলে দিই।

অতসী আপত্তি জানায়; কিন্তু লছমীর মা কর্ণপাত করে না। অবলীলাক্রমে সে তিন-চার বালতি জল তুলে ফেগল পাতকুয়া থেকে। বলে, আশ্রান করে নিন, আরাম লাগবে। সারাদিন কত খকল গেছে—

অতসী বলে, এমন খোলা-মেলা জায়গায় শ্রান করা তো অভ্যাস নেই, কেমন যেন অনোয়াস্তি লাগে।

লছমীর মা একটা মোড়া টেনে নিয়ে বসে পড়েছিল। ওখান থেকেই বলে, আমাকেও সরম হচ্ছে না কি দিদি? ঘরে উঠে যাব?

অতসী লজ্জা পায়, বলে, না না তা নয়...তবে অন্য সময়...

লছমীর মা মুখ টিপে বলে, অন্য সময়েই বা কী? আপনার সংসারে শস্তর ভাস্কর মায়া দেয়রতি তো না-আছে। অন্য সময় থাকলে তো থাকবে আপনার মরদ! তার কাছে সরম হলে আমরা নাচার!

অতসী খুশি হয় মুখরা মেয়েটিকে পেয়ে। এসব ক্ষেত্রে আক্রমণই হচ্ছে প্রতিরক্ষার উপায়। তাই কথা ঘুরিয়ে অতসী বলে, তাই বুঝি? তা তোমার ঘরেও বুঝি এই হাল? মরদের সামনে গা খুলে শ্রান করতে হয়?

লছমীর-মা রীতিমত মুখরা। ফস্ করে বলে বসে, না দিদি। আমার বাড়িতে আমি অন্য ইস্তেজাম করে নিয়েছি। আমার মরদ তো আপনার মরদের মত নওকোয়ান নয়—বুড়োর নজর থেকে নিজেকে আড়াল করতে না পারলে মন খুলে আশ্রান করতে পারি না।

একটু আহত হয় অতসী। বলে, বুড়ো! বুড়ো হবেন কেন দুবেজী?

—দোজবরে তো! ওরা ঐ রকমই হয়।

এতকণে রহস্তটা পরিষ্কার হল। যমুনা নিজে থেকেই বলে—লছমীর মা স্বর্গে যাবার পর দুবেজী তাকে বিবাহ করেছে। প্রসঙ্গটা চাপা দিতে অতসী বলে, এ বাড়িতে শ্রানঘর নেই, কিন্তু পাখানাও তো দেখছি না—

লছমীর-মা বলে, ও-কথা বলবেন না দিদি। পাখানা এ বাড়িতে এক মাইল লম্বা! খিড়কির দরজাটা খুলে দেখবেন—পিছনে কী বিরাট জঙ্গল। সবটাই আপনার। ওদিকে কেউ যায় না।

এ প্রসঙ্গটাও চাপা দিতে হয়। অতসী গায়ে সাবান মাখতে মাখতে বলে,

একটা মুশকিল হয়েছে। ঘরে একটা মাত্র খাটিয়া আর একটা যোগাড় হয় না?

খেরাল হয় যমুনার। বলে, তাই নাকি? কই দেখি—

উঠে চলে যায় ভিতরে। শোবার ঘরে কী সব খুটখাট করতে থাকে।

স্নান সেয়ে ভিজ্ঞে কাপড়টা মেলে দিয়ে অতসী ফিরে এল শোবার ঘরে। এখনও দিনের আলো আছে। ঘরের ভিতরটায় গুটি গুটি অন্ধকার এগিয়ে আসছে। ঘরে ঢুকে দেখে ইতিমধ্যে যমুনারা একা হাতে রন্ধনের বেডিংটা খুলে ফেলেছে। চারপাইটা খাড়া করে দেওয়ালে ঠেসানো। ঘরজোড়া মন্ত বিছানা পেতে মশারী খাটিয়ে দিয়েছে। অতসীকে দেখেই বললে, দেখুন দিদি, বিছানা পসন্দ হচ্ছে? দোসরা খাটিয়ার আর জরুরং আছে?

অতসী কী বলবে ভেবে পায় না।

মুখরা যমুনা বলে, একটা কথা বলব দিদি? কিছু মনে করবেন না তো?

—কি?

—মশারী তো এনেছেন একটা—দুটো চারপাই নিয়ে কী করতেন?

এর কি জবাব? অতসী আদৌ বিছানা সঙ্গে নিয়ে রওনা হয়নি। বাস্কবীর বাড়িতে, বিছানার দরকার হবে না; ট্রেনেও দিনে দিনে যাতায়াত। ফলে বিছানা সে আনেইনি আদৌ। যমুনা বলে, দু-নম্বর প্রশ্ন : ই্যা, দিদি—তামাম রাত বুঝি একটা মাসুকের হাতে মাথা দিয়ে শুতে হয়? দু-নম্বর একটা বালিশও তো আনবেন?

মরমে মরে যায় অতসী। আমতা আমতা করে বলে, এত তাড়াহড়ার মধ্যে শুছিয়ে নিতে হল...

—বুঝেছি। এবার আপনার সিঁদুর কোটাটা বার করুন দিদি। আস্তান করবার সময় সিঁধিটা বিলকুল সাদা হয়ে গেছে।

বিড়ম্বনার চূড়া। যমুনাই শেষে বলল, ঠিক আছে। রাতে যখন আমার ওখানে আসবেন তখন সিঁদুর পরিয়ে দেব। এবার হিসেব জুড়ে দেখুন, আর কি কি আনতে ভুলেছেন।

অতসী নিজেকে সামলে নিয়ে বলে, এ কি? তুমি যাচ্ছ কোথায়? এস একটু চা করি। খেয়ে যাও।

—আজ নয় দিদি। আজ আমার বাড়িতে দুজন মেহমান আসবেন। ইন্তেজাম এখনও বাকি আছে আমার। আমি শুধু আপনাকে নিজে মুখে বলতে এসেছিলাম। বুড়টার নেওতা যদি না নেন তাই, চাঁল—

যমুনা চলে গেল। সদর-দরজাটা বন্ধ করে অতসী এসে বসল পাতা বিহীন, শুয়েই পড়ল। এ কী কাণ্ড সে করে বসেছে। কোথা থেকে কী হয়ে গেল। আজ সকালেও কি সে ভাবতে পেরেছিল এমন একটা অসম্ভব কাণ্ড কাণ্ডে বসবে? কেন-কেন কেন?

যদি বল, ঐ মৃত্যুপথযাত্রীর প্রতি এ একটা অহৈতুকী কল্পনা, তবে সেটা নির্জলা সত্য হবে না—এটুকু বুঝবার মতো বুঝি ওর আছে। ওর অবচেতন মন এমনই একটা কিছু চাইছিল—কুনালের ভাবায়: ‘আমি খুশি হব, ঐ চক্ৰ বহরের ছেলেরা যদি একেবারে খালি হাতে তোমাকে ফেলে রেখে না যায়। আমি যা দিতে পারিনি...’

ছি-ছি-ছি। তাই কি এমন একটা ফাঁদ পেতেছে অতসী? বিছানাটা মে স্বয়ং রচনা করেনি; কিন্তু পরিবেশটা যে তার নিজে হাতে গড়া। রজন এটাকে কী ভাবে নেবে? বিছানাটা এখনই গুটিয়ে ফেলবে? তাতেই বা সমাধান কোথায়? মশারী একটাই। থাকারে সেটা বেশ বড়। দ্বিতীয় মশারী কোন লজ্জায় চাইবে? কার কাছে? আর বিনা মশারীতে একটা মানুষ এই বিঘ্ন-বনে শোবেই বা কি করে?

যমুনার সেই উৎকট রসিকতাটা সে কিছুতেই ভুলতে পারছিল না, তারায় রাত বুঝি একটা মানুষের হাতে মাথা রেখে ঘুমাতে হয়?

অতসী—যে অতসী আঠান বছর বয়সে আজও জানে না, পুরুষ মানুষে চুমু খেলে সারা দেহে কী-জ্বালের শিহরণ লাগে—সে এ-কথার জবাব খুঁজে পার না। আবোল-তাবোল ভাবতে ভাবতে কখন সে ঘুমিয়ে পড়ে সন্ধ্যা রাতেই।

ঘুম ভাঙলো যখন, রাত তখন আঁট। সদর দরজার কারা খাঁকা দিচ্ছে।

দোর খুলে দেখে লণ্ঠন হাতে ছবেজী ডাকতে এসেছে। রজনও আছে তার সঙ্গে। অতসী তৈরী হয়েই ছিল। সদর দরজায় তাল দিবে বেয়িবে আসে রাস্তায়। ছবেজীর ছাপরা দূরে নর, কাছেই। যজ্ঞডুমুর গাছটার ওপাশে।

লছমী ঘুমিয়ে পড়েছে। হাত ধরে অতসীকে ভিতরে নিয়ে গেল যমুনা। ঘরদোর ঘুরিয়ে দেখালো টেমি হাতে নিয়ে। ছবেজী আর রজন বাইরের দাঁড়ায় বসল মাত্র পেতে। যমুনার ছাপরা এক কামরায়। এখানেও পৃথক রাস্তাঘর। ওর শরনককে লক্ষীর পট আছে। বাঙালী মেয়েদের দেখাদেখি সে প্রতি লক্ষীর কাছে পূজা করে। শীখ বাজার। যমুনা বললে, ওদের আগে খাইয়ে দিই, কি বলেন? তারপর আমরা ছ-বোন একসাথে খাব। কেমন?

অতসীরও সেটাই পছন্দ। হারিকেন বাতির আলোর পুরুষ ছজন আসননির্ভি

হয়ে খেতে বসল। স্বাস্থ্যের থেকে যোগান ছিল যমুনা, পরিবেশন করল অতনী।
আয়োজন সামান্য—অথবা কে জানে, এই হয়তো ছবেজী-যমুনার দৃষ্টিভঙ্গী থেকে
রাজকীয় আহার্য : রুটি, অড়হরের ডাল, রান-তকইয়ের তরকারী, আলু-বেগুনের
কোল, পাঁপের ভাজা, ছরকর আচার এক সবশেষে একবাটি করে খন হুখ।

কর্তাদের খাইয়ে ওরা ছজন খেতে বসল। বাসনের অভাব। মেজে নেওয়ার
না আছে সময়, না প্রয়োজন। যমুনা অন্নানবদনে ছটি এঁটো খালা তুলে এনে
নতুন করে আহার্য সাজালো।

ঠাই করে, আহার্য সাজিয়ে যমুনা বসল, একটু অপেক্ষা করুন দিদি। আমার
নজরে ব্যাপারটা বিলকূল বুঝা লাগছে। আগে ওটার ব্যবস্থা করি—

—কোনটার? কোন জিনিসটা খাবার লাগছে তোমার?

যমুনা ঘটির জলে এঁটো হাতটা ধুয়ে উঠে গেল নিজের শয়নকক্ষে। একটু
পরেই ফিরে এল একটা কাঠের সিঁচুর কোটা নিয়ে। আঙুলে করে সিঁচুর নিয়ে
পরিচয় দিল অতনীর সিঁখিমূলে। অতনী সংতারমুক্ত নয়, কিন্তু কিছুই করণীয়
নেই তার। নির্বিকারভাবে প্রতিদানে যমুনার সিঁখিতে সিঁচুরটুকু এঁকে দিল,
নোয়ার সিঁচুর ঠেকালো। ওর নিজের হাতে শাখা-নোয়া কিছুই নেই। কিন্তু
সে প্রসঙ্গে যমুনা এল না। আধুনিক বাঙালী সৌমস্বিনীর অনেক যে ওসব
ব্যবহার করে না এটুকু তার জানা।

ছজনে আহ্বারে বসল।

একটু পরে যমুনা বলে, আমার রান্না দ্বিধির পসন্দ হচ্ছে না, নয়? কিছুই ভো
খাচ্ছেন না আপনি!

অতনী প্রতিবাদ করে, না না, রান্না তো ভালই হয়েছে। খাচ্ছি তো—

—তবে বোধহয় নিরামিষ রান্না বলে খেতে কষ্ট হচ্ছে আপনার।

অতনী কেমন করে বোঝাবে—সেসব কিছুই নয়। ওর আঠাশ বছরের জীবনে
আজই প্রথম অপরের এঁটো খালার খেতে হচ্ছে। এটা তার কাছে সম্পূর্ণ নতুন
অভিজ্ঞতা। এতে সে অভ্যস্ত নয়।

রাত দশটা নাগাদ ওরা বিদায় নিল। যমুনা বসল, কাল সকালে মুখ হাত
ধুয়ে এখানেই চলে আগবেন কিন্তু দিদি।

জবাব দিল যমুনা। একটু দূরে দাঁড়িয়ে ছিল সে। বললে, আসবে। কিন্তু
কাল রাতে আপনারা তিনজনে আমার ওখানে খাবেন। কাল তো হাটবার?

লগ্নন ধরে ছবেজী ওদের বাসা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে বিদায় নিল।

এক আকাশ তারা। এমন ঝলমলে তারা ওঠে না কলকাতার আকাশে।

হুবেজীকে বিদায় দিয়ে সদর দরজা বন্ধ করেই হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়ে রওন ।

অতসী ধমক দেয়, কী হল ? হিজবিজবিজের মত হাসছ কেন অমন করে ? রওনের হাসির ধমক তখনও খামেনি । কোনক্রমে আঙুলটা তুলে সে নির্দেশ করে অতসীর সিঁথিমূলের দিকে ।

অতসী বলে, তা এতে এত হাসির কী আছে ? তুমার রোলে মেকআপ, নেণার সময়েও তো সিঁথিতে সিঁদুর মাখতে হত । হত না ?

—তা ঠিক ! ওরা আচ্ছা জব্ব হয়েছে কিন্তু । ভেবেছে আপনি আমার বউ ! আপনি ! এই রুদ্ধস্বর কণ্ঠে তুমার স্বামী পুনরুজ্জীবিত হল না তাহলে ?

স্বর কাটল । অতসী গম্ভীর হয়ে বললে, আমি কিন্তু কাল সকালেই টাটানগর চলে যাব রওন ।

হাসি ধেমো যায় । রওন সামলে নিয়ে বলে, তা কেমন করে হবে ? কাল রাতে ওদের নিমন্ত্রণ করলাম যে ?

—সে তুমি করেছে । তোমার দায়িত্ব । আমি তার কি জানি ?

—এ্যাই, না ! প্রোজ ! অতসী'দ ! অন্তত কালকের দিনটা ম্যানেজ করে দিয়ে যান ।

অতসী জবাব দিল না । খোঁপা খুলতে খুলতে চলে এল এঘরে । রওনও এল পিছন-পিছন । বকবক করতে করতে । হঠাৎ দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে সে ঘেন ভূত দেখল, একী ! এভাবে বিছানা করেছেন কেন ?

অতসীর কান্না পাচ্ছিল । কোনক্রমে সামলে নিয়ে বলে, আমি কেন করব ? যমুনা বিছানা পেতে দিয়ে গেছে ।

—ও ! তাই বলুন । আহুন দুজনে ধরাধরি করে ঠিক করে নিই । আমি ঐ বাইরের ঘরে শোব, মাটিতে । আর আপনি এঘরে খাটিয়া পেতে ।

দাঁতে-দাঁত চেপে অতসী বললে, কিন্তু মশারী যে মাত্র একটা ?

এতবড় সমস্যাটাকে পাক্তাই দিল না রওন । অগ্নানবদনে বললে, মশারী আপনিই খাটান । আমি ওডোমস মেখে শোব ।

অতসী—যে মেয়েটা টাটানগর স্টেশনে সন্নিয়া হয়ে একটা সিঁদুড় নিয়ে বসেছিল—সে এবার একই ভঙ্গিমায় সন্নিয়া হয়ে বলে বসল, তা কি সম্ভব ? এখানে প্রচণ্ড মশা ! জঙ্গলের মশার কামড়ে কী যন্ত্রণা তুমি জান না !

মশার কামড়ের যন্ত্রণা কী নির্দাক রওন তা নিশ্চয়ই জানে না—একটি আঠাশ বছরের অনাত্মাতা কুমারীর অন্তরের নির্দাক যন্ত্রণা—যাতে তাকে এভাবে

নির্গন্ধ হতে হয়—তাও যখন সে জানে না। বললে, মশারি আমাকে কামড়াবেই না! রক্ত কোথায় আমার শরীরে? দেখুন না!

হাতখানা বাড়িয়ে দেয়।

এই কি হাত বাড়িয়ে দেওয়া? অতসী জবাব দিতে পারে না। কী বা বলতে পারত জবাবে? কাঠের পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে বইল। রঞ্জন অক্ষপ করল না। একা হাতেই নতুন ব্যবস্থা করল। বাইরের ঘরে পাতল নিভের বিছানা, মাটিতে। এঘরে খাটিয়া পেতে বিছানা পাততে গেল। অতসী রাজী হয় না। খাটিয়ায় শোওয়া তার অভ্যাস নেই। অগত্যা এঘরেও মাটিতে বিছানা পাততে হল। মশারি খাটালো। তারপর স্ট্রাকেস খুলে বার করল গেলি, পায়জামা, চপ্পল। সব নিয়ে ওঘরে যেতে গিয়েও হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করল, আচ্ছা আপনি লছমীর নাম জানলেন কেমন করে?

অতসী আঙুল তুলে দেখিয়ে দিল দেয়ালে পেনসিল দিয়ে লেখা আছে নামটা। বাঙলা হরফে।

রঞ্জন বলে, লছমী বাঙলা-হরফ চেনে না। এ নিশ্চয় আগেকার মানেজার-বাবুর ছেলের কাণ্ড। ‘কাফ্-ল্যান্ড’।

অতসী জবাব দিল না। রঞ্জন ওঘরে চলে যাবার পর সে কলসী থেকে জল গড়িয়ে খেল! পোশাকী শাড়িটা পালটিয়ে আটপৌরে লালপেড়ে একটা মিলের শাড়ি পরল। ক্লাউস-রেশারী খুলে রেখে শুতে যাবে, হঠাৎ আবার ঘরের বাইরে থেকে রঞ্জন ডাকল, অতসীদি, শুয়ে পড়েছেন নাকি? এঘরে খাবার জল নেই। একগ্রাস জল নিয়ে মাথার কাছে রাখব।

মারি গা ভাল করে ঢেকে অতসী আবার দরজাটা খুলে দেয়।

রঞ্জন ঘরে ঢুকল। কলসী থেকে ওর ক্লাসে কিছুটা জল ভরে নিয়ে ফিরবার উদ্ভোগ করেছে, হঠাৎ অতসী বলে, একটা কথা রঞ্জন—আজ তুমি এই জনাস্তিকেও আমাকে ‘অতসীদি’, ‘আপনি’ বলছ কেন? এখানে তো বাইরের লোক কেউ নেই।

রঞ্জন দাঁড়িয়ে পড়ল। বললে, বা-রে পরিস্থিতিটা যে একেবারে কনভার্স থিরোরেম। তখন আপনি ছিলেন ‘তম্রা’, আমি ‘কল্যাণ’। তাই সর্বসমক্ষে তখন আপনি ছিলেন অতসীদি, জনাস্তিকে—‘আমার তম্রা’। এখন ঠিক উল্টো। বাইরের জগতে—দোবেজী-যমুনার দৃষ্টিতে—আপনি আমার বিয়ে-করা-বউ; আর ঘরের ভিতর আপনি আমার অতসীদি।

অতসী অনেকক্ষণ জবাব দিল না। তারপর হঠাৎ বলে, আর একটা কথা।

একদিন তুমি আমাকে একটা ইংরাজী কোটেশান তুলিয়েছিলে, মনে আছে ?
এরিক শ্বেগলের ‘ল্যভ্-স্টোরি’ থেকে ?

—হ্যাঁ, মনে আছে ! কেন বলুন তো ?

—বইটা আমার পড়া নেই। গল্পটা সংক্ষেপে বলবে ?

—‘ল্যভ্-স্টোরি’ পড়েননি ? সিনেমাটাও দেখেননি ? আশ্চর্য ! ‘সায়ান ও’
নীল আর অলি ম্যাকগ্র-র অনবদ্য ছবিটা কলকাতার অনেকদিন তো চলেছিল !
আচ্ছা শুধুন। সরে বসুন তাহলে—

রঞ্জনর উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু পারজামার পকেটে সিগ্রেট বেশলাই ছিল। সে
মোজ করে একটা সিগ্রেট ধরালো। বালিশটা টেনে নিল কোলের উপর।
বসল বিছানার প্রান্তে। অতনী আচলটা দিয়ে সারা গা ভালো করে ঢেকে বসল
অপরপ্রান্তে।

রঞ্জন যথেষ্ট ভাবতে পারেনি—অতনী বইটাও পড়েছে, ছায়াছবিটাও
দেখেছে। ও শুধু আজ শুনেছে চায়—রঞ্জনর মুখ থেকে শুনেছে চায়—
লিউকেমিয়ার রোগিনী জেনীর কথা—কীভাবে জেনী সেই মর্মান্তিক দুঃসংবাদটা
গ্রহণ করেছিল।

॥ ১২ ॥

রঞ্জনের নায়ক হচ্ছে : অলিভার ব্যারেট IV। বয়স কুড়ি, উচ্চতা পাঁচ
ফুট এগারো, ওজন একশ পাঁচশি পাউণ্ড, হার্বাটে আইনের ছাত্র। তা যেন হল,
কিন্তু ঐ ব্যারেট IV ব্যাপারটা কী ? তার মানে, ওর বাপের নাম—‘অলিভার
ব্যারেট III’, ঠাকুরদার নাম—‘অলিভার ব্যারেট II’ এবং ওর সম্ভাবন হল
তার নাম অনিবার্যভাবে হবে—‘অলিভার ব্যারেট V’। খানদানী ব্যবস্থা।
অসম্ভব : রঞ্জনের নায়ক—কী বলব ? আমেরিকার তো রাজা নেই, নইলে
বলতুম : রাজপুত্র। অলিভার ব্যারেট III—নায়কের পিতৃদেব, অত্যন্ত রাশ-
তারা মানুষ। অপরিমেয় অর্থ, অতুলনীয় প্রতিপত্তি, দুর্দান্ত স্বাস্থ্য এবং সবচেয়ে
বড় কথা তাঁর ব্যক্তিত্ব। ছেলে যুনিভার্সিটি রু—জনপ্রিয় স্পোর্টসম্যান ; কিন্তু
তার পিতৃদেব তাঁর আমলে ছিলেন আরও বড় জাতের খেলোয়াড়। শুধু হার্বাটের
প্রতিনিধিত্বই করেননি, করেছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের—অলিম্পিকে। এহেন
পিতা এবং এহেন পুত্রের বৈরোধ সময় উপলক্ষ্যের উপজীব্য বটে ! উপলক্ষ্য ?
রঞ্জনের নায়িকা—জেনী ক্যাভিলেরি।

অভিজাত্যের ভূমণীবে সুপ্রতিষ্ঠিত অলিভার ব্যারেট III ঐ নামগোত্রহীনা মধ্যবিত্ত পরিবারের কুমারী কন্যাটিকে যে পুত্রবধূ করে নিতে স্বীকৃত হবেন না এটা আশঙ্কাজনক নয়। জেনীর অপরাধ একাধিক—প্রথম কথা, সে গরীব বাপের একমাত্র মেয়ে, দ্বিতীয়ত ওয়া রোমান ক্যাথলিক, তৃতীয়ত খাঁটি অ্যাংলো-স্যাকশন নয়, ইতালিয়ান। এমন মেয়ের প্রেমে পড়ল কি করে এমন ছেলে ?

এরিক শ্বেগলের মাত্র একশ একত্রিশ পৃষ্ঠার এই রচনাটির অন্ততম শ্রেষ্ঠ গুণ হচ্ছে বাক-সংযম। প্রতিটি ক্ষেত্রেই আলাপচারী এত সংক্ষেপে সোচ্চার যে এই রচনাইশলীকে অনন্ত বল চলে। ওদের প্রথম সাক্ষাতের পরিবেশটার আক্ষরিক অম্লবাদ শোনাই, তাহলেই বুঝবেন।

অলিভার একটি বিশেষ বইয়ের খোঁজে র্যাডক্লিফ লাইব্রেরীতে এসেছে। জেনী ঐ র্যাডক্লিফে ‘সদ্বীত’ নিয়ে উচ্চশিক্ষার ছাত্রী। অবসর সময়ে সে লাইব্রেরী কাউন্টারে ডিউটি দেয়—বাড়তি রোজগার তার প্রয়োজন। হার্বাট বড়লোকের ছেলেদের কলেজ, তার নিজস্ব লাইব্রেরী প্রকাণ্ড। তবু অলিভার এসেছিল র্যাডক্লিফ লাইব্রেরীতে। কাউন্টারে-বসা উনিশ বছরের নীলনয়নার দিকে এগিয়ে এসে অলিভার বললে, ‘তোমাদের এখানে The Wanning of the Middle Ages বইটা পাব ?’

মেয়েটি একনজরে আমাকে দেখে নিরে বলল, তোমাদের হার্বাট কলেজের তো নিজস্ব লাইব্রেরী আছে।

—আছে। কিন্তু হার্বাটের ছেলেরা র্যাডক্লিফ লাইব্রেরীও ব্যবহার করতে পারে।

—আমি আইনের কথা বলছি না, প্রেপি; বলছি মৌজ্ঞের কথা। তোমাদের হার্বাটের লাইব্রেরীতে পঞ্চাশ লক্ষ বই আছে; আমাদের আছে মাত্র কয়েক হাজার ছেঁড়াখোঁড়া বই।

আরে কাম! এ যে দেখছি দিদিমণি টাইপ! যারা ভাবে—যে-হেতু র্যাডক্লিফ আর হার্বাটের অমুপাত ‘পাঁচ : এক’ তাই মেয়েগুলোকে পাঁচগুণ স্মার্ট হতে হবে। একাত্তর দিদিমণিদের নাকে কামা ঘষে দেওয়াই যদিচ আমার স্বভাব, তবু আজ সংযত হতে হল—বইটার সত্যিই বড় প্রয়োজন ছিল সেদিন।

—শোন, ঐ শালার বইটা আমার জরুরী দরকার।

—দয়া করে জিবটাকে আর একটু সংযত করবে, প্রেপি ?

—তুমি কি করে ধরে নিচ্ছ আমি ‘প্রেপ স্কুলের’ ছাত্র—

—তোমার চেহারায়। বেশ বোকা যায়—তুমি বড়লোকের আদরে ছেলে এবং হাবাগোবা !

—আমি প্রতিবাদ করি—কুল বললে ! আমি আসলে শ্বাট এবং গরীব ।

—না-হে প্রেপি ! তুমি তা নও ! শ্বাট এবং গরীব হচ্ছি আমি ।

মেয়েটা আমার চোখে চোখ রেখে বসে আছে । নীল ছুটি নয়ন । ঠিক আছে, হয়তো আমাকে দেখলে বড়লোকের ছেলে বলে বোকা যায় ; কিন্তু তাই বলে কোন ব্যাডক্লিফ ছুঁড়ি—হোক না কেন নীলনয়না—আমাকে ‘হাবাগোবা’ বলে পার পেয়ে যেতে পারে না । বললুম, হঠাৎ নিজেকে অত শ্বাট ভাবছ কেন বল দিকিন ?

—কেন জান ? ধর তুমি যদি আমাকে এখন কফি-পানে আমন্ত্রণ করে বস, তাহলে আমি তা প্রত্যাখ্যান করব । একজুই আমি শ্বাট !

—বটে ! তবে শোন হে শ্বাট-সুন্দরী ! তোমাকে আমি এখন কফি-পানে আদৌ আমন্ত্রণ করছি না ।

—আর তাতেই প্রমাণ হচ্ছে তুমি : হাবাগোবা !

এই হল সূচনা । এ ছেন জেনীকে নিয়ে যেদিন অলিভার IV তার পিতৃদেবের প্রাসাদে উপনীত হল, তার বাহুবীকে পরিচয় করিয়ে দিল, সেদিন সৌজন্তের কোনও ক্রটি দেখা দিল না অলিভার III-র তরফে । কিন্তু পুত্রকে তিনি জনান্তিকে জানিয়েও দিলেন এ বিবাহ তিনি অস্বীকার করছেন না । কোনদিন করবেন না ।

চার নম্বর অলিভার ব্যারেট দুর্ধ্ব, বেপরোয়া এবং পিতার ব্যক্তিত্বের বিরুদ্ধে তার ছিল আটকশোর জেহাদ । এক কথায় বাড়ি ছেড়ে বার হয়ে এল সে, সম্পর্ক চুকিয়ে দিল বাপের সঙ্গে । ওর মা অ্যালিসন হচ্ছেন কাব্যে উপেক্ষিতা—ব্যক্তিত্ব-ময় স্বামী এবং বিজ্ঞোহী সন্তানের মাঝখানে তাঁকে দেখা-যায়-কি-না-যায় ।

তিন-নম্বর যে চার-নম্বরকে ত্যাজ্যপুত্র করেছেন, এ সংবাদ অজানা ছিল না হার্বাট ল-স্কুলের অ্যাসোসিয়েট ডীন মিস্টার উইলিয়াম টমসনের কাছে । তাই ঐ মেধাবী ছাত্রটি যখন শেষ বছরের অন্তঃস্কলারশিপ প্রার্থী হল, তখন তিনি তা প্রত্যাখ্যান করলেন । বলা বাহুল্য তাতে চার-নম্বরকে দমিয়ে রাখা গেল না ।

বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হল জেনী এবং অলিভার । অন্যতম আয়োজন । জেনী ততদিনে পাস করে বেরিয়েছে—তার উপার্জনেই অলিভার আইন পরীক্ষার শেষ ধাপটা অতিক্রম করবার চেষ্টা করছে । ওদের দাম্পত্য জীবনের সূচনাটা

বেদনাদায়ক—নিভাসই অর্থাভাবে। সেই জীবনযাত্রার কিছুটা বর্ণনা শুুন।
শ্রোগলের ভাবার—আক্ষরিক অনুবাদে :

—ওমর খৈয়ামের সেই বিখ্যাত লাইন-কটা পড়া আছে? সেই যে এক
টুকরো কবিতা, একটা মদের পাত্র, একটা কাব্যগ্রন্থ আর কুঞ্জবিতানে শুধু : তুমি !
ঐ কবিতার বইটাকে ধবে নাও আইনের একটা ঢাউস রেফারেন্স, কবিতা আর মদ
শ্রেফ, বাদাও ! বাস ! তাহলেই দেখবে ঐ 'তুমি'-র রোমান্টিকতা শ্রেফ
কপূর।

...জীবন মানেই তো পরিবর্তন। প্রতিটি সামান্যতম সিদ্ধান্তকে তোল করতে
হচ্ছে নবদম্পতির যৌথ-বাজেট কমিটিতে। হয়তো ও বলল, হাই অলিভার,
চল, আজ রাতে 'বেকেট' নাটকটা দেখে আসি। জবাবে আমাকে বলতে হয়,
তার মানে বোঝা? নগদ তিনটি ডলার! ও বলে, তার মানে? আমি বলি,
তার মানে তোমার দেড় ডলার, আমার দেড় ডলার! ও মাথা ঝাঁকিয়ে বলে,
তাহলে শেষমেষ কি দাঁড়ালো? আমরা যাচ্ছি, না যাচ্ছি না? আমি বলি,
দুটোর একটাও নয়। মানেটা দাঁড়ালো—নগদ তিন ডলার

...কেটে গেল দুটি বছর। নিদারুণ অর্থকষ্টতায়। জেনী উদয়াস্ত মাথার ঘাম
পায়ের ফেলে উপার্জন করে, আর অলিভার উদয়াস্ত পড়ে যার পরীক্ষার পড়া।
সাঁয়াসাঁয়াতে ঘর, আধপেটা আহার, ছেঁড়াখোঁড়া পোশাক—খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলেছে
ওদের দাম্পত্যজীবন। তারপর একদিন ডাকবাংলো এল একখানা আমন্ত্রণ লিপি :
মিস্টার অলিভার III-র ষাট বছরের জন্মদিনে আমন্ত্রণ করা হয়েছে মিস্টার অ্যাণ্ড
মিসেস অলিভার IV কে। শনিবার সন্ধ্যা সাতটায়, ম্যানচেস্টার্স-এর ইম্পিউইচে
ওদের পৈতৃক প্রাসাদ—'ডোভার হাউসে'। নিমন্ত্রণ পত্রের বামদিকের কোনার
ছোট্ট হরফে লেখা : 'আর. এস. ভি. পি.।'

জেনী বললে, এবার কী হবে?

আমি ধমকে উঠি, এবার কী হবে জানতে প্রশ্নটা করতে হচ্ছে তোমাকে?—
কলেই আবার বইটার মধ্যে ডুবে যাই আমি—আইনের বই। The State vs.
Percival, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মামলা।

ও বলে, আমার মনে হয় এতদিনে—

—এতদিনে কী?—জানতে চাই আমি।

—এতদিনে কী, তা তুমি ভালরকমই জান অল! তুমি কী আশা কর? বৃদ্ধ
ভ্রাতৃলোক হামাগুড়ি দিয়ে তোমার বাসায় এসে কমা চাইবেন? অলি, দেখ, তিনি
তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন—

—বাঁড়ের গোবর ! দেখছ না, খামের উপর হাতের লেখাটা আমার ঝারের ?

—তাই নাকি ! তবে যে বললে, তুমি চিঠিটার দিকে তাকিয়েও দেখনি ?

—বেশ, না হয় দেখেছি ! তাতে হলটা কী ? আমার এখন সামনে পরীক্ষা !

—অলি, একটা কথা ভেবে দেখ ! ষাট বছর বয়সটা বড় কম নয় ; হয় তো যতদিনে তুমি মিটমাট করতে রাজী হবে ততদিনে তিনি একেবারে ভেঙে পড়বেন ! তুমি কি—

আমি বাধা দিয়ে বলি—বুড়োটার সঙ্গে আমার এ জীবনে কোনদিনই মিটমাট হবে না । সেটা হবার নয় ।

জেনী আমার বিছানায় এসে পায়ের দিকে বসে পড়ল । সে কোন কথা বলছে না । কিন্তু বেশ বুঝতে পারি, সে একদৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে বসে আছে । অগত্যা বই বন্ধ করে তার দিকে ফিরে বসলাম ।

—তুমি কি একটা কথা ভেবে দেখেছ ? একদিন ঠিক ঐভাবে তোমার মঙান অলিভার ব্যারেট V—

—না ।—আর্ড চাঁৎকারে ওকে মাঝপথে ধামিয়ে দিই ! বলি, না । তার নাম ‘অলিভার ব্যারেট V’ হবে না ।

জেনীর কণ্ঠস্বরে পর্দা চড়ল না । একইভাবে ও বলতে থাকে, ঠিক আছে, ঠিক আছে, অল । ধরা যাক তুমি তার নাম রাখলে ‘হৌদল কুংকুং’ ; কিন্তু সেও তো তোমার প্রতি এ রকম ব্যবহার করতে পারে ! সে যতদিনে নওজোয়ান হয়ে উঠবে ততদিনে তুমি হয়তো সুপ্রিম কোর্টের এক পলিতকেশ বৃদ্ধ ।

আমি বললাম, তা হতে পারে না । ছেলের সঙ্গে আমার কোন যত্নবিরোধই হবে না, হতে পারে না । ও জানতে চাইল—কেমন করে এ সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দেহ হলাম । ওয়েল, প্রমাণ আমার হাতে নেই, যুক্তি দিয়ে বোঝাতে না পারলেও—আমি দৃঢ়স্বরে বললাম—এ আমি নিশ্চিতভাবে জানি কারণ আমি তাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসব ।

জেনী হাসল । বললে, ও । ভালবাসা ! কিন্তু অলিভার, তোমার বাবাও তোমাকে ভালবাসেন, ঠিক যেভাবে তুমি হৌদল কুংকুংকে ভালবাসবে, সেই ভাবেই । তবে তোমাদের ভালবাসার ধরনটাই যে ঐ রকম—তোমরা, ব্যারেটরা এত আত্মকেন্দ্রিক, এত প্রতিযোগিতা-পরায়ণ যে, পরস্পরকে শুধু ঘৃণা করতে করতেই তোমরা ভালবাসতে জান ।

আমি ঐ প্রসঙ্গের পূর্ণচ্ছেদ টেনে বলি : আমাকে বইটা পড়তে দাও ।

—দাঁড়াও । আরও একটা ব্যাপার আছে । ঐ ‘আর. এস. ভি. পি.’ ?

তা আছে। সৌভাগ্য বলে, নিমন্ত্রণ-পত্রের এক প্রান্তে ঐ চারটি অক্ষর ছাপা থাকলে প্রাপককে জানাতে হয় সে নিমন্ত্রণ রাখতে আসবে কি না। কিন্তু ব্যাকুলিকের সঙ্গীত-গ্র্যাজুয়েট কি আমার সাহায্য ছাড়া এমন একটা প্রত্যাখ্যান-পত্রও মুশাবিদা করতে পারে না?

জেনী কাতর ভাবে বললে, অল, শোন। দেখ, জীবনে মিথ্যা হয়তো বলেছি, লোককে স্বজ্ঞানে ঠকিয়েছিও; কিন্তু বিশ্বাস কর, জ্ঞাতসারে কখনও কোন মানুষকে আমি অহেতুক আঘাত দিইনি। ওটা আমি বোধহয় চেষ্টা করলেও পারব না।

ততক্ষণে আমি ধৈর্যের প্রাক্তমীমায় উপনীত। গম্ভীর হয়ে বললাম, প্রীত জেনী, অবাবে তুমি যা-ইচ্ছে লিখতে পার—যতটা বিনীতভাবে প্রত্যাখ্যান করতে চাও ততটাই বিনয় দেখিও। শুধু দয়া করে মন রেখ—পৃথিবী রসাতলে গেলেও আমরা দুজনে ঐ নিমন্ত্রণ রাখতে যাচ্ছি না।

আবার বইটা টেনে নিলাম আমি।

—নম্বরটা কত? —তাকিয়ে দেখি জেনী টেলিফোনের রিসিভারটা তুলে নিয়েছে।

—টেলিফোন করার কী ব্যবস্থা? একখানা চিঠি লিখে দাও না?

জেনী গম্ভীরভাবে বলল, আমার ধৈর্যেরও সীমা আছে, অল। নম্বরটা কত?

একরোখা মেয়েটাকে চিনতে বাকি নেই। স্বামেলা না বাড়িয়ে নম্বরটা বাতলে দিবে পার্শ্বভালের সঙ্গে সুপ্রীম-কোর্টে ফিরে গেলাম। সুপ্রীম-কোর্ট অনেক দূর, সেখান থেকে জেনীর দূরত্বও শুনতে পারার কথা নয়। তবু শুনতে পাচ্ছিলাম—

—গুডমর্নিং স্যার। আমি জেনী, জেনী ব্যারেট—

সুয়েডের বাচ্চাটাই টেলিফোন ধরেছে নাকি? ওর হ্যাঁ এখন ওয়াশিংটনে থাকার কথা। কাগজে গাই তো দেখলাম। তবে ‘নিউ ইয়র্ক টাইমস্’কে বিশ্বাস নেই। আঃ! ‘আমরা যাচ্ছি না’—এই কথাটা বলতে কতক্ষণ লাগে?

—অলি! —তাকিয়ে দেখি, টেলিফোনের কথামুখে হাত চাপা দিয়ে ও আমার দিকে তাকিয়ে আছে: অলি, তোমার মতটা কি কিছুতেই বদলাবে না?

দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়লাম আমি।

ও টেলিফোন থেকে হাতটা সরিয়ে নিয়ে বলল, আমি অত্যন্ত দুঃখিত—মানে আমরা দুজনেই অত্যন্ত দুঃখিত স্যার...

আমরা! দুজনেই! আমাকে জড়ানোর কি কোন প্রয়োজন ছিল?

—অলিভার!

আবার কী? কী আশ্চর্য! এখনও লাইনটা কাটেনি। এখনও টেলিফোনের কথাগুলো ওর হাত চাপা দেওয়া। বললে, বৃদ্ধ সত্যিই মর্মান্বিত হয়েছেন। উনি আশা করেছিলেন...মানে প্রীজ অলিভার...একটা লোকের রক্ত বরফে, আর তুমি নির্বিকারভাবে...

কি করে ওকে বোঝাই—অলিভার III পাথরে গড়া। পাথরে আঘাত করলে রক্ত ঝরে না। ও আবার আমাকে বলে, অল! তুমি নিজে দু-একটা কথা বলবে?

ওকে! ঐ পাথরের মূর্তিটাকে! জেনো কি বন্ধ উন্মাদ হয়ে গেছে?

—মানে, যা হোক কোনও কথা...জাস্ট একটা 'হ্যালো'!

—আমি কোনদিন ওর সঙ্গে কথা বলব না। এ জীবনে নয়!—দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করি।

তা করে দেখলাম জেনো কাঁদছে। শব্দ হচ্ছে না কিন্তু। শুধু ওর দু'চোখ বেয়ে অশ্রুর দুটি ধারা নেমে এসে টপ টপ করে পড়ছে টেলিফোনের মাউথপীসে। আর তখনই—ঠিক তখনই জেনোর একটা নতুন রূপ দেখলাম। সেই জেদি তেজিয়ান মেয়েটার একটা সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপান্তর। জেনো ভিক্ষা চাইছে!

--আমার অনুরোধ অলিভার! আমি কখনও তোমার কাছে কিছু চাইনি। আজ চাইছি! দেবে? শুধু দুটি মিনিট কথা? বলবে?

আমরা তিনজন। আমরা তিনজনে নিশ্চল মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছি (হ্যাঁ, 'আমার মনে হল আমার পিতৃদেব—সেই সুরোবের বাচ্ছাটাও দাঁড়িয়ে আছে এ ঘরে)!

জেনো এক বুঝতে পারছে না—সে যেটা চাইছে তা আমার অদেয়? আমি কার্পেটের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। সেইভাবেই মাথা নেড়ে ওর ভিক্ষাটা প্রত্যাখ্যান করলাম আমি। জেনো দাঁতে দাঁত চেপে আমাকে তৎ-মনা করল। ওর এ রূপটাও আমি জীবনে কখনও দেখিনি। ও অক্ষুটে শুধু আমাকে বললে, তুমি একটা হৃদয়হীন জানোয়ার!

টেলিফোন রিসিভার থেকে হাতটা সরিয়ে নিয়ে পরমুহূর্তই সে বললে, মিস্টার ব্যারেট, অলিভার আপনাকে বলতে চায়, তার নিজস্ব পন্থায়...

নিঃশ্বাস নেবার জন্ত ওকে থামতে হল। ও তখন কাঁদছিল। হুঁপিয়ে

হুঁপিয়ে। তাই একটু দম নিয়ে শেষে বলল, ওর বিচিত্র পন্থায় . আপনাকে
মতিয়ে ভালবাসে।

শক্তির শেষ বিন্দুটি ব্যয়িত করে এতক্ষণ সে রিসিভারে যন্ত্রটা নামিয়ে রাখে।
ঠিক পরমুহূর্তটিতেই আমি যে কাণটা করে বসলাম তার কোনও কৈফিয়ৎ নেই।
বোধহয় ঋণমুহূর্তের জন্ত আমি মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছিলাম—এটাই
আমার কৈফিয়ৎ। না! কোন কৈফিয়ৎই আমি দেব না। আমি যা বলেছিলাম
তার ক্ষমা নেই।

আমি এক ছুটে ওর দিকে এগিয়ে গেলাম। টেলিফোনটা ওর হাত থেকে
হিনিয়ে নিলাম। এবং দেওয়ালের উপর আছড়ে সেটাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে
ফেললাম—God damn you, Jenny! Why don't you get the
hell out of my life?

নিশ্চল করেকটি মুহূর্ত। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছিলাম। জানোয়ারের মত।
জানোয়ারই তো। হায় ঈশ্বর! আমি কি সত্যিই জানোয়ার? ধীরে ধীরে সজ্বিত
ফিরে পেলাম। তাকিয়ে দেখলাম ওর দিকে।

কিন্তু ও কোথায়?

আশ্চর্য। জেনী নেই। 'নেই' মানে কোথাও নেই। ঘরে নেই, বারান্দায়
নেই, উঁকে মেঝে দেখি—না, রাস্তাতেও নেই। নিঃশব্দে কেমন করে চলে
গেল সে? কখন? সেই যখন আমি দুনিয়ার বার হয়ে জানোয়ারের মত
হাঁপাচ্ছিলাম?

...এরপর অলিভারের ব্যর্থ সন্ধানের দীর্ঘ বিবরণ। ঘটনা সম্ভার, কিন্তু রাত
একটা পর্যন্ত সম্ভব অসম্ভব সবত্র সন্ধান নিয়েও সে জেনীকে খুঁজে পায় না। না,
ল-স্কুল লাইব্রেরীতে নেই। পরিচিত বন্ধু-বান্ধবীদের বাড়িতে সে যায়নি, এমনকি
ষাপের কাছেও সে ফিরে যায়নি। লক্ষ্য করে দেখল—জেনী তার ওভারকোট
এবং টুপিটাও নিয়ে যায়নি—অথচ বাইরে প্রচণ্ড বরফ-পড়া ঠাণ্ডা। দেহে-মনে
চরম পরিশ্রান্ত হয়ে অলিভার ফিরে এল সেই তাদের অভাবের সংসারে। তারপর
ওর ভাষাতেই শুধু—

রাত একটা বেজে গেছে। সমস্ত পাড়া নিশুতি। আর দৌড়াচ্ছি না আমি।
দৌড়ানোর পাল শেষ হয়ে গেছে। সেই পরিত্যক্ত শূণ্য ঘরে ফিরে আসতে
দৌড়াব কেন? বাড়ির কাছাকাছি এসেই দেখতে পেলাম—সিঁড়ির উপর, সদর
দরজার সামনে কে যেন শীতের মধ্যে শুঁড়িহুড়ি মেয়ে বসে আছে। তার গায়ে
মাথায় মো-ফ্রেক।

জেনো !

আতঙ্কগ্রস্ত হবার মত মনটাও অবশিষ্ট ছিল না, 'কথা বলারও শক্তি নেই । একমাত্র আশা ছিল—ওর হাতে একটা শক্ত কিছু থাকবে, যা দিয়ে ও আমাকে আঘাত করবে । ছিল না ! ও রিক্তহস্তা ।

—জেন ?

—অনি ? আমি চাবিটা নিয়ে যেতে ভুলে গিয়েছিলাম । চল, ঘরে যাই ।

আনি না, কতক্ষণ হল সে এসেছে । কতক্ষণ এই প্রচণ্ড নীতে মদ্র দরজার লামনে বসে কাঁপছে হিহি করে । দোষ করলাম আমি, আর শাস্তি পাচ্ছে ও । আমি এগিয়ে এসে বললাম, জেনো, আমার সরি—

—খাম

জেনো ঘুরে দাঁড়ালো আমার মুখোমুখি । তারপর শাস্ত্বরে বললে,
Love means not having to say you're sorry—

[ভালবাসার অভিধানে 'সরি' শব্দটার ঠাই নেই]

নিশ্চিন্ত রাত্রি নেই । ওদের নিরবচ্ছিন্ন দাবিজ্যের সংসারেও এল হঠাৎ আলোর বলকানি অলিভার দারুণ রেজাল্ট করে আইন পরীক্ষার পাস করেছে । গোটা বিশ্ববিদ্যালয়ে সে হয়েছে তৃতীয় । প্রথম হয়েছে যে ছেলেটি সে নিতান্ত বইয়ের পোকা, দ্বিতীয় একটি ডিসপেনপটিক ছাত্রী । ফলে হার্বার্টের পণ্ডার খেলোয়াড় অলিভার III এর বাজারদর প্রচণ্ড । একাধিক ভালো ভালো চাকরির অফার পেল সে । শেষেষ্ট ভরেন করল নিউ ইয়র্কের বিখ্যাত সলিসিটার্স ফার্ম : 'জোনহা অ্যান্ড মার্স'-এ । সম্বোধনে লেখক বলছেন, একটা কথা বলি—ওরা আমাকে এগারো হাজার আটশ ডলারের অফার দিয়েছিলেন—আমাদের বছরে এত বেশি মাহিনার চাকরি কেউ পাইনি । অর্থাৎ খার্ড হয়েছিলাম শুধু পরীক্ষার লিস্টে ।

নতুন চাকরিতে যোগদান করে অলিভার একদিন বললে, এ্যাঁই, একটা কথা বলব, হাসবে না তো ?

জেনো রান্নাঘরে তরকারি কুটছিল, বেরিয়ে এসে বললে, কী এমন কথা ?

—কদিন ধরে ঐ নামটা আমাকে 'হন্ট' করছে ।

—নাম ! কোন নাম ?

—ঐ 'হৌদল কুংকুং' ! দারুণ নামটা দিয়েছ তুমি রাগের মাথায় ।

জেনো হেসে ফেলে আমার ভাবসার দেখে ।

কিন্তু একটু চিন্তা-ভাবনা করার পরে আমাদের দুজনেরই মনে হল—তাই

তো। এতদিনেও আমাদের সম্ভান হল না কেন? কোন গুণগোল নেই তো? থাকলে কার? ওর, না আমার? এসব ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ হওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। অসত্য ডক্টর মটিয়ার শেফার্ড-এর সঙ্গে টেলিফোনে অ্যাপয়েন্ট-মেন্ট করে দুজনেই একদিন তাঁর চেম্বারে হাজির হলাম। ডক্টর শেফার্ড আমাদের দুজনকেই পরীক্ষা করলেন—নানান পদ্ধতিতে। সেটা ছিল সোমবার; বললেন, বৃহস্পতিবারের মধ্যেই জানা যাবে আমরা দুজনেই সম্পূর্ণ সুস্থ কি না—অর্থাৎ পিতামাতা হওয়ার উপযুক্ত কিনা! বৃহস্পতিবার টেলিফোন করতেই ডাক্তারবাবু বললেন, জেনীকে আর একবার ওঁর চেম্বারে যেতে হবে। ওর রক্ত পরীক্ষাটা আবার করা দরকার। ওঁর নার্স বুঝি কি গড়বড় করে ফেলেছে আগেকার স্লাইডটা নিয়ে। এ নিয়ে আমাদের দুজনের মধ্যে কোন আলোচনা হয়নি, নার্স তো গড়বড় করতেই পারে; তবু দুজনেরই মনে হল—গুণগোল যদি আদৌ কিছু থাকে তবে তা জেনীর, আমার নয়।

পরদিন ডক্টর শেফার্ড আমাকে অফিসে টেলিফোন করলেন; বললেন, অফিস ছুটির পর যেন ওঁর সঙ্গে একবার দেখা করি। তখনই নিঃসন্দেহ হলাম। তাহলে শারীরিক ক্রটিটা জেনীরই। কিন্তু সেটা কতদূর? চিকিৎসার অতীত? টেলিফোনে বললাম, জেনীকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যাব? ডাক্তারবাবুর প্রতিবাদটায় কেমন যেন ঝটকা লাগল, না, না তুমি এনাই এস।

অফিস কেবলত ওঁর চেম্বারে গিয়ে দেখা করলাম। বললাম, তাহলে দোষটা জেনীরই এ-কথা বলবেন বলে ডেকেছেন তো?

—না, না, ‘দোষ’ কথাটা আপত্তিকর।

—ঠিক আছে, না হয় ‘শারীরিক অপূর্ণতা’—

ডাক্তারবাবু জবাব দিলেন ন! কেমন যেন বিমর্ষ দেখাচ্ছিল তাঁকে। বললাম, বুঝেছি। অসুস্থতাটা চিকিৎসার অতীত। ঠিক আছে। আমরা না হয় অক’নেজ থেকে হোদলকে নিয়ে আসব। এতে এত ভেঙে পড়ার কী আছে? যেন আমিই ডাক্তার, আর ডক্টর শেফার্ড পিতৃস্ব থেকে বঞ্চিত রোগী। উনি এতক্ষণে কথা বললেন, অলিভার, সমস্তটা তার চেয়েও বড়...অনেক, অনেক বড়...মানে জেনী অসুস্থ, অত্যন্ত অসুস্থ।

—তাই তো বললেন এখনই...

—না। এখনও বলিনি...জেনী, জেনী মারা যাচ্ছে!

—‘মারা যাচ্ছে’। তার মানে?

—বলতে আমার খুবই কষ্ট হচ্ছে অলিভার . কিন্তু বলতে আমাকে হবেই ।
ব্লাড ক্যান্সার ! লিউকেমিয়া —

আমি ঠুকে মাঝপথে থামিয়ে দিলাম । এ হতে পারে না । অসম্ভব । কী
দুর্দান্ত স্বাস্থ্য জেনীর । নিশ্চয়ই কোথাও কিছু ভুল হয়েছে । ডাক্তারবাবু কোনও
প্রতিবাদ করলেন না । বললেন না যে, তিনি তিন-তিনবার পরীক্ষা করে স্থির-
সিদ্ধান্ত হয়েছেন । অনেকক্ষণ নিশ্চুপ বসে থাকলাম । ধীরে ধীরে বুঝলাম, এ
অনিবার্য পরিণামকে স্বীকার করে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই । প্রশ্ন করলাম,
জেনাকে কী বলেছেন ?

—বলেছি যে, তোমরা দুজনেই সম্পূর্ণ সুস্থ । যে কোন দিন ও ‘মা’ হতে
পারে ।

—তাহলে আসল কথাটা তাকে কখন বলা হবে ?

—সেটা তোমার উপর নির্ভর করছে অলিভার ।

ডাক্তারবাবু বুঝিয়ে দিলেন—এ আতের লিউকেমিয়ার কোনও চিকিৎসা
নেই । অনিবার্যর জন্য প্রতীক্ষা করা ছাড়া । আমি হঠাৎ সংযম হারিয়ে বলে
বসলাম, ডক্টর ! জেনীর বয়স মাত্র চব্বিশ !

যেন ডাক্তারবাবুর সে কথা জানতে বাকি । উনি একটা হাত আমার কাঁধে
রেখে বললেন, যতদিন সম্ভব, যতখানি তোমার পক্ষে সম্ভব ওর সঙ্গে স্বাভাবিক-
ভাবে ব্যবহার কর । যেন, কিছুই হয়নি ।

যেন কিছুই হয়নি !

ঐবনে এই প্রথম ঈশ্বরের কথা মনে পড়ল ।

পরীক্ষার সময়, বল নিয়ে গোলের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে, মাঝে মাঝে
তার কথা আগেরও ভেবেছি । এবার অল্প রকম । আমার যা স্বভাব তাতে এ-
ক্ষেত্রে ঈশ্বরের মোকাবিলা করতে অগ্রভাবে আমার চিন্তা করার কথা । আশ্চর্য !
আমারও স্বভাবের বোধহয় পরিবর্তন হয়ে গেছে । চোয়ালে একটা বিরাসী-
সিকা আগ্রকট মারবার ইচ্ছা নিয়ে ঈশ্বরকে আহ্বান করিনি । গালমন্দ করতেও
নয় । সকালে খুম ভেঙে যখন দেখতুম—জেনী ব্রেকফাস্ট বানাচ্ছে তখন আমি
ঈশ্বরকে বলতাম, তোমাকে ধন্যবাদ—আমার আজকের দিনটা তুমি সার্থক হতে
দিবেছ ।

না, জেনার নিত্যকর্মপদ্ধতির কোনরকম পরিবর্তন হতে দিইনি । গান্ধাবাস
সে হ করছিলাম । আমার আচরণে সে যেন না সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে । আমাকে যে
স্বাভাবিক থাকতে হবে । যেন কিছুই হয়নি !

—আজ তো তোমার খেলা আছে—অফিস থেকেই ক্লাবে যাবে? ক্রাম্বল্‌ড এগ্‌ বানাতে বানাতে জেনী প্রসন্ন করে।

আমি কাগজে মুখটা আড়াল করে বলি, না। আজ খেলতে যাচ্ছি না।

জেনী ঘুরে দাঁড়ায়। বলে, কেন বলতো? হঠাৎ এত ঘরকুনো হয়ে উঠলে কেন?

—দূর! খেলতে ভাল লাগে না।

জেনী এগিয়ে এসে খবরের কাগজটা কেড়ে নেয়। আমার মুখোমুখি বসে বলে, শোন অল, খোলা কথা বলে দিচ্ছি। তু-দশ বছরেই তোমার পেটে চর্বি জমলে। আমি তোমার ভুঁড়ি ফাঁসিয়ে দেব। না। খেলাটা ছাড়তে পারবে না, কিছুতেই। ভুলে যেও না, তুমি মিস্টার হৌদল কুংকুং ব্যারেট নও। সে তোমার ছেলে।

আমার বোধে, 'খ'নে উচ্চকণ্ঠে হেসে ওঠার কথা, নয়? আমি শুধু বললাম, না, ভাবছিলাম আজ দুজনে খিয়েটার দেখতে যাব। যাবে?

ও মুখ টিপে হেসে বলল, তার মানে বোক? নগদ তিনটি ডলার!

এ ক্ষেত্রেও আমার প্রতিবাদ করার কথা। দেড় ডলারের টিকিট কাটব কেন আমি? আমার কি এখন টাকার অভাব? অভাব তো সময়ের, দাম্পত্য-জীবনের অবশিষ্ট কটা মুহূর্ত। কিন্তু, জবাব দিতে আমার দেরি হয়ে গেল। জেনীই হাসতে হাসতে পাদপূরণ করে: তোমার দেড় ডলার, আমার দেড় ডলার!

অলিভার ব্যারেট IV ক্লাবে যাব না, মাঠে যাব না, অফিস ছুটি হবার আগেই বেরিয়ে পড়ে, আর গুটিগুটি বাড়ি ফিরে যাব। তোমরা এর কারণটা আন্দাজ করতে পার? তোমরা পার—কারণ খবরটা তোমাদের জানা। জেনী পারে না। পারবে কেমন করে? আসলে যে কিছুই পরিবর্তন হয়নি, আমি যে স্বাভাবিক। ব্যাক থেকে একলপ্তে হঠাৎ অনেক টাকা ভুলে ফেললাম। ছথানা টিকিট কিনতে, নিউইয়র্ক টু পারী। তিন সপ্তাহের ছুটি নিয়েছি। টিকিট দুটো পকেটে নিয়ে ফিরে এসাম বাড়িতে। আজ জেনীকে অবাক করে দেব। যুশিয়াল হয়ে উঠবে সে। আমরা দুজনে যুরোপ দেখিনি আজও। বেল দিতেই দরজা খুলে দিল জেনী। দরজার ক্রেমে বাঁধানো ঘেন জেনীর পূর্ণাবয়ব পোর্ট্রেট!

—একটা দারুণ খবর আছে। সেটা কী, আন্দাজ করতে পারেন মিসেস ব্যারেট?

—পারি। তোমার 'চাকরি মট' হয়ে গেছে।

—মাজে না মশাই। এই দেখুন। —পকেট থেকে ট্রাভেল এজেন্ডা। ১৮

ছোটো বার করে ওকে দেখাই। বলি, কাল রাতের পেনে আমরা দুজনে য়ুরোপ ট্যুরে যাচ্ছি। বন্-ভয়েজ মিলেন্স ব্যারেট।

প্রত্যাশিত প্রতিক্রিয়া হল না। জেনী শুধু বললে : বাঁড়ের গোবর !

এমন তো হবার কথা নয়। পারী হচ্ছে জেনীর স্বপ্নের স্বর্গ।

একটু ধতমত খেয়ে বলি, ঐ বাঁড়ের গোবরটা বিশ্লেষণ করলে কি দাঁড়ায় ?

—বাঁড়ের গোবর বিশ্লেষণ করলে বোকা যায়—আমরা য়ুরোপ যাচ্ছি না।

—হেতু ?

—আমি পারী চাই না, আমি বেড়াতে যেতে চাই না, আমি... আমি শুধু তোমাকে চাই, বলি।

—আমি তো তোমারই আছি সোনামণি ! কী অদেয় আছে বল ?

হঠাৎ দু-হাত দিয়ে ও আমাকে জড়িয়ে ধরে বললে, টাইম ! সময় ! যা তুমি ইচ্ছে করলেও দিতে পারবে না।

আমার বুকে ওর বুকের স্পন্দন। এ আলিঙ্গন প্রেমের নয়,—প্রাণধারণের তাগিদে অন্তঃস্পর্শী খাদের মুখে মাহুষ যেভাবে গাছের গুঁড়ি আঁকড়ে ধরে সেইভাবে জেনী জড়িয়ে ধরেছে আমাকে। ওর মুখটা দেখা যাচ্ছে না। আমার বুকে মুখ লুকিয়ে ও অক্ষুটে বললে, শরীরটা খারাপ লাগছিল। ট্যাক্সি নিয়ে ডক্টর শেফার্ডের চেম্বারে গিয়েছিলাম। উনি সব কথা আমাকে বলে দিয়েছেন, বল।

দুজনে দুজনকে আঁকড়ে আমরা নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছি। কেউই কাঁদছি না ! কিন্তু হে ঈশ্বর, কালার যদি কোন একজন ভেঙে পড়ে, তবে তুমি দেখ, যেন দুজনেই একসঙ্গে ভেঙে পড়ে। একজন কাঁদছে, অপরজন কাঁদতে পারছে না, সে বড় বেমানান। আমি জীবনে কখনও কাঁদিনি। কাঁদতে শিখিনি আমি। কেমন করে কাঁদব ?

একটা বিড়ম্বনা থেকে অন্তত অব্যাহতি পেয়েছি—ঐ অভিনয় করা থেকে : যেন কিছুই হয়নি ! স্বাভাবিক হবার জন্য আর চেষ্টা করতে হচ্ছে না এখন—দুজনেই স্বাভাবিক। নবদম্পতীর আনন্দঘন জীবনের পরিসরে প্রত্যাবর্তন করেছি আমরা, যদিও জানি—আমাদের প্রতিটি মিনিট সীমিত। এখন খোলাখুলি প্রসঙ্গটা আলোচনা করা যাচ্ছে। ও একদিন বললে,

—তোমার উপর আমি কিন্তু অনেকটা ভরসা করছি, বলি ! তোমাকে শক হতে হবে। মাঠে তোমাকে যে-ভাবে খেলতে দেখেছি—

—আমি শক্তই আছি জেন্, শক্তই থাকব।

—না, আমি বাবার জন্ত ভাবছিলাম। ঐকে সাধনা দেওয়ার দায়িত্বটা তো তোমাতেই বর্তাবে! অনেক বয়স হয়েছে তো! তোমার আর কী? সাতাশ বছরের প্রমিসিং ল-ইয়ার। বিপত্নীক! সে তো বাঁধনছাড়া, বেশরোয়া, খুশিয়াল—

—আমি খুশিয়াল বিপত্নীক হব না জেন্!

—‘খুশিয়াল’ তোমাকে হতে হবে! আমার ইকুম! বুঝলে?

—বুঝলাম।

—‘খুশিয়াল’ হবে তো?

—হব!

আরও মাসখানেক পরে। নৈশাহার শেষ করে জেন অর্গানে বসে ‘চোপিন’; বাজাচ্ছিল। হঠাৎ অসুস্থ হয়ে ওর বাজনা থেমে গেল। ঘূর্ণ্যমান টুলটার অর্ধ-চন্দ্রাকার পাক দিয়ে আমার মুখোমুখি বসল। বললে, ভাবছি একটু বেকব। ট্যাক্সির ভাড়া মেটাবার মত টাকা আছে তোমার ব্যাগে?

—আলবৎ। কোথায় যাবে ভাবছ? —আমি উৎসাহে উঠে বসি।

—খর যদি হাসপাতালে যাওয়া যায়?

তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারলাম। এই মুহূর্তটার জন্যই আজ দু-তিন মাস কন্টকিত আতকে প্রতীক্ষা করছি। ও বুঝতে পেরেছে। ওর শরীরের ভিতরে কিছু একটা ঠিকিত সে পেরেছে। ও নড়াচড়া করছে না। পিয়ানোর টেবিলটা দৃঢ়মুষ্টিতে ধরে বসে আছে। আমি অত্যন্ত দ্রুতগতিতে একটা ব্যাগে ওর জামা-তোয়ালে-টুথব্রাশ চিকনি ভরে নিলাম। ও আমাকে কোন সাহায্য করল না—বোধহয় সে ক্ষমতাও ছিল না ওর। শেষে বলি, কোন বিশেষ কিছু তুমি সঙ্গে নিয়ে যেতে চাও?

—এঁটা?...ও ইয়া! তোমাকে!

হুজনে নেমে এলাম নিচে। এ সময়টা থিয়েটার ভাঙার সময়। সেই যেসব, নবদম্পতী তিন ডলার খরচ করে থিয়েটার দেখতে যায়, তাদের মরশুম। আমাদের দাবোয়ানটা ট্যাক্সি ধরবার জন্ত ছুটাছুটি করছে। আধো-অন্ধকারে জেনো তার দেহভার আমার দেহে ন্যস্ত করে কোনক্রমে দাঁড়িয়ে আছে। ভাবছিলাম, হে ঈশ্বর, ট্যাক্সি যেন না পাওয়া যায়! অনিবার্য পরিণামটা তো অপরিবর্তনীয়। জেনেকে আমার কাছ থেকে তুমি কেড়ে নেবে। মোদা

কথাটা তো এই ? তাহলে হাসপাতালের গ্রহসন কেন নাও না। কেনই।
আমার বাহুবদ্ধেই ওকে মুক্তি দাও না কেন ? সবাই তো বলে—তুমি করণাময় !

অবশেষে ট্যাক্সি পাওয়া গেল। ড্রাইভারটা লোক ভালো। বেশ হাসিখুশি।
আমাদের একনজর দেখে নিয়ে বললে, বাছারা, ভয় পেও না। তোমরা অতিজ
লোকের হাতে পড়েছ। আমার গাড়িতে যারাই হাসপাতালে গেছে, ‘লালজুতুয়া’
পর্যায় সোনার গোপাল কোলে নিয়ে তারা বাড়ি ফিরেছে।

পিছনের সীটে জেনী আমাকে ততক্ষণে নির্বিড় করে জড়িয়ে ধরেছে।

—এই বুঝি প্রথমবার ?—জানতে চাইল ড্রাইভার স্টিয়ারিং ঘোরাতে
ঘোরাতে আমি মনে মনে বললুম, না, এই শেষ বার ! একান্তে বলি, হ্যাঁ,
একটু জোরে চালাতে পার তাই ?

লোকটা সত্যি ভাল। নিমেষমধ্যে হাসপাতালের এমার্জেন্সি ওয়ার্ডে পৌঁছে
দিল। নিজেহ দরজার হাতল ধরে টেনে জেনীকে নামতে সাহায্য করল। বললে,
কিছু ভেব না মা। সোনার চাদকে কোলে পেলেই সব দুঃখ-কষ্ট খুঁচে যাবে।
অদ্ভুত মেয়ে ঐ জেনিয়ার ক্যাভিলেরি—হৌদস কুংকুতের মা—ঐ শরীর-মনের
যন্ত্রণা অস্বীকার করে সে মিষ্টি হাসবার চেষ্টা করল

বললে, ধ্যান্ধু।

জেনীকে ওরা ভিতরে নিয়ে গেল। একটা টুল দেখে আমি বসে পড়ি।

অল্পবয়সী একজন ডাক্তার আমাকে একখানা রেজিস্টারে কী-সব লিখতে
বললেন। লিখে দিলাম। কী—তা মনে নেই। প্রশ্ন করলেন, কোনও মেডিকেল
ইন্সুরেন্স আছে কিনা। জবাবে জানলাম, না নেই। সব খরচই আমার এবং
ঐ সঙ্গে বললাম—আর একটা কথা। আমি চাই বেস্ট কেবিন। স্পেশাল নার্স।
ওর যেন কোন রকম অসুবিধা না হয়। খরচের কথা ভাববেন না।

ছেলেটি বললে, এমন কঙ্গী কিন্তু মাসের পর মাস টিকেও থাকে।

আমি ওর নাকে ঘুঁষি মারিনি। শুধু বলেছিলাম : বছরের পর বছর
হলেও !

মানহাটান সিটি পার্ক স্ট্রিটের পূর্ব প্রান্ত থেকে বোস্টনের মাস টার্নপাইক
পর্যন্ত আজ পর্যন্ত কোনও গাড়ি—তা সে আমেরিকান যেকই হ’ক অথবা বিদেশী
ব্রসিং কারই হোক—কোনদিন তিন ঘণ্টা বিশ মিনিটে গাড়ি দিতে পারেনি।
বন্দাস করুন, জেনীকে হাসপাতালে পৌঁছে দিয়ে, গ্যারেজ থেকে গাড়ি বার করে
ঐ সময়েই মাঝেই আমি সেখানে এসে পৌঁছলাম সকাল আটটায়। অলিভার

ব্যাংক III যে সকাল সাতটার মধ্যে অফিসে হাজিরা দিয়ে থাকেন এটা অজানা নয়। ঠিক চেয়ারের সামনে ভিজিটার্স লাইনে সাত-আটজন বিশিষ্ট বিজনেস-ম্যাগনেট অপেক্ষা করছেন। ঠিক সেক্রেটারী--সে আমাকে ছোটবেলা থেকেই চেনে--আমাকে দেখেই খতমত হয়ে গেল। তৎক্ষণাৎ ইন্টারকমে আমার নামটা জানালো। প্রতীক্ষমান দর্শনার্থীরা সবিস্ময়ে দেখল, অলিভার ব্যাংক III ভিতর থেকে কোন সাড়া দিলেন না। পরমুহুর্তেই তাঁর ঘরের দরজার পাঞ্জাট খুলে গেল; দেখা গেল উনি উঠে এসেছেন দ্বার-প্রান্তে, অলিভার ?

আমি এতটা অভিভূত ছিলাম যে, আমার নড়র হল না--বুঝ বুঝতর হয়েছেন; এ তিন বছরে ঠিক চুল আরও পাতলা, আরও সাদা হয়ে গেছে।

—ভিতরে আস।

‘তুমি’ নয়, তুমি।

ঠিক পিছন পিছন ঘরে ঢুকে ঠিক ভিজিটার্স চেয়ারে এসে বসলাম।

কতক্ষণ ছুটনে মুখে মুখ বসে ছিলাম? জানি না। আমি অন্তত ঠিক চোখের দিকে তাকাতে পারিনি। ফাইল, টেলিফোন, ইন্টারকম, পেন্সিল স্ট্যাণ্ড—ও পাশে একটা স্টো স্ট্যাণ্ড। মায়ের ছবি, আর... হ্যাঁ, আমার।

—কেমন আছিস!

—ভালো।

--আর জেনিফার ?

পারলাম না। নির্জলা মিথোটা আটকে গেল গলায়। বলতে পারলাম না, সে যত্নাশয়ায়। এখনও বেঁচে আছে কি না জানি না। অথচ--কী আশ্চর্য--ঠিক কথা বলব বলেই তো এসেছি। পাগলের মত এতটা ড্রাইভ করে!

—কিরে জেনি কেমন আছে?

-- বাবা (হ্যাঁ, পিতৃ-সম্বোধনই করেছিলাম-- গরজ বড় বালাই) আমি তোমার কাছে হাজার পাঁচেক ডলার ধার করতে এসেছি।

—ও।

—দেবে ?

—কারণটা জানতে পারি ?

—না। আমি বলতে পারব না। দয়া করে টাকাটা দেবে ?

ঐ ধনকুবেরের কোটি-কোটি ডলারের মধ্যে থেকে একমাত্র পুত্রকে পাঁচ হাজার ডলার ধার দিতে লোকটার নিশ্চয়ই আপত্তি ছিল না--সে পরিবর্তে চাইছিল...

চাইছিল, অন্তত আমার সঙ্গে দু-একটা কথা বলতে। তাই বললে, তোমাকে জোনুয়া অ্যাণ্ড মার্স তো ভালই মাহিনা দেয়, দেয় না ?

আমি জবাবে শুধু বললাম, দেয়।

কত দেয় তা বলিনি। অপ্রয়োজন বলে। আমি কোথায় চাকরি করি তা আমি ওকে জানাইনি। সে খবরটা যদি ও সংগ্রহ করে থাকে তবে একথাও নিশ্চয় জানে যে, আমাদের বছরের ছাড়দের ভিতরে আমার রোজগারই সবার চেয়ে বেশি।

—আর তোমার বউও তো স্কুলের হিদিমণি ?

কথাটা আমার ভাল লাগল না। বলি, ‘তোমার বউ’ শব্দটা ভাল লাগছে না।

ও প্রাতিগ্রন্থ করল না, তবে কী বলব ? ‘আমার পুত্রবধূ’ ?

বরং বললে, তোমার বিপদটা কিসের ? ত্রীলোকঘটিত ক্যানাদ ?

আমি ওর চোখে চোখ রেখে বললাম, ঠিক তাই ! টাকাটা কেবে ?

আভিজাত্যের শিকাই অন্তরকম। অলিভার ব্যারেট III ধীরে-স্থিরে টানা ড্রয়ারটা খুললেন। চেক বইটা বার করে লিখলেন—নিঃশব্দে বাড়িরে ধরলেন চেকটা। হয়তো হাত বাড়িয়ে চেকটা নিতে খণ্ড-মুহূর্তের বিলম্ব হয়ে গেল ! উনি ভুল বুঝলেন। হয়তো ভাবলেন, হাতে-হাতে চেকটা নিতে আমার সঙ্কোচ হচ্ছে—আভিজাত্যের অভিমানে বাধছে—আমিও তো অলিভার ব্যারেট IV। উনি চেকটা টেবিলে রেখে একটা কাগজ-চাপা দিয়ে চাপা দিলেন। আমি সেটা নিয়ে পকেটে রাখলাম। এ রকম নিশ্চুপ সুখোমুখি বলে থাকার কোন মানে হয় না। বাইরের লাউঞ্জে একাধিক দর্শনার্থী ধনকুবের লাক্সাডের প্রতীকার আছেন—এ আমার স্বচক্ষে দেখা। তাই উঠে দাঁড়াই। দরজা পর্যন্ত গিয়ে লাহসে বুক বেঁধে ফিরে দাঁড়াই। দেখি, বৃদ্ধ নিনিমেষ নয়নে তাকিয়ে আছেন অপস্ফরমান অলিভার ব্যারেট IV-এর গমনপথের দিকে। আধখোলা দরজার ও-প্রান্ত থেকে শুধু বললুম, থ্যাঙ্ক্‌স্‌ কাদার !

ফিল ক্যাভিলেরী—জেনীর বৃদ্ধ বাপকে দুঃসংবাদটা জানানো বাকি। সেটা আমাকেই বলতে হবে। আর কে বলবে ? ভেবেছিলাম বৃদ্ধ একেবারে ভেঙে পড়বে। তা কিন্তু পড়ল না। যেন বিশ্বাসই করল না ব্যাপারটা ! দরজার তাল দিয়ে এসে উঠল আমার লেই নিঃশব্দ ফ্ল্যাট-বাড়িতে। অনিবার্য দুর্দৈবের সঙ্গে লড়াই করতে আমরা দু’জাতের হাতিয়ার বেছে নিয়েছি। আমি সংসারটা

অগোছালো করে চলি—কার জন্ত এসব গুছিয়ে রাখব? আর ফিল উঠে-পড়ে লাগল ঘর দোর লাফা করতে, গোছাতে—যেন ওর মেয়ে ছদ্ম পবে এ বাড়িতে এসে না বলে: ইন্ তোমরা কী নোংরা করে রেখেছিলে সব।

ফিল দিবারাত্র ডিন্-গুলো খোর, ঝোচে, পালিশ করে আপন মনে। ককক। যে যেভাবে পারে মনের সঙ্গে বোঝাপড়া করে নিক।

একদিন পাশের ঘর থেকে শুনে পেলাম বুড়ো আপন মনেই বলছে, আর যে পারি না।

আমি সাড়া দিইনি। কী-ই বা বলতে পারতাম আমি? ঈশ্বরকেও ডেকে বলিনি, ওহে সর্বশক্তিমান, শুনে পাচ্ছেন? আমি পারছি। আমি লজ্জা করতে পারছি! শেষ পর্যন্ত লজ্জা করেও যাব! কারণ জেনী হচ্ছে জেনী!

সেদিন সন্ধ্যায় ফিল-বুড়োকে নিয়ে হাসপাতালে যখন দেখা করতে গেছি তখন জেনী বললে, এই, একটু বাইরে যাও তো!

ফিল-বুড়োর সঙ্গে ওর কী-এমন গোপন পরামর্শ থাকতে পারে? আমাকে ইতস্তত করতে দেখে ফের বলে, আমরা বাপ-বেটিতে দুটো গোপন-কথাও বলতে পারব না? দাঁড়িয়ে আছ কেন সন্ডের মত?

ঠিক আছে!—আমি চলতে শুরু করতেই ফের বলে, তাবলে দূরে চলে যেও না যেন। এখনই ডাকব তোমাকে। জরুরী কথা আছে।

একটু পরেই ফিল-বুড়ো বেরিয়ে এল। বললে, ও তোমাকে ভিতরে যেতে বলল। আমি এক প্যাকেট সিগ্রেট কিনতে যাচ্ছি।

আমি দুকতেই বলে, দোরটা বন্ধ করে দিয়ে কাছে এস দিকিন!

আমি ওর খাটের কাছে এগিয়ে এলাম। লক্ষ্য করে দেখলাম, ওর মুখটা বিছানার চাদরটার মত সাদা। ওর ডান হাতে সূঁচ বিঁধানো একটা নল আছে, রক্ত দেওয়া হচ্ছে তাতে করে। আমার দিকে ফিরে বললে, বিশ্বাস কর অলি, আমার এখন কোনও যন্ত্রণা নেই। ইয়ে হবার সময়ও বোধহয় কষ্ট পাব না, নয়

আমার তলপেটে কেমন যেন মোচড় দিয়ে উঠল। মনে হল, পেট থেকে কী-একটা গলা দিয়ে উঠে আসছে! কারা নাকি? না, না, আমি কাঁদব না তো! আমি জীবনে কখনও কাঁদিনি—ছেলেবেলার কথা মনে নেই—জান হবার পর কখনও কাঁদিনি।

—কী মনে হচ্ছে জান? ঠিক মনে হচ্ছে খুব, খুব—ব উচু একটা পাহাড় থেকে আমি স্নো-মোশান পিকচারের ভঙ্গিতে নিচে পড়ে যাচ্ছি! তোমার কখনও এমন মনে হয়েছে?

আমি তো কাঁদব না। রাসকতা করব। তাই বললুম, হয়েছিল।
যখন প্রথম তোমার প্রেমে পড়ি।

ও বোধহয় খুশি হল আমার জবাবে। বললে, 'আচ্ছা' কোথায় আছে বলত—
“Oh, what falling off was there?”

—মনে নেই, বোধহয় শেক্সপীয়র!

ঠ্যা, শেক্সপীয়র তো এটেই; কিন্তু কোন নাটকে?

আমি জানি না। ফোন করার কি ও প্রত্যাশা করছিল? এবার হঠাৎ
সে আপন মনেই বললে, 'পিয়ানো কন্সার্টোতে সি-মাইনরের নম্বরটা কত?'

এ প্রশ্নের উত্তর আমার জ্ঞানরাজ্যের বাইরে। তবু কথার কথা বলতে হবে,
তাই বলি, কাল দেখে এসে বলব।

—কিছুতেই মনে আসছে না। কী আশ্চর্য! এমন সহজ জিনিসটা...

আর সহজ হল না আমার। বলি, জেনী। এখন কি গান বাজনার আলোচনা
না করলেই নয়। অন্য কোন প্রসঙ্গ...

আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললে, অন্য কোন প্রসঙ্গ? তুমি কি এখন
'ফিউনেরাল' নিয়ে আলোচনা করতে চাও?

মরমে মরে বাই আমি। বুঝতে পারি, ওকে বাধা দিয়ে ঠিক করিনি। ৭৪
হাতে একমুঠো সময় আছে—সে যেমনভাবে ইচ্ছে খেয়ালখুশিতে তা ব্যয়
করুক।

—সে কথাই এতক্ষণ আলোচনা করছিলাম বাবার সঙ্গে। তুমি কি আমার
কথা ওনছ অলি?

—ওনছি জেনী, বল?

—আমি একে বলেছি, ক্যাথলিক পদ্ধতিতে আমার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হবে। তুমি
রাজী তো?

কী এসে যায়? আমি মাথা নিচু করে বলি, রাজী।

হঠাৎ ধমকে ওঠে: মুখ নিচু করছ কেন অলি? তুমি তো কোন অপরাধ
করনি।

অনেক কষ্টে আমি মুখ তুলে ওর চোখে-চোখে তাকালুম। জেনী বললে,
অলি, আমি এখন যদি কিছু চাই, তুমি প্রত্যাখ্যান করবে না, তাই না?

আমি নির্বাক তাকিয়ে থাকি।

—পার্বীর ৩টি টিকিটই কেঁরত দিও না। তুমি একাই ঘুরে এস। বেশভ্রমণে
তোমার মনটা হাকা হবে। কেমন? রাজী?

এবার আমার পক্ষে কথা বলা অসম্ভব ।

—তুমি বুঝতে পারছ না ? আমার কাছে এখন পারী-ইউরোপ-অর্কেস্ট্রা সবই নিরর্থক ! আমি খুব শান্তি নিয়ে সব কিছু ছেড়ে চলে যাচ্ছি ! বিশ্বাস করতে পারছ না ?

দাঁতে দাঁত চেপে বললাম. না ! পারছি না !

হঠাৎ ক্লেপে গেল ও । বললে, তাহলে চলে যাও এবার ছেড়ে । আমাকে একা একাই লড়তে দাও শেষ লড়াইটা ।

—আমি তোমার কথা বিশ্বাস করেছি, জেনী !

—এই তো লক্ষ্যী ছেলে ! তাহলে আমার আর একটা অনুরোধ রাখবে ? এইটাই শেষ—

কাগজ রাখতে গিয়ে নাকশক্তি হারিয়েছি আমি । তাই শুধু মাথা নেড়ে সায় দিই ।

—তুমি আমাকে খুন জোরে জড়িয়ে ধরবে ? ‘ও’ আসছে !

ও আসছে ! মৃত্যুর পদধ্বনি শুনে পেয়েছে জেনী ! আমি আলতো করে ওকে বুকে টেনে নিলাম । উঃ ! কী ভীষণ রোগী হয়ে গেছে জেনী ! তবু তখনও ওর বুকটা কবুতরের বকের মত ধুকধুক করছে ।

—না, অলি, ওভাবে নয় ! জোরে, আরও জোরে ! আগে যেমন ধরতে !

সত্যি তো—ঐ সব রাবারের নল খুঁচ. ঔষধ ওসব তো এই মুহূর্তে নিরর্থক । ওর শেষ ইচ্ছার পথে ওরা কেন বাধা হয় ? আমি ওকে সবলে বুকে টেনে নিলাম :

থ্যাংকস্, অলি ।

এইটাই ওর শেষ কথা !

ঐ চরম পরিণতির পরেও এরিক স্ট্রেল আর একটি নতুন পরিচ্ছেদ লিখেছেন দেখে রীতিমত বিস্মিত হয়েছিলাম মাত্র দেড়-পাতার একটি পারচ্ছেদ--তা হোক । কথাসাহিত্যের কারবারী হিসাবে আমার মনে হয়েছিল,—অকপটেই স্বীকার করব—এর পর যে-কোন কথা লিখতে বসলেই রম্যভাস ঘটবে, আতঙ্কনের দোষ বর্তাবে দেখলাম, আমার ধাক্কাটা ভুল । দেড় পৃষ্ঠার অল্পচ্ছেদটার আক্ষরিক অনুবাদ করে যাই বরং :

ফিল্ ক্যাভেলারী সামনের সোলারিয়ামে বসে তার এন্-এক্স্‌তম সিগ্রেটটি ধ্বংস করছিল । আমাকে আগিয়ে আসতে দেখে সে জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকালো । আমি অশ্রুতে ভুলে বললাম, ফিল ?

—ইয়া ?—পরমুহূর্তেই বুঝলাম, ও বুঝতে পেরেছে ।

আমি আঙুল করে হাতটা ওর কাঁধে রাখি। সে মুহূর্তে একটু সাহসনার স্পর্শের জন্ত ও বোধহয় কাঁঠাল হয়ে ছিল। আশঙ্কা ছিল ও কৈদে ফেলবে। আমি নিশ্চিত, আমি কাঁদব না। কাঁদতে পারি না। ও বারণ করে গেছে।

ফিল আমার হাতটা টেনে নিল। কিছু একটা বলতে চাইল। বলল না। তাড়া কী? এক সময় বললেই হবে। সময় তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না।

তারপর ঠাৎ মতটা বদলে কথাটা বলেই ফেলল, আমি ভুল করেছি। জেনীকে কথা না দিলেই হত যে, তোমার মুখ চেয়ে আমি কাঁদব না।

আঃ! আবার সেই কথা! আমি হাতটা ছাড়িয়ে নিলাম। আমাকে একটু ক্ষণ একা থাকতে হবে। নিরিবিলা। একটু বাতাস ফুসফুসে ভরে নিতে। কিংবা একটু পায়চারি করতে।

নিচে, হাসপাতালের লবিটা একেবারে নির্জন। লনোলিয়ামে আমার জুতোর মশমশ শব্দটাও শুনতে পাচ্ছি—

—অলিভার!

থমকে দাঁড়াই।

আমার বাবা। দূরে রিসেশ্যন-ডেস্কের ঐ মণিলাটি ছাড়া এ নির্জন করিডোরে শুধু আমরা দুজন। বোধ করি রাত্রির সেই শেষপ্রহরে নিউইয়র্ক শহরে অল্প কয়েকজনই মাত্র জেগে আছে। তার ভিতর আমরা দুজন।

আমি ওর মুখোমুখি দাঁড়াতে পারছিলাম না। আমি দ্রুতপদে রিভলভিং দরজাটা ঠেলে বাইরে বেরিয়ে যেতে চাইলাম। 'কিন্তু পরমুহূর্তেই ডান এগিয়ে এসে আমার পাশে দাঁড়ালেন।

—অলিভার! কেন তখন আমাকে বললে না?

ভাষণ শীত। একপক্ষে এটা ভালই হয়েছে; আমার সেই মুহূর্তে একটা তীব্র দৈহিক অনুভূতির প্রয়োজন ছিল। শেষরাত্রে হিমেল হাওয়াটা তাই খারাপ লাগছে না। বাবা প্রায় কানে-কানে বলার ভঙ্গিতে বললেন: যে মুহূর্তে খবরটা জানতে পারলাম তৎক্ষণাৎ গাড়িতে করে আমি ছুটে এসেছি

কে জানে, হয়তো সেই বৃদ্ধ স্পোর্টসম্যানও তিন ঘণ্টা বিশ মিনিটে এ পথ পাড়ি দিয়েছে!

—অলিভার! বল। কীভাবে তোকে সাহায্য করতে পারি আমি?

—জেনী আর নেই!—আমি কোনক্রমে বললাম।

—আ'রাম স'র!—প্রায় আত্মগতভাবে স্বগতোক্ত করলেন অলিভার
ব্যারেট III.

আমি আজও জানি না—কেন, কিসের প্রেরণায় আমি মুখস্থর মত বলে ফেললাম সেই অনবদ্য লাইনটা—যা বলেছিল সেই আশ্চর্য হুমুরো মেয়েটা যে তরে আছে—ঐ বড় কেবিনটায়।

: Love means not ever having to say you're sorry.

[ভালবাসার অভিধানে 'সরি' শব্দটার ঠাই নেই]

আর তারপর আমি এমন একটা কাজ করে ফেললাম, যা আমি জ্ঞান হবার পর কখনও করিনি—ওঁর সামনে তো নরই আর এমন করে ওঁর বুকে মুখ গুঁজে তো কখনই নয়।

আমি কাঁদছিলাম।

॥ ১৩ ॥

মাজুতিহি অজলেন্ন একান্তে, সেই এক আকাশ তারা-জলা অবাক রাজির তৃতীয় প্রহরে এই বিদেশী লেখকের কাহিনীর শেষ পরিচ্ছেদে যখন উপনীত হল কথক, তখন সে যেন সন্নিহিত ফিরে পেল। হঠাৎ নজর হল—তার একমাত্র প্রোতা নামনে বসে নেই! সে উবুড় হয়ে শুয়ে পড়েছে একবালিশওয়ালা সেই ভূশয্যায়!

কাঁদছে সেও—যদিও শব্দ হচ্ছে না কোনও—ওর আঁচল-খমা অনাবৃত পিঠটা শুধু মাঝেমাঝে ধরধর করে কৈপে উঠছে, ওর খোলা চুল লুটাচ্ছে ছু-পাশে।

রজন এতক্ষণে সন্নিহিত ফিরে পেল। না কি হারালো?

ছু হাতে সেই বহুখালিজনধুসরস্তনীর ছুই কাঁধ ধরে একটা ঝাঁকানি দিয়ে বললে, এ্যাঁই, এ্যাঁই—এ কী হচ্ছে?

বিদ্যুৎস্পৃষ্টার মতো উঠে বসল অতসী। তার খেয়াল নেই—আঁচলটা খসে পড়েছে। সবলে সে আলিঙ্গন করে ধরল ঐ ছেলেটাকে।

প্রাণধারণের তাগিদে অতলম্পর্শী খাদ্যের মুখে মানুষ যেভাবে গাছের গুঁড়ি আঁকড়ে ধরে, অথবা জেনী ধরে 'অল'কে, ঠিক সেইভাবে।

বোকা ছেলেটা বুঝতে পারল—আসলে বুঝতে পারল না। তাই সে পরম-কল্পনাময় ঈশ্বরকে ডেকে বলতে পারল না—হে ঈশ্বর! কাল্পনিক যদি কোন একজন ভেঙে পড়ে, তবে তুমি দেখ, যেন দুজনেই একসঙ্গে ভেঙে পড়ে। একজন কাঁদছে, অপূরণজন কাঁদতে পারছে না, সে বড় বেমানান!

সে তার মতো করে যেটুকু বুঝেছে তাতেই অক্ষুণ্ণে শুধু বললে, এ যে আমি
অপ্রেম ভাবতে পারিনি, অতসী !

কী যেন কথাটা বলেছিল কুনাল ?

: আমি খুশি হব—যদি ঐ চব্বিশ বছরের কবিটা একেবারে খালি হাতে
বিদায় না নেয় এ ছুঁ নয়া থেকে ?

তাই কি ? না আর কিছু ?...মনে পড়ছে না !

কবি কোথায় ? তারুণ্যের মধ্যগগনে রত ২৩ মাইলঘটার যে তখন অন্তিমুখি !
অতসী...তার আঠাশ বছরের জীবনে প্রথম . এমন একটি ক্রান্তিকারী মুহূর্তে কি
মনে পড়ে কে কখন, কোথায়, কী বলেছিল ?

মানুডিহি জঙ্গলে একটা রাতের পাখি অহেতুক ডেকে উঠল !

: উহ-উহ উহ-উহ '

॥ ১৪ ॥

সময় যদি হয় অ্যাবসিসা আর পরিবর্তন হয় অর্ডিনেট—তাহলে দেখা
যাবে, কোন মানুষের জীবনের গ্রাফ সমান-তালে উর্ধ্বমুখী সরল-রেখা নয়।
বন্দনার বিয়ের পর থেকে অতসীর জীবনের ছন্দটা ছিল ভূমির সমান্তরালে—
'চমে তালে : অলস মনে দিন চলে যায় দিনের পিছু পিছু'।

কিন্তু মানুডিহি থেকে ফিরে আসার পরে এই তিন মাসে সেই আত্মম্বিক
রেখাটা হঠাৎ উর্ধ্বমুখী হয়ে উঠল। মাত্র তিনটি মাসে ওর জীবনে এল
বৈপ্লবিক পরিবর্তন। অকস্মে সবাই বলাবলি করে—অতসীদির কী হয়েছে
বল তো ?

শুধু মানসিক নয়, পরিবর্তনটা দৈহিকও। তার কিছুটা প্রকাশ—চোখের
কোণে কালি, মুখটা শুকনো ; কিছুটা বা লোকচক্ষুর অন্তরালে একান্ত গোপনে।

যথারীতি দশটা-পাঁচটা অকস্ম করে। বাকি সময় নিজেকে খেঁচাবন্দী করে
রাখে ওর ঘরের চার-দেওয়ালের চতুঃসীমায়। সিনেমা দেখে না, বেড়াতে
যায় না, কারও সঙ্গে সৌজন্য-সাক্ষাতে আগ্রহী নয়। ঘর-দোর গোছায় না,
টেবিলে একপ্রস্থ আলগা ধুলো, আরনার কাঁচটা ঝাপসা, সিলিং বুল, আর
উনানটাও জ্বলে না। বাড়ির সামনের ঐ পাঞ্জাবি হোটেলের মালিক সর্দারজীর
সঙ্গে মাসিক বন্দোবস্ত করেছে। ঐ হোটেলের ছোকরা-চাকরটা টিফিন-ক্যাবিনারে

দাঁড়িয়ে সকাল সন্ধ্যা পৌছে দিয়ে যায় একজনের খাবার। হ্যা, একজনের, অতসীর সংসারে এখন দ্বিতীয় প্রাণী নেই। বলাই গাজুলী নিক্‌দেশ চলে গেছে।

মাজুড়িহি থেকে ফিরে এসে দরজায় তাল দ্বারা দেখে প্রথমটা বিবস্ত্র হয়েছিল। এমন অবেলায় দৌরে তাল দিয়ে বড়মামা আবার কোথায় গেল ? ডুপ্লিকেট চাবি ছিল ওর ভ্যানিটি ব্যাগে। তাল খুলে ভিতরে ঢুকে দেখে সব কিছুই বিশৃঙ্খল। জিনিসপত্র এখানে ওখানে ছড়ানো। বারান্দার উপর শুল্ল চায়ের ভাঁড়। রান্নাঘরে তিন-চারটে এঁটো শালপাতা। উচ্ছিষ্ট ছাঁড়িয়ে আছে ঘরময়। একটু ক্ষুধা হল অতসী। বড়মামার একটা হাত নেই—এঁটো খালি তার পক্ষে মেজে রাখা কষ্টকর। তাই সে হোটেলের ঐ ছোকরা-চাকরটার সঙ্গে সে ব্যবস্থাও করে গেছিল। উচ্ছিষ্ট খালা-বাটি সে প্রতিদিন ধুয়ে রেখে যাবে। সর্দারজীও সেদিন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল : আপ, বে-ফিকর রহিয়ে দিদি।

এখন দেখা যাচ্ছে সে আশ্বাস নিতান্ত ফাঁকা বুলি।

তাল খুলে নিজের ঘরে ঢুকল। বড়মামার ঘরখানা। এটার চাবি বড়মামার কাছে থাকে না। তাই যেমন রেখে গেছিল তেমনই আছে। ঘামে-ভেজা রেলের জামাকাপড় পাল্টাতে যাবে এমন সময় কল্লদ্বারে টোকা পড়ল। বড়মামা ফিরে এসেছে মনে করে কাপড় সাধলে নিয়ে এসে সদর দরজা খুলে দেয়। না, বড়মামা নয়, সর্দারজী এসেছে।

—ম্যায় খুদ চালা আয়া দিদি ! এক বাত হ্যায়। ভিতর খাঁউ ?

—হ্যা, আহ্ন।

একটা চেয়ার এগিয়ে দেয়। সর্দারজী বসে না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই নিবেদন করে তার বক্তব্য। তার বিচিত্র ভাঙা ভাঙা বাংলায়—

অতসীর অল্পপন্থিতকালে এ বাড়িতে এক জটাজুট সাধুবাবা একদিনের জন্য অতিথি হয়েছিলেন। যাবার সময় তিনি বলাইবাবুকে সঙ্গে নিয়ে গেছেন। বলাই গাজুলী যখন ঘরে তাল দিয়ে চলে যায় তখন সর্দারজীর সঙ্গে দেখা করে। বলে যায়, দিদিমনি ফিরে এলে জানাতে যে, তার মামা তীর্থদর্শনে যাচ্ছে, কবে ফিরবে ঠিক নেই।

—তো ম্যায়নে পুছা, ঘরকা কুঞ্চি ? দিদি খুসেগা কৈসে ?

তাতে নাকি বলাইবাবু আশ্বাস দিয়ে যায়—ডুপ্লিকেট চাবি দিদির কাছে আছে।

অতসী আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে জানতে চেয়েছিল, কোথায় তীর্থ করতে গেল তা বলেনি ?

—জী নেহী । লেকিন মুঝাকো এক থং দে-গয়া । ইয়ে লিজিয়ে ।

মুখবন্ধ একটি থাম এবং হিসাব অনুযায়ী অগ্রিমের বাকি পরমা প্রত্যর্পণ করে সর্দারজী বিদায় হল ।

ট্রেন জানির ক্রান্তি ডুলে অতসী তখনই খুলে ফেলল থামটা । সদর-দরজা বন্ধ করেই ।

আঁকা-বাঁকা হাতের লেখা । ডান হাতটা খোঁয়া যাবার পর বড়মামা বাঁ-হাতে লিখতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু লেখাপড়ার ধার সে বড় একটা ধারত না কোনদিনই । কলে হাতের লেখাটা সড়গড় হয়নি মোটেই । সেই শিশুর হস্তাক্ষরে বড়মাম লিখেছে—

“বড় খুকি,

“ভাবিস না সংসারে বোতরাগ হওয়ায় সম্মান নিচ্ছি । অনেক ভেবে দেখলুম—আমি আড়ালে সরে না গেলে তোর কোন একটা হিন্দে হবে না । দোষটা আমার । নিতাস্তই আমার । ছেলেবেলা থেকেই আমি পরদ্ব্যপেক্ষী । প্রথমে মা, পরে তোর বড়মামী, আর এই শেষ বয়সে—তুই । ঠুঁয়া দুজনেই মুক্তি পেয়েছেন ; কিন্তু তোর যে গোটা জীবনটাই সামনে পড়ে আছে ! বলতে পারিস্—‘ই্যা গো বড়মামা, তোমার এ সুবুদ্ধিটা আর কবছর আগে হল না কেন ?’ ই্যা, একথা বলার হক আছে তোর ! কী জানিস ?—ঐ যে বললাম একা একা পথ চলতে পারি না । সাধুবাবার একটা চেলার দরকার । আমারও চাই একটা সঙ্গী—দোকলা চলার পথে ।

“আমার খোঁজ করিস্ না । আমার ঠিকানা তুই পারি না । কিন্তু তোর খবর আমি ঠিকই পাব । তোর বড়মামীর একটা কবুল, নিজের কিছু জাম কাপড় আর পিতলের বড় ঘটিটা শুধু নিয়ে যাচ্ছি । হয়তো আবার হট করে ফিরে আসব । তোর গালমন্দ খেতে । অথবা কে জানে, হয়তো নাতি-নাত্নীর আদর খেতেও !

“রঞ্জন ছেলেটা ভাল । দু-এক বছরের ছোট বলে দ্বিধা করিস্ না । আচ্ছন্দ্য তাও তো আকছার হয় । আশীর্বাদ এইল তোর বড়মামার ।”

অতসীর ইচ্ছা করছিল তখনই ছুটে যায়—কুনাল-বন্দনার কাছে । ওদের নাকের ডগায় চিঠিখান মেলে ধরে বলতে : এ্যাই দেখ ! তোমরা যে বলতে লোকটা পাষণ্ড ! এখন কী ?”

বড়মামার অন্তর্ধানই ওর বাঁধাধরা জীবনে একটা বৈপ্লবিক ধাক্কা। দ্বিতীয় আঘাতটা মানসিক। মাজুডিহির স্মৃতি।

শুধু পরম আনন্দ নয় একটা চরম আঘাতও সে পেয়েছিল ওখানে।

প্রথমরাত্রির অবসানে ঘুম ভেঙে সে দেখেছিল পাশের জায়গাটা খালি। ওর শয্যাসঙ্গী সাতসকালে শয্যাভ্যাগ করে উঠে গেছে। মুখ ধুচ্ছে সে বাইরের বারান্দায়। অতসী তড়িঘড়ি শয্যাভ্যাগ করেনি। রসিয়ে রসিয়ে পূর্বরাত্রের অভিজ্ঞতাটা রোমন্থন করতে থাকে। এ এক অনাস্বাদিত জগৎ—যার কথা সে জেনেছে, জানে—কাব্যে-সাহিত্যে-সিনেমায়; অথচ যার কোন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল না এতদিন। শুয়ে শুয়েই ও সিদ্ধান্তে এল : এই সপ্তাহব্যাপী স্বর্গস্থ ত্যাগ করে সে টাটা-জামসেদপুরে আদৌ যাবে না। ছুটির সাতটা দিন বিকিয়ে দেবে এই খেলাঘরের চতুঃসীমায়। সত্ত্ববিবাহিতের এই নতুনপাতা পুতুল খেলার সংসারটার আকর্ষণ অদম্য : ‘তার মূল্য তার রচনায়, নয় তার বস্তুতে।’

সীমন্তে দিয়েছে খেলাঘরের সিন্দুরবিন্দু। প্রতিবেশিনী পেতে দিয়ে গেছে ওর বাসরশয্যা; রঙ্গ-রসিকতা করে বলেছে : ই্যা দিদি, তামাম রাত কি একটা মরমের হাতে মাথা দিয়ে শুতে হয়? তারা-জলা অবাক রাতে ধরা দিয়েছে মুগ্ধ-প্রেমিকের বাহুবন্ধে। সার্থক করেছে তার নারীজন্ম!

না, সে আর কোথাও যাবে না, যেতে পারবে না। মৃত্যুপথযাত্রীর শেষের কটি দিন সে সুখায় ভরে দিয়ে যাবে। শুধু দেবে নয়, নেবেও! অঞ্জলি ভরে। ওর আজন্ম-উষর জীবনের একটি মধুময় সপ্তাহ! ছুনিয়া জানতে পারবে না। সমাজ তেড়ে আসবে না। সহকর্মীরা মুখ বেঁকিয়ে হাসবে না! সপ্তাহের দিনগুলো একটি একটি করে চৈত্রমাসের ঝরাপাতার মতো খসে পড়বে, নিঃশেষে হারিয়ে যাবে। তবু তার একটা অদ্ভুত মিষ্টি সৌগন্দ্য লেগে থাকবে ভ্রাণে—যেমন আছে বড়মামীর গহনার বাস্কে সেই উপে-যাওয়া সেণ্টের শিশিটায়। এই মাজুডিহি যেন ছুনিয়ার ঝর - এ এক কল্পলোক। অরণ্যপ্রান্তের এই অবাক দিনগুলো কেঁচে থাকবে এক অনুঢ়ার মস্তিষ্কের স্মৃতি মঞ্জুষায়।

কিন্তু বাস্তবে তাও হল না। রঞ্জন ছেলেটা নিতান্ত ছেলেমানুষ। না, শুধু ছেলেমানুষ নয়, —মূর্থ! ঈডিয়ট!

পরদিন সকালে কোথায় সে খুশিয়াল হয়ে উঠবে, তা নয়, একেবারে শব্দ-বৃদ্ধি অবলম্বন করল। চোখ তুলে যেন আর তাকাতে পারছে না বাড়ির দ্বিতীয় প্রাণীটার দিকে। বেচারা অতসী! কতবার আকারে ইঙ্গিতে সে বোঝাতে চেয়েছে যে, সত্তরাত্রির ব্যাপারটাকে সে দুর্ঘটনা বলে মনে করেনি

আদৌ। যা আনবার্ধ পরিণাম তাই তো ঘটোছল! এটা সে নিজেও চেয়েছিল চাইছে।

কিন্তু আর কত নির্লজ্জভাবে বল' যার? হাজার হোক, সে তো মেয়েমানুষ! রঞ্জন—মূর্খ রঞ্জন—সারাদিন আঁকড়ে ধরে থাকল তার উর্বর মস্তিষ্কের উদ্ভট থিয়োরিটাকে : নিতান্ত কামার্ত হয়ে সে একটা চূড়ান্ত অসংযমের পরিচয় দিয়ে বসে আছে! নির্জন অর্গলবন্ধ ঘরের সুযোগে যে তার অতসীদিকে...আ—ছি ছি ছি!

সহ করতে পারেনি অতসী

পরাদান প্রতিশ্রুতিমতো সে প্রতিবেশীদের রাগা করে খাইয়েছে। যমুনা এসে হাতে হাতে লাহায়া করেছে। মমলা পিষে দিয়েছে, তরকারি কুটে দিয়েছে; আর যমুনার উপস্থিতির অজুহাতে রঞ্জন সারাটা দিন কোথায় পালিয়ে পালিয়ে বেড়ালো। রাতে আহা-বাহা-দোবেজা সজ্জা বিদায় নেবার প' রঞ্জন বিনা বাক্যব্যয়ে বাইরের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ল মাহুৎ পেতে। আপাদমস্তক চাদর মুড়ি দিয়ে।

তা সত্ত্বেও চেষ্টা করেছিল অতসী। আটপৌরে শাড়িটা গায়ে জড়িয়ে একবে এসেছিল। লজ্জার মাথা খেয়ে বনেছিল, এ কী? তুমি এমন করে এখানে জয়েছ? চল, ওঘরে চল?

রঞ্জন মাথা নিচু করে বলেছিল, না অতসীদি। কাল যা ঘটে গেছে তার ভুল কমা চাওয়ার ভাষা আমার জানা নেই। কিন্তু একই ভুল আমি দ্বিতীয়বার করব না।

‘অতসীদি। ভুল’—আচ্ছা তোমরাই বল, আঠাশ বছরের প্রায়-উত্তীর্ণযৌবনা কোন একটি মেয়ের কী প্রতিক্রিয়া হয় এতে? সে যেন সেই অন্ধদেশের রাজনটী—এসেছে স্বপ্ন মুনিকে ভুলিয়ে ভালিয়ে ফুলে নিয়ে যেতে। তবু দাঁতে দাঁত চিপে বলেছিল, তুমি এটাকে ভুল বলছ কেন রঞ্জন? এটাই তো প্রাকৃতিক নিয়ম। আমাদের ভালবাসার স্বাভাবিক পরিণতি। আমি কিছু মনে করিনি। তুমি তো ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাকে...

—সে আপনার মহানুভবতা। আপনি আমাকে ক্ষমা করেছেন এ আপনার মহত্ব, কিন্তু আমি নিজেকে ক্ষমা করতে পারছি না। আমার সাহস নেই। আপনি শুভে যান, অতসীদি!

—আমার সাহস আছে, অথচ তোমার নেই?

—না নেই! অতটা আত্মবিশ্বাস আমার নেই। আমাকে 'ক্ষমা' করুন আপনি—

আশ্চর্য ! শেষ কথা-কয়টা সে বলেছিল যুক্তকরে ।

এঘরে ফিরে এসে গতরাত্রেই আশ্চর্য অভিজ্ঞতাটার কথা ভাবতে বসে । ছেলেটা নির্বোধ ? না, তা তো নয় । তাহলে কাল রাত্রে কেন সে বলে উঠেছিল, “এ যে আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি, অতসী ।” তাহলে রাত পোহালে তার এ আচরণের অর্থ কা ? ছেলেটা দারুণ পিউরিটান ? প্রাকবিবাহ জীবনে দৈহিক ঘনিষ্ঠতা সে পাপ বলে মনে করে ? কিন্তু তার কবিতা পড়ে তো তা মনে হয়নি । কবি রঞ্জন তার কবিতার খাতাখানা দিয়েছিল ওকে পড়তে । অনেকগুলিই রোমান্টিক কবিতা । তাতে দেহতত্ত্বও আছে । পড়ে তো মনে হয়নি—কবি-প্রিয়াকে অগ্নিসাক্ষী রেখে সাতপাকে বেঁধে তারপর কলম নিয়ে বসেছে । তাহলে কা ?

তোমরা অতসীকে মার্জনা কর । সে সিদ্ধান্তে এসেছিল—দায়ী করেছিল নিজের রূপযৌবনকে ! গতকাল রাত্রে যেকোন কারণেই হোক রঞ্জনকে বুকের পাজর-গুহায় এক ঘুমন্ত সিংহ জেগে উঠেছিল ! সে আত্মসংবরণ করতে পারেনি আধো অন্ধকারে তার শয্যাসজিনীর দিকে নজরই পড়েনি সে শুধু দেখেছিল — অসংবৃত-দেহা একটি রোকণমানা নারী দেহ ! ওর বয়স যে আঠাশ, ওর মুখে যে ব্রণ-চিহ্ন এসব নজরে পড়েনি স্থপ্তোখিত পুরুষ-সিংহের । আজ এই মধ্যরাত্রে দৃষ্টিতে সেই মাদকতা নেই ।

অতসীর ‘সিদ্ধান্তে’ তোমরা কি ওকে বোকা ভাবছ ? ভুল কর না তাই । অভিমান এমন একটা আজব বস্তু যা উপেক্ষিতকে বারে বারে, যুগে যুগে এই একই ভুল করিয়েছে !

অতসী কলকাতায় ফিরে এসেছিল পরদিন সকালে । প্রায়-বিনিদ্র দ্বিতীয় রাত্রিটা একক-শয্যায় অতিবাহিত করে । যমুনার বারম্বার উপরোধ অগ্রাহ্য করে । দোবেজী কারংকর্য্য লোক । আর একটি কাঠ-বোঝাই ট্রাকে করে ওকে পৌছে দিয়েছিল বাস-এক সড়কে । সেখানে বাস ধরে স্টেশানে । রঞ্জনও সঙ্গে ছিল । অবশ্য দোবেজীর উপস্থিতিতে আর কোন কথা হয়নি । অভিমানী অতসী মুখ ফুটে বলতে পারল না—মাঝে মাঝে চিঠি দিও । কী দরকার ? ও যদি এক রাত্রেই অসম্মতকারিতার কথাটা ভুলে থাকতে চায়, তাতে অতসী বাধা দেবে কোন আনকারে ?

কিন্তু আর একটা কাজ সে করে এসেছিল । যমুনাকে নিজের ঠিকান দিয়ে ও উপরোধ : বোঝা — বুজীর তবয়্য একটু বেচাল হলেই সে খন খবর পায় । যমুনা গ্রাম্য সংস্কারে যেনও খানিকটা আন্দাজ করেছিল বলেছিল, এক বাৎ খুঁচু দাদ ? বাবুজীও সঙ্গে অচানক কাজিয়া করলে কেন ?

—কে বলেছে আমাদের মধ্যে ঝগড়া হয়েছে ?

—কে আবার বলবে ? লছমীর বাপের মতো ছুঁচো-কানাও সেটা বুঝেছে ।

অতসী প্রতিবাদ করেনি । বলেছিল, মরদের সঙ্গে লড়াই তো ঝগড়া করে ।
তুমি ক'র না ? শোন—যে কথা বলছি : বাবুজীর মাঝে মাঝে হঠাৎ জ্বর হয় ।
গ্যাও কোলে.....

—গ্যাও কী ?

—মানে কুঁচকিতে ব্যথা হয় । সে অস্থির হাওয়াই বাবুর কাছে আছে ।
কিন্তু তেমন কিছু হলেই আমি যেন খবর পাই, কেমন ?

—কিন্তু আমি যে বাংলা লিখতে পারি না দিদি ?

—তাতে অসুবিধা নেই । তুমি হিন্দিতেই লিখ । আমাদের অফিসের
হাওয়ায়ান হিন্দুস্থানী । ছাপরা জিলার । তাকে দিয়ে পড়িয়ে নেব আমি ।

যমুনা রাজী হয়েছিল ।

কিন্তু এ তিনমাসে তার কোন চিঠি আসেনি ।

কেন ? কুনাল বলেছিল—মাস তিন-চার গুণ বেলাদ । ষোল সপ্তাহ গুণ
বয়স, বড়জোর বিশ । তার তো অনেকটা পথই অতিক্রান্ত । এতদিনেও কি
দূর থেকে শোনা যাবে না সেই কালো ঘোড়সওয়ারটার অস্থিরধ্বনি । যে
অশ্বারোহী দুর্বীর গতিতে ছুটে আসছে—যে নাকি এসে পড়ল বলে ? নাকি
যমুনা চিঠি দিয়েছে, ডাক-বিভাগের গুণগোলে খোয়া গেছে চিঠিটা ? এক-
একবার মনে হয় বাণ্ডাইআটি চলে যায় । গিয়ে জেনে আসে, তাঁরা কতদিন আগে
গুণ চিঠি পেয়েছেন । পারে না । সাহসে কুলায় না । প্রথমত গুণ আজও
জানেন না সেই অজ্ঞাত-পরিচয় কালো ঘোড়সওয়ারটার কথা । কুনাল বারণ
করেছিল—গুণের জানানো হয়নি । দ্বিতীয় কথা : বৌদির সনির্বন্ধ অশ্বারোহ
উপেক্ষা করে সেই রবিবার রাতে সে টেলিকোন করে ডাঃ মিথ্যা কথাটা বলতে
পারেনি ।

অবশেষে অয়োদ্ধ শপথ—মাত্র দিন তিনেক আগে—এল যমুনাবাসীর
চিঠি । হিন্দিতে নয়, বাংলায় । লিখেছে—

‘দিদি,

‘আপনি বলে গেছিলেন বাবুজীর তবিরৎ খারাপ হলে খবর দিতে । শরীর
তাঁর খারাপ হয়নি একভিলও । দিব্যি বহাল-তবিরতে আছেন । তা সত্ত্বেও
এই চিঠি দিচ্ছি । বিশেষ কোন কারণে নয় । এমনিই অচানক লিখতে ইচ্ছে
হল বলে । পরতদিন সরাইকেলা এসেছি, আমার এক কাকার বাড়িতে । বিয়ের

নেওতা। আমার চাচাতো বোন—যার বিয়ে হচ্ছে তার পরের বোন, বাংলা জানে। তাকে দিয়েই এ চিঠি লেখাচ্ছি।

‘বাবুজীর খবরটা আগে দিই। তিনি দ্বিবিা ভাল আছেন, অরজারি হয়নি, ফুঁচকি-মুচকি ফোঁলেনি। বুধনই রান্নাবান্না পাকায়। আমি যদি ভালোমন্দ কিছু পাকাই—এঁচোড়, লোঁকা বা মোচা—ই। দিদি, বাঙালী কায়দার আমি মোচাভি পাকাতে পারি—তাহলে আপনার কতটির জন্য একবাটি পাঠিয়ে দিই। মূলীর একটা বাচ্চা হয়েছে। মূলীকে মনে আছে তো? ভিথনের গাই। বাবুজীকে সে রোজ তিনপো দুধ যোগান দেয়। এসব কথা জনতে আপনার ভালো লাগবে বলে লিখছি।

‘আপনি আবার কবে মালুডিহিতে আসবেন? একটা বুয়া খবরও আছে। দিন পনের আগে মালিক এসেছিলেন। মালিককে পছন্দে পারছেন তো? ঠাকুর মোশাই। কী নিয়ে যেন বাবুজীর সঙ্গে তাঁর ধুম লড়াই-কাঁজয়া হয়েছে। লছমীর বাপের সঙ্গেও। সে বলে, বাবুজীর কোনও গল্টি হয়নি। ঠাকুরমোশা সিরিক গা-জুরি ঝগড়া করেছেন। যেন বহাল-তবিরতে ইমানদারী কাজ করাই একটা গলৎ।

‘যাক ওসব বড়-বড় বার্তে। আমি ওসব বুঝি না। বাবুজীর কাছে মাঝে মাঝে মুখবন্ধ লেকাকা আসে। লছমীর বাপের কাছে জানতে পারি। না জানে, তা ওঁর রিস্তাদারদের, না আপনার।

‘ষট্-সে একদিন চলে আসুন। লম্বা ছুটি নিয়ে। লছমির বাপ ট্রাক-ড্রাইভার প্রতাপ সিংজীকে বলে রেখেছে। আপনি এলে আমরা সবাই মিলে টাটা-জামসেদপুর বেড়াতে যাব। আসছেন তো? প্রণাম নেবেন।

‘ইতি যমুনাবান্ধে।’

অতসীর অভ্যন্তর জীবনহন্দে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের দ্বিতীয় হেতুটা দৈহিক। এখনো সেটা লোকচক্ষুর অস্ত্রালে; কিন্তু অতসী জানে—অচিরেই তা অনিবার্য ভাবে প্রকাশ হয়ে পড়বে। আজ প্রায় দশ সপ্তাহ হল ওর আকৈশোর জীবনহন্দে একটা মাসিক চন্দ্রপতন ঘটেছে। প্রথমে একটা ছরস্তু ভয়ে ও আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। এমন একটা অঘটন ঘটল! মাত্র একরাত্রেই ভুলে? ইয়া, ‘ভুল’ বইকি! ঠিকই বলেছিল রজন। খেড়ে মেয়ে; এতবড় ভুলটা কেমন করে করল সে? মনে পড়ে গেছিল, যে অল্পীল কথাটার একদিন যে রজনীর গায়ে হাত তোলে। ঐ এককোঁটা মেয়েটার যা অহরহ খেয়াল থাকত, এ বয়সেও তার তা থাকে না কেন?

প্রত্যাশিত সিদ্ধান্তে এসেছিল সে—ভারমুক্ত হতে হবে। প্রথমেই তার মনে পড়েছিল কুনালের কথা। ওর পরিচিত দুনিয়ায় সেই আছে একমাত্র মানুষ, যাকে সব কথা খুলে বলা যায়। তাছাড়া সেই তো পরোক্ষভাবে দায়ী। ঐ পাগল কবিটার শেষের এ-কটা দিন স্থায় ভরিয়ে দেবার জাকারি সেই কুনালই প্রথম শোনাটান কি? ব্যাপারটা এখন আইনসঙ্গত। একেবারে অপরিচিত ডাক্তারের কাছে যাওয়ার চেয়ে কুনালের মাধ্যমে ব্যবস্থা হওয়া ভালো।

কিন্তু ব্যাপারটা সঙ্কটের। লজ্জার। বিশেষ কুনালের কাছে। যে কুনাল ওর সঙ্গে প্রেম করেছে, কিন্তু কোনদিন চুমু পর্যন্ত খায়নি। ইতস্তত করতে করতেই কেটে গেল আরও একটা মাস।

তারপর ওর চিন্তাধারায় অদ্ভুত একটা পরিবর্তন এল। একটা ইংরাজী উপন্যাস পড়তে পড়তে। সিঙ্গল-পেরেটেজের করণ কাহিনী। ছেলেটি দায়িত্ব এড়িয়ে পালিয়ে গেল। মেয়েটি কিন্তু ভারমুক্ত হতে স্বীকৃত হল না। কুমারী মাতা হিসাবে জীবন সংগ্রামে নেমে পড়ল।

ইউরোপ-আমেরিকায় এ তো আকছার হচ্ছে। সমাজ তা মেনে নিয়েছে। এখানে এটা চালু নয়। প্রথম দিকে অতসৌকে এচও আঘাত সহ্যেতে হবে। ও ক্রমেক্ষণ করবে না। জবাবদিহির দায় তো তার নেই। এক ছিল বড়মামা। সেও সরে গেছে অস্তরালে। কার কাছে জবাবদিহি করবে সে? প্রথম দু-তিন বছর! খুলে ভর্তি করার সময় অসুবিধা হবে কি? হতেই পারে না। তারপর কেউ জানতে চাইবে না—কে ওর সন্তানের বাবা। অনিবার্য ভাবে সবাই ধরে নেবে বাচ্চাটা বিধবার একমাত্র সন্তান।

সেই ভালো। একটা সুখস্বপ্নের চিহ্ন। রক্তের দুনিয়াটারী ফুরিয়ে যাবে তার সন্তানের জন্মের অনেক-অনেক আগে। উপায় কি? তবু অতসৌর সমস্তটা উপেক্ষিত যৌবনের একটি মাত্র মার্ধক মুহূর্তের স্বৃতিকে সে হারিয়ে যেতে দেবে না। সব আঘাত সে বুক পেতে নেবে। সমাজ, প্রতিবেশী, অফিসের সহকর্মীদের তির্যক রসিকতা আর বাঁকা হাস।

রক্তনকে সব কথা জানিয়ে দিলে মনে হয় সে আত্মষ্ঠানক বিবোধে সম্মত হবে। ওদের অজ্ঞাত সন্তান তাহলে জারজের পরিচয় নিয়ে অবতীর্ণ হবে না দুনিয়ায়। কিন্তু সে বড় বিলম্বী ব্যাপার। সব অপরাধের গোষ মাথায় নিয়ে ওদের দুজনকে নতমস্তকে গিয়ে দাঁড়তে হবে সেই বাণ্ডুইআটতে। কী দরকার ছেলেটাকে পাকের মধ্যে টেনে এনে? সে তো স্পষ্টই স্বীকার করেছে, সেরায়েব মধুর অভিজ্ঞতা ও তার দায় একটা দুর্ঘটনা—এ মোকদ্দম হটি নয়নারার বাধনছেঁড়া

ব্যভিচার ! কী দরকার তাকে জানানোর—যে, সেই সংঘমহীনতার একটা স্থায়ী কলকচিহ্নের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে ! কয়টা সপ্তাহই বা পুঁজি তার ?

অবশ্য একটা প্রচণ্ড লাভের ক্ষীণ সম্ভাবনাও আছে । ও যদি বিয়েতে রাজী হয়ে যায় ? আনুষ্ঠানিক বিবাহের পর তো আর সে অচ্ছুৎ ‘অতসীদি’ হয়ে থাকবে না । মাসুডিহির সেই খাপরাটালির ঘরখানা বসান-তুবড়ির মতো কিছু-দিন ফুলঝুরি কাটবে । যে কয়দিন তার সঞ্চিত বাকদ শেষ না হয় ।

ইতস্তত করতে করতে একদিন সে এসে হাজির হল কুনালের ল্যাবরেটোরিতে । অফিসে বডবাবুর কাছে ফার্স্ট-হাফটা ছুটি চেয়ে নিয়ে । কুনাল দগুয়ে ছিল । তখনো লোকজনের ভিড় হয় ন । স্নিপ দেওয়া মাত্র ডাক পড়ল ঘরে ।

অতসীকে দেখে একটু চমকে উঠল কুনাল, তোমার কি কোন অসুখ করেছে ?
অতসী ওর ভিজিটার্স চেয়ারে বসল । রুমালে মুখটা মুছে নিয়ে বলে, অসুখ না হলে কেউ ডাক্তারের কাছে আসে ?

—ও । তুমি বুঝি ডাক্তারের কাছে এসেছ ? আমি ভেবেছিলুম—বিশদে পড়ে তোমার কুনালদার কাছে এসেছ বুঝিবা । বস্তুত তোমাকে প্রত্যাশাই করছিলুম কি না ।

—প্রত্যাশা করছিলে ? তুমি জানতে, আজ আমি আসব ?

—আজই আসবে তা জানতুম না । তবে আজকালের মধ্যেই যে তুমি আসবে, তা জানতুম ।

—হেতুটা ?

—সেটা তে' তুমি জানই । যেজন এসেছ ।

-- আমি জানি । কিন্তু তুমি তো এটা এখনো জান না কুনাল ।

-আমিও জানি ।

রীতিমতো অবাক হয় অতসী । বলে, কী জানো ?

—তোমাকে একজন গরু-খোঁজা খুঁজছে । তুমি আমার কাছে পরামর্শ চাইতে এসেছ । ডাক্তারের কাছে নয় । তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুর কাছে । কুনালদার কাছে ।

চমকে ওঠে অতসী । গরুখোঁজা খুঁজছে ! কে ? রজন ? কিন্তু রজন তো তার ঠিকানা ভালভাবেই জানে । বাড়ির এবং অফিসের । তাহলে ? বললে, না কুনাল, তোমার হেঁয়ালিটা আমি ধরতে পারলাম না ।

—তুমি বলতে চাও যে, তুমি জান না—ঠাকুরমশাই তোমাকেই সন্দেহ করেছেন ?

—ঠাকুরমশাই ! সন্দেহ করেছেন ? কী ?

কুনাল তার ছোকরা-চাকরটাকে ভেকে চায়ের ফরমাশ করল। সে নিরাপদ দূরত্বে চলে গেলে বলল, ছুজনেই যদি তাস লুকাই তাহলে খেলা জমে না। আমি খুলেই বলি : দিন-দশেক আগে তোমাদের অভ্রান্ত গ্রহাচার্য ঐ কাঠগোনার ছানা দিয়েছিলেন। ফিরে এসে তিনি আমার গৃহে পদধূলি দিতে এসেছিলেন। বস্তুত এসেছিলেন তোমার খোঁজে। তোমার ঠিকানা তিনি জানেন, তোমার বড়মামা থাকেন সেখানেই যেতেন গুজুর গুজুর করতে। তিনি নেই, তোমার লক্ষ্মীদীন হবার লাহস সঞ্চয় করে উঠতে পারেননি।

অতসী বলে, বিখ্যাস কর কুনাল, আমি তাও ঠিক বুঝতে পারছি না। তিনি এমন মর্যাদাসিক্তাবে অস্থানে আমাকে খুজছেনই বা কেন, আর আমাকে ভয়টাই বা কী ?

—তোমাদের অভ্রান্ত গ্রহাচার্যটি সেই সাঁওতালী গ্রামে—নামটা ভুলে গেছি—গেছিলেন তত্ত্বতাল্লাশ নিতে। মানিক হিসাবে ন'মাসে ছ'মাসে তিনি ওখানে লয়েজমিনে খোঁজখবর নিতে যান। এবার গিয়ে সংগ্রহ করে এনেছেন একটি বিচিত্র এবং মূখরোচক সংবাদ। ঔর নবনিযুক্ত ম্যানেজার নাকি চাকরিতে যোগদান করতে গিয়েছিল সম্মীক ! বোক কাও ! যে ছোকরার 'গবোখারিনী' ঔর মম্মশিখা, তারই এই বেচাল। মেয়েটির বর্ণনা শুনেছেন, সনাক্ত করতে পারেননি। ছদ্ম সেখানে থেকেই নাকি মেয়েটা বেগতিক বুঝে কেটে পড়েছে।

—ওঃ এই ব্যাপার ? তা ম্যানেজারের চরিত্র নিকলুস রাখার দায়টা কি মালিকের ?

—কিছুটা। কোন একটা অজুহাত তো চাই। না হলে তাকে তাড়াকেন কেমন করে ?

—তাড়ানোর দরকারটাই বা কিসের ? রক্তনের অপরাধ ?

—হিমালয়াস্তিক ! তুমি মনোজ মিত্রের 'সাজানো বাগান' নাটকটা দেখেছ ?

—না। কেন ?

—সেটা তোমার দেখা থাকলে সহজে বোঝানো যেত। রক্তন চকোস্তির একমাত্র অপরাধ—বিচক্ষণ ডাক্তারের প্রগ্ননিস্ উপেক্ষা করে সে বহাল তব্বিতে ম্যানেজারি করে চলেছে আর মাসান্তে পাঁচশ টাকা মাহিনা খিঁচে নিচ্ছে।

—সেটাই আমার প্রথম প্রশ্ন। দিন কয়েক আগে ওখানকার একটি মেয়ে

চিঠিতে আমাকে লিখেছে, রজন ভালই আছে—তার একদিনের তরেও অরজারি হয়নি, বা...

—লে হানুয়া! তুমিও যে ঠাকুরমশায়ের মতো আমাকে অ্যাকিউজ করছ।
আমি বাবা, রুগী যদি বহাল তবিয়ে থাকে তাহলেও কি ডাক্তার দায়ী?

কুনালের এ রসিকতাটা খুব রচিসম্মত মনে হল না ওর, একটু গভীর হয়ে বলে—না, আমি বলছি...

হঠাৎ সুর বদলে কুনাল বলে, নিবে যাবার আগে প্রদীপ শেব বারের মতো দপ্ করে জলে ওঠে। শোননি?

অতমী নিশ্চুপ বসে থাকে। শুধু সিলিং ফ্যানের একটা শব্দ। এই অবকাশে চাকরটা নামিয়ে রেখে গেল চায়ের কাপ।

কুনাল অল্প স্মরে প্রশ্ন করে, এবার বল, তোমাকে এত শুকনো শুকনো লাগছে কেন? কী ডাক্তারী পরামর্শ চাইতে এসেছ আমার কাছে? শারীরিক অসুবিধাটা কী?

অতমী নয়ন নত করে, অকূটে শুধু বলে, আরাম ক্যারিফ্লি...

কুনাল পূর্বমুহূর্তে ঠোঁটে শুঁজে দিয়েছে একটি সিগ্রেট। দেশলাই জ্বলে যেটা ধরাবার উপক্রম করছিল। এ সবাহে তার হাতটা থমকে গেল। পুরো কাঠিটাই জ্বলে গেল ওর হাতে। কাঠিটাকে আগছোঁতে শুঁজে দিয়ে সিগ্রেটটা নামিয়ে রাখল। একটা নিঃশ্বাস পড়ল তার। বললে, আই সী।

মিনিটখানেক তুছনেই নীরব। তারপর কুনাল নড়েচড়ে বসে। সিগ্রেটটা ধরায়। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলে, সে ক্ষেত্রে অনেক আগে আলা উচিত ছিল তোমার। আই থিংক, এটা তৃতীয় মান, নয়?

—হ্যাঁ, খুব কি দেরী করে কেনেচি?

—না, মানে এসব ছাড়াই একেবারে প্রথম দিকে মিটিয়ে ফেলা বুদ্ধিমানের কাজ। অবশ্য খাবড়ার কিছু নেই। আমি সব বন্দোবস্ত করে দেব, অতমী। শুধু পেও না।

—প্রথম দিকে মিটিয়ে ফেলা মানে? তুমি কি অ্যাবর্শানের কথা বলছ?

—নিশ্চয়। তুমি কি সেজন্তাই আসনি?

—না তো। সূস্থ সবল সম্ভানই কামনা করছি আমি।

—রজন তোমাকে বিবাহ করতে প্রস্তুত?

—সে এসব কথা জানেই না।

—সে কি।

—ইতিমধ্যে সে কলকাতায় এসেছে কিনা জানি না। আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেনি। আর চিঠিপত্রের আদান-প্রদান নেই আমাদের।

কুনাল অনেকক্ষণ জবাব দেয় না। বুঝে উঠতে পারে না—সমস্যাটা কোন জাতের। যার সম্ভানকে গর্ভে ধারণ করছে তার সঙ্গে ওর পত্রালাপও নেই কেন? রগড়া? কেন? রঞ্জন কি অতসীর ইচ্ছাব বিরুদ্ধে...কিন্তু সে-ক্ষেত্রে অতসীর তো ভারমুক্ত হবার প্রেরণাটাই প্রথম আসবে হঠাৎ কুনালের মনে হল—তার সামনে বসে থাকা ঐ মেয়েটাকে সে চেনে না আদৌ। আবণ্ড মনে হল—সে নিজেই যদি ঐ কাণ্ডটা করে বসত, তাহলে অতসী কি পারত তাকে প্রত্যাখ্যান করতে? অনেকক্ষণ নীরবে সিগারেট টোঁক শেষে বলে, তুমি ঠিক কী চাও বল তো? কী জাতের সাহায্য চাইছ?

—আমাকে কোন নির্ভরযোগ্য গাইনকলজিস্টের জিহ্বায় সমর্পণ করে দাও।

—তুমি একা একা তাকে মানুষ করতে পারবে?

—কেন পারব না কুনাল? লোকলজ্জা? আমি ভ্রক্ষেপ করি না।

—কিন্তু তার চেয়ে কি ভাল হয় না, সেই সম্ভানকে বৈধ করে নেওয়া? সেটা হয়তো সহজেই হতে পারে। অন্তত চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কি?

—কী দরকার? সে তো এসব জানে না। হয়তো দু-চার সপ্তাহের মধ্যেই সে...

কুনাল অপেক্ষা করে। বাক্যটা কিন্তু মাঝপথেই থেমে গেল

জানলা দিয়ে কুনাল বাইরের দিকে তাকায় বাস্তার ওপারে গীর্জার ক্রুশ-চিহ্নটা নজরে পড়ল দু একটা নিঃসঙ্গ চিল উড্ডে দূর আকাশে হঠাৎ একটু সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে বলে, কিন্তু এমনও তো হতে পারে অতসী যে, ছনিয়া থেকে বিদায় নেবার আগে একটা মানুষ সাক্ষ্যনা পাবে যদি জানতে পারে এই পৃথিবীতে সে একটা স্থায়ী চিহ্ন রেখে যাচ্ছে?

অতসী শুধু না-য়ের ভজিতে মাথাটা নাড়ল।

কুনাল ইতস্তত ভাবটা ঝেড়ে ফেলে বললে, কিছু মনে কর না অতসী, সে কি তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে, আই মীন ..

অতসী ওকে মাঝপথেই থামিয়ে দিল। বলে, সবাই একদিন জানবেই; ভবিষ্যতি কাউকে কিছু জানাবার দরকার নেই। ছোটখুকিকেও নয়।

কুনাল সেই খণ্ডমূহুর্তে রঞ্জনকে দীর্ঘা না করে পারছিল না। ওর হাত ছুটো-নিজের মূঠোর তুলে নিয়ে বললে, মেডিক্যাল-এডিসনটা আমার জানা আছে

অতসী । রোগীর গোপন কথা ডাক্তারে বলে বেড়ায় না । যে প্রশ্নটার জবাব দিলে না, সেটা যদি অধিকার বহির্ভূত...

এবারও ওকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে অতসী বললে, মাটেনলি নট । অধিকার আছে বইকি তোমার । তুমিই তো আমার একমাত্র বন্ধু । আমরা দুজনেই খেচ্চায়...

কুনাল কি এবার নিশ্চিন্ত হল ? অতসীকে কেউ বলাৎকার করেনি ছেনে খুশি হল ?

॥ ১৫ ॥

দিন-আষ্টেক পরের কথা । শনিবার । আড়াইটের ছুটি । বেলা বারোটা নাগাদ বংশী এসে জানালো বড়বাবুর টেবিলে একটা বাইরের কল এসেছে । টেলিফোনে কেউ অতসীদিকে খুঁজছে । অতসীর টেলিফোন কল কন্সিনকালেও আসে না । সে এগিয়ে এসে ধরল । কুনাল কথা বলছে । জানালো, আজ সন্ধ্যায় পাঁচটার সময় বাড়িতে তৈরী হয়ে থেক । আমি আসব ! গাইনোক-লজিস্টের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা আছে । আমিই নিয়ে যাব ।

অতসী স্বীকৃত হয়ে ফোনটা নামিয়ে রাখে । বড়বাবু মনোজ ঘোষ বলেন, শরীর-পতনটা কি ভাল নেই অতসী ? কদিন থেকেই দেখছি...

—হ্যাঁ, সে জন্তই ফোন করছিলেন আমার এক আত্মীয় । আজ ডাক্তারখানায় দেখাতে যাব ।

—তাই যেও । আজকাল কতরকম অদ্ভুত অদ্ভুত ব্যারামই না হচ্ছে । প্রথম থেকেই ডাক্তার দেখানো বুদ্ধিমানের কাজ ।

ফিরে এসে বসল নিজের টোবলে ।

অফিস ছুটি হলে বাসে চাপল । কুনাল অনেক—অনেক দিন পরে আজ আসবে । বিয়ের পর এই প্রথম । কিছু মিষ্টি নিয়ে যাবে না কি ? কিন্তু কে জানে, সে হয়তো সেটা পছন্দ করবে না । ভাববে, কর্মালিটি । তাই বাড়ির কাছাকাছি বাস থেকে নেমে সে একটা মনিহারী দোকানে ঢুকল । এক কোটা কফি আর নিম্বকি বিস্কট কিনে নিল শুধু । দুধচিনি বাড়িতেই আছে । নেই কফি ।

বাড়ির কাছাকাছি এসে মনে হল, সর্দারজীর হোটেলে বেকিতে যে লোকটা

বসে আছে তার মুখটা চেনা-চেনা। বাইরে প্রথর বোজ, লোকটা বসেছে ছায়ায় ; তার উপর পাশ করে। একনজর দেখেই দৃষ্টিটা সরিয়ে নিল অতসী। তার খুলে ঘরে ঢুকবে—লোকটা হঠাৎ দেখতে পেল ওকে। প্যান্ট-শার্ট, পায়ে চপ্পল, কাঁধে একটা কোলাব্যাগ। এগিয়ে আসতেই স্তম্ভিত হয়ে গেল অতসী। ভালার ছিজে চাবিটা প্রবেশ করাতে পারছে না আর। হাতটা এতই কাঁপছে। মাত্র তিনমাসে কী বাস্তোজ্জন চেহারা হয়েছে ওর। প্রদীপ কি নিব্বার আগে...

কোনক্রমে বললে, তুমি। কতক্ষণ এসেছ ?

এক গাল হেসে রঞ্জন বললে, হাওড়া স্টেশনে এসেছি বেলা বারোটায়। এখানে তিনটেয়।

অতসী এতক্ষণে সামলেছে ; কিন্তু বুকেটা ধক্ ধক্ করছে। এতটা উত্তেজিত হবারই বা কী আছে ? বড়মামা নেই, নির্জন বাড়ি...তাই ? কিন্তু ও কি জানে না ? ও কি চেনেন। ঐ ছেলেটাকে ? কিন্তু তিনমাসে যদি তার মানসিক পারবর্তনও ঘটে থাকে ? গাল দুটি যেমন লাল হয়েছে, পুরুষ হয়েছে—হৃদয়টাও যদি তেমন কামনার রঙে সক্রিয় হয়ে থাকে ?

—বেলা বারোটায় হাওড়ায় এসেছ তো অফিসে আসনি কেন ?

রঞ্জন রান হেসে বলে, চল, ভিতরে চল, বলছি—

দুজনে ভিতরে আসে। অতসী সদরে আগড় ঘেঁষে। ওর মুখোমুখি হতে রঞ্জন বলে, কে কতটা জানেন, জানি না তো। তাই অফিসে দেখা করতে সাহস হল না।

দুজনে পারে পারে এগিয়ে আসে ঘরের দিকে। অতসী জানতে চায়, সেই যে চাকরিতে অয়েন করতে গেছিলে তারপর এই এলে ?

—হ্যাঁ।

—কিন্তু আমি যদি আজ রাত করে কিরতাম ? বা আদৌ বাড়ি না কিরতাম ?

—আমি যে জানতাম, অফিস থেকে তুমি সোজা বাড়ি ফিরবে। সন্ধ্যা পাঁচটার তোমাকে ডাকারবারু দেখতে আসবেন।

চমকে ওঠে অতসী। বলে, তুমি তাও জানতে ? কেমন করে ? আমি তো আজ সকালে ডাক্তারের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছি। তখনো তোমার ট্রেনটা ইন করেনি।

--চল, বলছি।

রঞ্জন হাওয়ার উপর তার কাঁধব্যাগটা নামিয়ে রাখে। শার্টটা খুলে ফেলে। ঘামে-ভেজা গেঞ্জিটাও। বালতিতে তোলা জল ছিল। মুখ হাত ধুয়ে নেয়।

দড়ি থেকে টেনে অতসী তার গামছাটা পেড়ে নামায়। বাথরুম থেকে সাবানটা নিয়ে আসে। ইতিমধ্যে সে তার শোবার ঘরের তালুটা খুলে ফেলেছে। ঘরে ক্যান নেই। হাতপাখাটা নিয়ে বাবান্দাতেই মাহুর পেতে বসে। রজনও এসে বসে। অতসী শুকে হাওয়া করতে করতে বলে, এবার বল ?

রজন ওর হাত থেকে তালপাখাটা কেড়ে নেয়। বলে, ডাক্তারবাবু আমার কাছে একজন লোককে চিঠি দিয়ে পাঠিয়েছিলেন। লিখেছিলেন, আজ বিকাল পাঁচটার তিনি তোমাকে নার্সিং হোমে নিয়ে যাবেন। আমাকে লিখেছিলেন পাঁচটার মধ্যে এখানে অবশ্য অবশ্য আসতে। যে ছেলেটি চিঠি নিয়ে গিয়েছিল তার হাতে ঠিক সময়ে আসতে পারবে কি না তা জানাতে লিখেছিলেন।

অতসীর কান দুটো ঝাঁঝা করছে। এই হচ্ছে কুনালের মেডিক্যাল এডুকেশন নমুনা! রোগিনীর গোপন সংবাদ সংগোপনে রাখা। কী ভেবেছে কুনাল? আজ সন্ধ্যায় সে এলে অতসী সবাসবি প্রত্যাখ্যান করবে তার সাহাব নিতে। বলবে, ধন্যবাদ। আপনাকে কিছু সাহায্য করতে হবে না।

সামনে নিয়ে বসে, তুমি জঁকে কী জানালে? সময়ে উপস্থিত হবে?

—হব না? আমিই তো কানশ্রিট! তুমি ভাবশূন্য হতে নার্সিং হোমে যাবে, আর আমি নিরাপদ ঘুরছে পালিয়ে বসে থাকব।

আশ্চর্য! , অপরিসীম আশ্চর্য। তুমি নিয়ে হাত একটা চাবাক্স হুঁতেছিলে। হঠাৎ জানতে পারলে, সে গাছ ফুল বলে ভরে উঠেছে—তুমি ক্রকপও করলে না! খবরটা শুনে বললে, তাই নাকি?

ও আবার কবি বসে বড়াই করে! একবার মনে হল—সিদ্ধান্তটা পান্টে নেয়। এমন একটা অমাহুরের সন্তানের তার সে আজীবন বইতে পারবে না।

কিন্তু! সেই অজ্ঞাত ক্রমের কী অপরাধ?

—একটা কথা বলব, অতসী?

কুক্ষিত-ক্রান্ত অন্ধ দিকে তাকিয়ে অতসী বলে, কী?

—তোমার ঐ সিদ্ধান্তটা কি কোনমতেই বদলাতো চলে না?

—কোন সিদ্ধান্ত?

—ঐ...ইয়ে...মানে, অ্যাবর্শানের?

এ আলোচনা একটুও ভাল লাগছিল না অতসীর। এ কী বিড়ম্বনায় তাকে কল্ল কুনাল? তাকিয়ে দেখে, উত্তরের অপেক্ষায় ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বসে আছে ছেলেটা। যাহোক কিছু বলতে হয়। মনে, আর ক'র করতে পারি আমি?

—না! তা তো বটেই। কিন্তু ধর, আমি যদি তোমাকে রেজিষ্ট্রি-মতে
বিয়ে করি ?

অতসী চোখ তুলে তাকায়। ওর চোখে চোখ রেখে বলে, কেন? আমার
পেটে যেটা এসেছে তাকে বাঁচাতে ?

—না, না— শুধু তাই নয়। ইয়ে হয়েছে...এই তিনমাসে আমি বুঝতে
পেরেছি...মানে, তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচব না। আমার ভীষণ কষ্ট হচ্ছে
এ কয়মাস...

হঠাৎ উদ্গত কান্নায় গলাটা বুজে যায় অতসীর। কিন্তু না, ভেঙে পড়লে
তো চলবে না। সে কেমন করে ওকে বলবে, অতসীকে পেলেও সে বাঁচবে না।
নিবে যাওয়ার আগে, অন্ধকারে চিরকালের মতো বিলীন হবার আগে, এ শুধু
প্রদীপশিখার শেষ দগদগানি। মনটা ছুঁ করে ওঠে। মুহূর্তমধ্যে সিঁদাচ্ছে
এল অতসী : তুমি যদি তাই চাও রজন, তবে তাই হবে।

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো উঠে বসল ছেলেটা। ছেলেটা নয়, সে রাত্রে সেট স্পষ্ট
সিংহটা। দুই খাবা বাড়িয়ে দিয়ে ধরল অতসীর দুই বাহমূল। সজোরে
আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করে অতসীর ঘামে-ভেজা মুখটা চুমায় চুমায় ভরে দিল।

অতসী কোনক্রমে বলে অ্যাঁই! কী হচ্ছে! চারিদিকে দু-তিন-তলা বাড়ি!

—তবে ঘরে চল ?

লুটানো আঁচলটা বুকে তুলে নেয়। আলিঙ্গনমুক্ত হয়ে সে প্রবেশ করে
তার শয়নকক্ষে। এগিয়ে গিয়ে বলে বড় মামীর ডবল-বেড খাটে। রজন ঘরের
একমাত্র দক্ষিণের জানলা ছুটো যতক্ষণ বন্ধ করতে ব্যস্ত ততক্ষণে ওর দিকে পিছন
কিরে কাঁপা-কাঁপা হাতে পিঠের দিকে বোতামগুলো খুলতে থাকে অতসী।

প্রায় আধঘণ্টা পরে।

বাগিসে আধশোয়া অতসী প্রশ্ন করে, কটা বাজল গো ?

রজন চিৎ হয়ে শুয়ে ছিল। মণিবন্ধের ঘড়িটা দেখে বলে, পাঁচটা বাজতে
এখনও সওয়া-ঘণ্টা বাকি।

—গা ধোবে তো ? ওঠ। আমিও তৈরী হয়ে নিই।

—তাড়া কি ? তুমি তো আজ আর নাসিং হোমে যাচ্ছ না।

—যাচ্ছি। কুনাল তোমাকে মিছে কথা জানিয়েছিল। কেন লিখেছিল
জানি না, কিন্তু সজ্ঞান মিথ্যাতাবণ!

—উন আজ সন্ধ্যা পাঁচটার আগবেন না ?

—আসবেন। আমরা গাইনোকলজিস্টের কাছেও যাব। তব ভারমুক্ত হতে নয়।

রঞ্জন উঠে বসে বালিসটা কোলের উপর টেনে নিয়ে বলে, মানে ?

—আমি আজ গাইনোর কাছে যাচ্ছিলাম জাস্ট চেক আপ করাতে।
কুনাল জানে, আমি সুস্থ-সবল সম্ভানই চেয়েছিলাম।

—আশ্চর্য। অথচ আমাকে কিছু জানাওনি ? আমাদের বিয়ে না হলেও ..

—হ্যাঁ। কারণ তোমার চোখে .য আমি—‘অতদীর্ঘ’। তোমার ধারণায় যে, সে রাত্রেও গুটী একটা দুর্ঘটনা ছাড়া আর কিছু নয়।

রঞ্জন অনেকক্ষণ জবাব দিল না। তাবপর উঠে গিয়ে আমার পকেট থেকে সিগারেট দেশলাই বার করে আনে। মৌজ করে একটা সিগারেট ধ'রয়ে বলে, তোমাকে দোষ দিতে পারি না। আমার তখন ধারণা হয়েছিল, তুমি কোনদিনই আমাকে বিয়ে করতে রাজি হবে না। হেসে উড়িয়ে দিয়ে বলবে এ আমার পাগলামি। আর তাতেই আমার ধারণা হয়েছিল—সে রাতে তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে...

অতদীর্ঘ গুটী চুলটা এলোমেলো করে দিয়ে বলল, এক পাগল একটা। কিন্তু তোমার দাদা-বৌদিকে...

এক মুখ ধোয়া ছেড়ে রঞ্জন বললে, ওঁরা হয়তো কিছুটা আন্দাজ কবেছেন

—সে কি ? কেমন করে ?

—তোমাদের ঐ নাম-করতে-নেই-এর কুশায় বুড়ো ভামটা মাজুড়িহি থেকে ফিরেই বাগুইআটি গেছিল—দাদা-বৌদির কান ভাঙাতে বৌদি আমাকে লিখেছে—বাপারটা কী, তা জানাতে। জানতে চেয়েছে আমার বউয়ের পরিচয়ে সত্যিই কেউ গিয়েছিল কি না। কালই তাঁদের সব কথা খুলে বলব

—কাল ? আজ রাত্রে নয় ?

একটু আডামাড ভেঙে রঞ্জন আবার আরাম কবে শোয় বলে, না. আজ রাত্রে আমি তোমার অতিথি। ভালমন্দ রান্নার জোগাড় দেখ। না হলে চল—চানা হে টেলে গিয়ে গাও। মড় আর চিলি চিকেন খেয়ে হাসব দুভনে। ভয় ছিল তোমার বউমামাকে ও সর্দারজী বলেছে, ‘তোমার বাবা খারাপল এখানে থাকেন না. ব্যাস্ আমায় তে পাঠা বাবো’

—কিন্তু ঠাকু মশাইয়ের সঙ্গে তোমার ঝগড়াটা বাধল কখনো ?

রঞ্জন, বস্তারিত জানালে ঘটনাট

ঠাকুরমশাই মাদুডিহি গেছিলেন পিরিওডিক ইন্সপেকশনে। বিনা কারণেই তিনি গায়ে পা তুলে বগড়া শুরু করে দিলেন। কিছুটা কথা-কাটাকাটির পর তিনি যখন রক্তনকে ঘাড় ধরে তাড়িয়ে দেবার হুমকি দিলেন তখন—কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ বোমার মতো কেটে পড়েছিল দোবেজী। শান্ত শিষ্ট ধর্মভীরু মাহুঘটা ক্রমে দাঁড়ালো। ঠাকুরমশাই তাতে ভেলে বেগুনে জলে উঠলেন : তোকেও তাড়াব ! যা, তুইও যা ! ঘর ছেড়ে দে আমার ! তোকেও বরখাস্ত করলাম !

রক্তন বললে, তুমি আদালত করতে পারবে না অতসী, তারপর কী কাণ্ড হল। কাঠ-চেরাই কলের সব কটা মজদুর এককাটা হয়ে ঘিরে ধরল মালিককে। বললে, দোবেজী কিবা তাদের বাবুজীর যদি চাকরি যায়, তবে তারাও কেউ ওখানে কাজ-কাম করবে না। তারা মেহনতী মাহুঘ ! অন্য কোনো কাঠ-চেরাই কলে কাজ খুঁজে নিতে দেরী হবে না ওদের। ঠাকুরমশাই তখন কেপে ব্যোম্ হয়ে গেছে। চিরকাল সে ওদের রক্ত চুষেছে, কেউ কখনো প্রতিবাদ করেনি—আজ এতবড় কথায় লোকটা হিতাহিত জ্ঞান হারালো। বললে, ঠিক হ্যাঁ, তোরাও যা ! সবকটাকেই বরখাস্ত করলাম আমি। কাল সকালের মধ্যেই লবাই আমার কারখানা ছেড়ে চলে যাবি। আমি সাঁওতাল মুনিস নিয়ে আসব ! কালই !

অতসী কুহুই-এ ভর দিয়ে আধশোয়া হয়েছে। বলে, তারপর ?

—তারপর একটা ভোজবাজ হল যেন। চেরাই কলের সর্দার ভিখু—একটা দানব—এক পা এগিয়ে এসে বললে, ঠাকুর-মোশা ! কাল সকালে সাঁওতাল ভাইয়েরা ছাইভস্মের কী চেরাই করবে ? ভুঙ্কে তারা না ডুবতেই তো আজ ভোর রাতে তোমার কাঠ-গুদামে আগুন লাগবে ! হ্যাঁ ঠাকুর মোশা, কত টাকার লগ্, লাদ দেওয়া আছে গো তোমার ? লাখো রুপেয়া ?

ঠাকুরমশাই লাক দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল। তোৎলা হয়ে গেল লোকটা। বললে, তু—তুই এতবড় কথাটা বল্গি ভিখুন ? আমি থানায় গিয়ে এখনই...

দানবটা কুঠার কাঁধে এক পা এগিয়ে এসে বললে, লেकिन থানায় যাবে কোনটা ? তোমার মুণ্ডটা না খড়টা ?

ঠাকুরমশাইয়ের রা হয়ে গেছে।

—তনিয়ে মালিক ! ইয়ে কোই নয়া বাৎ নহী হৈ ! মৈনে দশবরিস জেলমে থা ; পুচিয়ে ইনলোগৌ কো।

বুঝিয়ে দিয়েছিল—আজ ছেড়ে দিলাম ; কিন্তু বিজন বনে ভবিষ্যতে যখন

তুমি কাজ ত্বরাকিতে আসবে, তখন ওখানে তোমাকে পুঁতে ফেলবে—থানা
দূর অন্ত—কাকপক্ষীতেও চের পাবে না !

—তারপর ?

—ঠাকুরমশাই ওখানে জলস্পর্শ করেনি। ফিরে এসেছিল সেদিনই। আমি
সরাইকেল্লায় গিয়ে সরকারী দফতরে দরবার করি। রাজনৈতিক নেতাদের
সঙ্গেও। ওরা বললেন, আমাদের যা কর্মসংখ্যা তাতে আইন-মোতাবেক আমরা
প্রমিত ইউনিয়ন দাবী করতে পারি। তাই করেছি আমরা। সরাইকেল্লায় এক
বাঙালী উকিলবাবুকে লাগিয়েছে। ঐ ফোঁটাকাটা অর্থশিশাচটাকে আমি
দেখে নেব।

—ও কীভাবে প্রতিশোধ নিতে পারে ?

— নিতে পারে নয়, নিচ্ছে। ও বুঝে নিচ্ছে, আমিই পালের গোদা। তাই
ফিরে এসেই দাদা-বৌদির কাছে গিয়ে আমার নামে লাগিয়েছে। দ্বিতীয়ত
আমার মাহিনা থেকে ইন্সিওর প্রিমিয়ামের মোটা টাকাটা এবার থেকে কেটে নেবে
বলে হুমকি দিয়েছে। উকিলবাবু বলেছেন, আইনত সে তা পারে।

—ইন্সিওরেন্স প্রিমিয়াম মানে ?

—আমাকে যখন চাকরি দেয় তখন বুড়ো ভামটা বলেছিল, নিকিউরিটি
হিসাবে আমাকে একটা ইন্সিওরেন্স করতে হবে বিশ হাজার টাকার। প্রিমিয়াম
সেই দিয়ে যাবে, তবে নমিনি ঐ ঠাকুরমশাই।

বীয়ে ধীরে খাচের উপর উঠে বসে অতসী। বলে, কী বললে ? লাইফ
ইন্সিওর করেছ ? ঠাকুরমশাই নমিনি ? কবে ইন্সিওর করেছ ?

—ঐ তো বললাম, চাকরি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। এই তিনমাস হল।

—বিশ হাজার টাকা ! তোমাকে হেল্থ এক্সামিনেশান করাতে হয়নি ?

—কেন হবে না ? ঐ ডাক্তারবাবুই তো করেছিলেন।

—‘ঐ ডাক্তারবাবু’ মানে ? কুনাল ? সে তোমার পলিসিতে তিনমাস আগে
ডাক্তার হিসাবে সই দিয়েছে ?

—হ্যাঁ। এতে অবাক হবার কী আছে ?

অতসীর মুখে জবাব যোগায় না। আশ্চর্য ! কী অপরিমীম আশ্চর্য !
কুনাল ? সব জেনেওনে ঐ ‘মৃত্যুপথযাত্রীর পলিসিতে ডাক্তার হিসাবে সই
দিয়েছে। হ্যাঁ, সে ভগবান মানে না, কিন্তু মেডিক্যাল এডিসন ? দেশের আইন ?
তবু ডিগ্রী খোয়ানো নয়, জেলখাটার সম্ভাবনাও যে আছে—প্রতারণার দায়ে।

—কই বললে না তো ? এতে অবাক হবার কী আছে ?

—আমিহি বাধকম থেকে ।—বলে, ঘর ছেড়ে উঠে যায় ।

স্নানঘরে অর্গলবদ্ধ নিদ্রালায় সে ভাবতে থাকে—এখন কী তার করণীয় কতটা ওঠে বলা চলে ? কুনাল এখন কি ওর শত্রুপক্ষে ? অনেক পরে মুখে চোখে জল দিয়ে ফিরে এসে বললে, একটা কথা রজন । সেদিন তুমি এরিক সেগল-এর ‘স্ম্যভ স্টোরি’ গল্পটা আমাকে শুনিয়েছিলে । নিশ্চয় মনে আছে তোমার । গল্পে বলা হয়েছে—জেনী তার চরম দুর্ভাগ্যের কথাটা প্রথম জানতে পেরেছিল তার স্বামীর কাছ থেকে নয়, ডক্টর শেফার্ডের কাছ থেকে । তোমার কি মনে হয় ডক্টর শেফার্ড জেনীর স্বামীকে না জানিয়ে ঐ খবরটা তাকে জানিয়ে অন্তায় করেছিলেন ?

এই অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্নটা হঠাৎ কেন পেশ করল, সে কথা জানতে চাইল না রজন । বোধকরি সে নিজেও স্বমন উলটো-পালটা প্রশ্নের অবতারণা করে বলে হঠাৎ হঠাৎ অদ্ভুত কৌতূহল তার মাথায় জাগে—অতসী কলেজ জীবনে প্রেম করেছিল কি না, তার প্রাক্তন প্রেমিক এখন তাঃ সঙ্গে কীরকম ব্যবহার করে, ইত্যাদি । তাঃ অতসীর কৌতূহলের উৎস সম্বন্ধে কোন কৌতূহল হল না তার । একটু ভেবে নিয়ে বললে আমার মতে অন্তায় করেননি । দেখ অতসী, অলিভারের পক্ষে তার স্ত্রীকে কথটা বল কঠিন, কিন্তু অনিবার্য মৃত্যুপথযাত্রীকে একজন না একজন তো খবরটা জানানাবেই ? মানে জানাতে হবেই ?

—কেন ? কেনী যদি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কিছুই না জানত, তাহেই বা ক্ষতি কী ?

—বাঃ । তা হয় না সেটা অন্তায় হত । জেনীর প্রতি । মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াবা’ জন্য যে প্রস্তুতির প্রয়োজন সেটা তাকে দেওয়া উচিত । দেখ, ডক্টর শেফার্ড তাকে আগেভাগে জানিয়েছিলেন বলেই সে শান্ত সমাহিত চিত্তে অনিবার্য পরিণামকে বরণ কবে’নতে পারল । বলির পাঠার মতো বীভৎসভাবে ছাড়িকাঠ ছেড়ে পালানো চাষনি ।

নগ্নমস্তকে অতসী কী মনে ভাবল কিছুক্ষণ । তাৎপর্য বললে আচ্ছা তোমার কি মনে হয় ? আমার যাদ ঐ অন্তখটা করে, আর তুমি যদি আঃকে জানাতে, আমি জেনে মনো সেটা সহিতে পারতাম ?

—যাঃ । কী সব আডাক কুডাক ডাকছ । এসব কথাই কোন মানে হয় ?

—না, বল না ? তোমার কী মনে হয় ? আমি পারতাম ?

রজন গম্ভীরভাবে বলে আমার বিশ্বাস তুমি পারতে । যা অনিবার্য, তাকে শান্ত চিত্তে স্বীকার করে নেওয়াই তো বুদ্ধিমত্তার পরিচয় ।

—যুঁজি দিয়ে সব সময় কি 'ইমোশানকে' পরিচালনা করা যায় ?

—না, যায় না। যাওয়া উচিত। তুমি পারতে। তোমার মনের জোর আছে।

—আর তুমি নিজে হলে ?

হ্যাঁ দুটি কুঁচকে ওঠে ওর। বোধকরি কিছু একটা সন্দেহ আগে তার মনে।
একটু থুঁকে আসে সামনের দিকে। বলে, কী বলতে চাইছ বল তো ?

অতসী দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁটটা কামড়াতেও সাহস পায় না। যদি বুকে
কেনে ! কিন্তু বোঝাতেই চা চাইছে। বলতেই তো চায়। সে অস্ত্রই তো এই দীর্ঘ
তির্ধকপহার ভূমিকা।

—ঘু মীন, আমার লিউকেমিয়া হয়েছে ?

পরাসরি প্রশ্ন ! কিন্তু পরাসরি জবাবটা জোগালো না অতসীর মুখে। বলে,
প্রথম দিকে সেই রকমই আশঙ্কা করেছিলেন ডাক্তারবাবু। সেজ্ঞাই হুনাল
তোমার ব্লাড-স্যাম্পল নিয়ে আসে। আর সেই উৎকট ধারণার বশবর্তী হয়েই
ঐ ক্যান্সারিকর তোমাকে পাঁচশ টাকা মাহিনায় বহাল করে। ঐ ইন্সিওরেন্সটা
করায় !

ঘরান ধীরে ধীরে নেমে পড়ে ডবল্-বেড খাট থেকে। পায়ে পায়ে এগিয়ে
যায় কক্ষ আনলার কাছে। পাল্লা দুটো খুলে দেয়। পড়ন্ত নৃষের এক ঝলক
আলো এসে বাঁপিয়ে পড়ল ওর বুকে। হমকা একটা হাওয়া। দূরে বড় রাস্তা
দিকে একটা মিনি-বাস তীব্র শব্দে ঘানটাকে সচকিত করে উদ্ভ্রাসে
কোথায় ছুটেছে—যেন হাড়িকাঠ থেকে পালাতে চাইছে একটা বলির পাঠা।
সামনে-বাড়ির ছাদে একটা অল্পবয়সী বউ—শ্যামলা বউ তার, পরনে শান্তিপু্রে
জাল-লাদা ডুরে—পরখ করে দেখছে, ভিজে কাপড়গুলো শুকিয়েছে কিনা। ছাদে
একটা খালি-মায় হাফপ্যান্ট পরা ছেলে—ঐ নতুন বউয়ের 'ছাওয়া' নাকি ?—ঘুড়ি
ওড়াচ্ছে : তো কাটা ! এই যুহুর্তেই পংপং করে উড়ছিল ওর এক-ভেল
পখিয়ালটা। তাখ্, না তাখ্, এসে হাজির হল ঐ হো-ভেল পেট-কাটা।
পখিয়ালটা গোং খেয়েছিল ঠিক জময়েই—হো-ভেলটাকে তল্-তান নিতে দেবে
না ! সে ছেড়ে খেলতে চায়, কিন্তু হো-ভেল-এ বোধহয় কাঁচগুঁড়োর নয়া মাসা—
যে টেনে খেলাই পছন্দ করল। পখিয়ালের ডলপেট নিয়ে চড়চড় করে
উঠে গেল যুহুর্তমধ্যে। আগের খণ্ডযুহুর্তে দখিনা বাতাসে যে পংপং করে উড়ছিল,
এখন সে ডানে-বায়ে হেলতে ছলতে নামছে অনিবার্য আকর্ষণে, মা-পৃথিবীর দিকে।
যেন মাতল। গলি দিয়ে একপাল অধউল্লস ছেনে লগি হাতে ছুটেছে কাটা
ঘুড়িটা ধরতে।

রজন এক দৃষ্টে দেখছিল ঘুড়ির গ্যাচ। অথবা কিছুই দেখতে পান্ছিল না। অতসী নিচুপ অপেক্ষা করছিল খাটে বসে। আকাশের ঘুড়ি সে দেখতে পান্ছিল না, কিন্তু দেখতে পেল রজনের পিছন কেয়ার ভলিটা। কাটা ঘুড়ির যতো টলতে টলতে সে এগিয়ে এসে বসে পড়ল একটা চেয়ারে। স্নান হামল। বলসে, আশ্চর্য! এটা তো আমার আশকাই হয়নি কোনদিন।

—হওয়ার কথাও তো নয়। তেমন ইঙ্গিত তো তোমাকে কেউ দেয়নি তখন!

—‘তখন’কার কথা আমি বলছি না অতসী। বলছি ‘এখন’কার কথা।

অতসী জানতে চায় না, তার মানে কী?

—করালীকঙ্কর লোকটাকে আমি চিনি। লিউকেমিয়ার পজেটিভ রিপোর্ট হাতে না পেলে—হু-তিনজনকে দিয়ে তেরিকাই না করে—সে এই বোকান্নি করতে না। এখন অনেক—অনেক কিছু বুঝতে পারছি...

না, কাঁদবে না অতসী। জেনী কাঁদেনি, অল কাঁদেনি! হে ঈশ্বর! কামার যদি ভেঙে পড়তে হয়, তবে যেন দুজনে একলগেই ভেঙে পড়ে। রজন এখনো শক্ত—এখন অতসীর ভেঙে পড়া চলবে না।

—কেন তুমি ট্রেনের কামরার ঐ সিঁদাভটা নিয়েছিলে। জামসেদপুরে না গিয়ে হঠাৎ মাদুডিহি যাবার ইচ্ছে কেন হল তোমার!... শুধু করুণা করে, আমাকে জন্মের শোধ আনন্দ দিতে সেদিন রাতে—

খাটের উপর উবুড় হয়ে পড়ে অতসী। অন্ধুটে বলে, না! না! বিশ্বাস কর!

—খামো। তোমরা সবাই সমান। শুধু করুণাই করেছ আমাকে! তিকন দিয়েছ।

হুহাতে মুখটা ঢাকা দেয় রজন। কাঁদেনি কিন্তু সে।

অতসী কিন্তু পারল না। ওর পিঠটা শুধু ফুলে ফুলে উঠছে। অনেক—অনেকক্ষণ পরে শুনতে পেল, যেন বহু দূর থেকে ছেলোটো জানতে চাইছে, কতদিন সেরাদ আছে আমার? তুমি কিছু জান?

অতসী না-য়ের ভলিতে মাথাটা নাড়ে।

রজন মুখ থেকে হাতটা সরিয়ে নেয়। বলে, ‘সরি’ বলব না, ওটা বলা বায়ণ। কিন্তু স্বীকার করছি—আমি অজ্ঞার বলেছি অতসী! গোটা রামায়ণটাই তো-অম্ম নিয়েছে করুণার উৎসমুখে। না...তুমি করুণা করেই শুধু ভালবাসনি আমাকে। ‘মা নিবাধঃ’ শ্লোকটার শেষ শব্দটা যেন কাঁ ছিল অতসী?

জকে শক্ত হতে হবে। আঁচলে চোখ মুছে খাটের উপর উঠে বলে এতক্ষণে।
কল, একটু দুধ গরম করে দেব ? খাবে ?

এতক্ষণে হাসল। বললে, তাতে আমার নির্দিষ্ট দাতব্য' বারো ঘণ্টার মেয়াদটা
কি এক সেকেন্ডও বাড়বে ?

অতসী জবাব দিতে পারে না—না, বাড়বে না। অংখ্যাটা যদি তাই হয়, তবে
তাই থাকবে।

—তার চেয়ে দুধটা তুমিই গরম করে খাও অতসী। তুমিই ভেঙে পড়েছ।
এই দেখ, আমি তো পড়িনি—‘আমি মৃত্যু চেয়ে বড়। এই শেষ কথা বলে, যাব
আমি চলে।’

অতসী কি উঠে গিয়ে ওর হাতটা ধরবে ? মাথার আলতো করে হাত বুলাবে ?

—তাছাড়া আমার এ দেহের লক্ষকোটি জীবকোষ যখন ঐ নির্দিষ্ট মেয়াদ
অন্তে শুরু হয়ে যাবে, তখনো তো আমি মরব না। আমার একটি জীবকোষ যে
নিরাপদে পচ্ছিত রাখা আছে তোমার দেহের সেক ডিপজিট-ভন্টে। ঐ এক
গ্রাম ছুঁতে তাকে বাঁচিয়ে রাখ অতসী ! ওটাই তো বেঁচে থাকবে ‘আমি’ হয়ে।
আমার ‘আমি’।

অতসী খাট থেকে নেমে পড়ে। বুক থেকে তার আঁচল খসে পড়েছে — খেয়াল
নেই ; চুল তার আলুখালু—জক্ষেপ নেই। ওর দিকে এক পা অগ্রসর হতেই বা
হাত তুলে পাগল কবিতা বাধা দিয়ে বললে, “May there be no moaning
of the bar, when I put out to sea.”

অতসী ধমকে গেল। সচেতন হল। আঁচলটা টেনে নিল বুকে। এলো-
খোঁপাটা জড়িয়ে নিল মাথায়। রক্তন একদৃষ্টে তাকিয়েছিল ঐ খোলা জানলা
দিয়ে, গরাদ-ঘেরা একমুঠো আকাশের দিকে, যেখানে আর একটা একতেলের
ধরতাই দিচ্ছে খিলখিল-হাসি বৌদি তার বাচ্চা ছেঁড়কে। এ ঘরের এই নিদারুণ
আগাতে পাশের বাড়িতে কোন পরিবর্তন হয়নি। ছনিয়া আছে বেদাগ।
হঠাৎ এপাশে ফিরে রক্তন বললে, কাগজ-কলম আছে অতসী ? আমার...আমার
একটা কবিতা লিখতে ইচ্ছে করছে। এখনই, এই মুহূর্তেই।

অতসী নিঃশব্দে উঠে গেল। লেটার-প্যাড আর কলমটা বাড়িয়ে ধরে।

—না, চেয়ার-টেবিল নয়। আমি শুয়ে শুয়ে লিখি।

বাগিসটা বুকের তলার টেনে নিয়ে উবুড় হয়ে শুয়ে পড়ে। কাগজ-কলম টেনে
লিখে লিখে শুক করবে, হঠাৎ তার নজরে পড়ল অতসী এসে দাঁড়িয়েছে খাটের
পাশে। তার হাতে একটা জলের গ্লাস আর কী ছোটো ট্যাবলেট।

—কী গুটা ?

—ওষুধ । খেয়ে নাও ।

কীসের ঔষধ, কেন খাবে, জানতে চাইল না কবি । হাত বাড়িয়ে ট্যাবলেট ছুটো নিয়ে মুখে পুরে দেয় । চক্‌চক্‌ করে জলটা খেয়ে কেলে । বলমের খাপটা খুলে অতসীর দিকে বা-হাতটা বাড়িয়ে বলে, প্রীজ ডোন্ট ভিস্টার্ব মি কর হাফ-অ্যান আওয়ার ।

ঠিক কাঁটার কাঁটার পাঁচটার সময় সন্ধ্যা দরজার কড়া নাড়ার শব্দ । ঘুমের ওষুধের বল্যাণে ক্লান্ত কবি তার অসমাপ্ত কবিতার উপর মাথা রেখে অঘোর ঘুমে চলে পড়েছে । এক পক্ষে এ ভালই হল । কুনালের সঙ্গে অনেক অনেকগুলো বোঝাপড়া বাকি আছে তার । সেগুলো রক্তনের উপস্থিতিতে না হাওয়াই বাহনীয় । প্রথম কথা—কোন অধিকারে সে অতসীর গোপন কথা রক্তনকে জানালো । দ্বিতীয়ত, ভাড়া মিথ্যা কথাই বা মিথল কেন ? আর সবচেয়ে বড় কথা—কোন নীতিবোধের দোহাই পেড়ে কুনাল ডাক্তার একটা নিশ্চিত যত্ন-পথযাত্রীর হাঁসওরেন্স পলিমিতে ডাক্তার হিসাবে স্বাক্ষর দিল ।

দরজা খুলেই কিন্তু ভূত দেখেল যেন ।

খোলা দরজার ও-প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে—কুনাল নয়, বন্দনা ।

—ছোটখুকি ! তুই ?

দাঁড়ির বৃকে কাঁপিয়ে পড়ে বন্দনা বলে, হ্যাঁ আমিই ! এখন মার আর ধর, আমি কিছুটা বলব না ।

অতসীর অশ্রুর উৎস তাহলে এখনও নিঃশেষিত হয়নি ? ছোটবোনের অশ্রুসিক্ত মুখটা দুহাতে তুলে ধরে বললে, অ্যাক্টুয়ালি মনে পড়ল মুখগুড়ি ।

—হ্যাঁ পড়ল । অমন একটা কথা শুনেও কি পোড়া মুখটা লুকিয়ে রাখব ?

—‘অমন একটা কথা’ মানে ? কী কথা ?

—যে কথাটা তুমি ওকে বার্ষণ করেছিলে আমাকে জানাতে ।

এতক্ষণে নজর হল—ছোটখুকির পিছনে দাঁড়িয়ে আছে কুনাল । গরুড় মূদ্রায় । বললে, আসামি হাজির । শান্তি নিতে । বল, কী শান্তি বিধান করলে, দেবী ?

অতসী আঁচল দিয়ে চোখ মুছে শুধু বন্দনাকেই বললে, আর, ভিতরে আর ।

কানের সঙ্গে মাথার মতো বিনা-আহ্বানে কুনালও ভিতরে এল । সন্ধ্যা দরজার খিল দিতে দিতে একটা স্বগতোক্তি করে : বিরাগমনের জামাই আহর ।

অতসী অবাক দেয় না । বন্দনা জানতে চায়, উনি আসেননি ? রক্তনবাব ?

—হ্যাঁ এসেছেন। ঘুমাচ্ছেন।

কুনাল যথার্থীতি কোড়ন কাটে, নাড়িটা বেখুঁতে হচ্ছে। এমন অবেলার ঘুম ? অতসী বন্দনার দিকে ফিরে বলে, ঘন্টাখানেক আগে ওকে জানাতে বাধ্য হয়েছি, অস্থখটা কী। ও কবিতা লিখতে চাইল। কাগজ কলমের সঙ্গে দুটো কম্পোজও দিয়েছি ওকে।

কুনাল পুনরায় স্বপ্নতোড়ি করে, কান প্রশমিত হয় কম্পোজে ! ভাল ওষুধ। আপাদমস্তক জালা করে ওঠে অতসীর। কিন্তু এবারেও সে আত্মসংবরণ করে। বন্দনার সামনে ওকে অপমান করতে মন সরে না। বিশেষ, এটা তারই বাড়ি। কুনাল এ বাড়ির জামাই। আর কথাটাও তো ভুল নয়—স্বাগমন না হলেও, জামাই হিসাবে এই প্রথম সে এল এ বাড়িতে।

কুনাল নিজেই গোটানো মাদুরটা বারান্দার পেতে নিল। জুতো-মোজা খুলে পা গুটিয়ে বসে আরাম করে একটা সিগারেট ধরায়। বলে, অতসী ! আসামীর সেন্স-ডিফেন্স না শুনেই কিন্তু ফাঁসির দ্বার দিচ্ছ তুমি।

এতক্ষণে অতসী ওর সঙ্গে সরাসরি, কথা বলে। বললে, না। তোমার অবাবদ্বিহিটা আগে শুনতে চাই। কেন তুমি...

—থাক থাক। আমার প্রাথমিক এজাহারটা শোনার পরেই না হয় চার্জ-শীটটা ক্রেম কর—

বন্দনাও বসে পড়ে। অক্ষুটে দ্বিধা বলে, ওর সত্যিই দোষ নেই রে !

বন্দনা কতটুকু জানে ? অতসী বেওয়ালে ঠেসান দিয়ে উদ্দাস দৃষ্টি মেলে বলে থাকে উদ্দাস, কিন্তু উৎকর্ষ। কুনালের বক্তব্যটা আগে শোনা যাক।

—শোন বন্দনা। তোমাকেই বলছি। অনেক-অনেক দিন আগে তোমার দ্বিধির সঙ্গে ‘এথিক্স’ বিষয়ে আমার একটা অ্যাকাডেমিক ডিস্কাশান হয়েছিল। আমার পিতৃশত্রু পরম পূজনীয় করালোকিকর হাত সাক্ষাই করে একটা সাতহাজার টাকার তমস্তককে বিশ হাজারে রূপান্তরিত করেছিলেন। কেমন করে ঐ অলৌকিক কাণ্ডটা ঘটেছিল আমি জানি না। বোধকরি ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছায় ! এ ভাবে ইচ্ছাময়ীর আশীর্বাদে তিনি সাদা জলকে হামেহাল সব্বতে রূপান্তরিত করতে পারেন, তা তুমি জান। আমি তোমার দ্বিধিকে প্রশ্ন করেছিলুম, আমি যদি ‘কন্টকেটনৈব কন্টকম্’ পদ্ধতিতে প্রতিশোধ নিই, তাতে তাঁর নৈতিক সমর্থন আছে কি না। তিনি জানিয়েছিলেন—সমর্থন নেই ! সেটা হবে অধর্ম ! আমি মনে না নিলেও মেনে নিয়োঁছিলুম—কারণ সে আসলে আমি তাঁর করুণার প্রত্যাশী ছিলাম। তিনি অকরুণ হয়ে তা সব্বদেও দূরে সরে গেলেন—তাও তোমার অজানা

নয়। তারপর অনেক-অনেক দিন কেটে গেছে। হঠাৎ সন্ধ্যাতি এল একটা।
 সন্ধ্যোগ। এবার আমি সে সন্ধ্যোগটার সন্ধ্যাবহার করেছি। লোকটা আমার
 বাড়িতে এল একটা বিচিত্র প্রস্তাব নিয়ে। একটি লম্বা লিউকেমিয়া রোগীর
 ব্লাড-কাউন্ট করে বাংলা দিতে হবে, তার ঐ শিরের অসাধ্য ব্যামোটা হয়েছে
 কিনা। এমনটা তো হতেই পারে। কিন্তু লোকটা আরও জানতে চাইল—যদি
পজেটিভ রিপোর্ট পাই, তাহলে আমাকে বলে দিতে হবে রোগী ক-মাস বাচবে।
 কেন যে বাগু? এতটা অ্যাকুয়েট হিসাবের কী দরকার? আমি যখন মনে মনে
 ধাঁধাটা মলত করছি, তখন একই নিঃশ্বাসে অর্থপিশাচটা জানতে চাইল আমি
 এল, আই, সি-র এন্‌লিস্টেড ডাক্তার কি না। ধাঁধার উত্তরটা বুঝে কেললুম।
 প্রথমটা আমি ভেবোছিলুম, কোনও উত্তরাধিকার বা উইল ব্যতীত ব্যাপার; কিংবা
 ও জানতে চায়—কোনও অধ্যক্ষের বক্তৃতা কতদিন শোষণ করা চলবে। কিন্তু এল,
 আই, সি সংক্রান্ত প্রশ্নটা পেশ করায় আমার আর কোনও সন্দেহ রইল না।
 পরে দেখা গেল—রুগী হচ্ছে রক্তন চক্রান্ত। ঠিক হ্যাঁ। রুগীর পরিচয়ে আমার
 কী দরকার? কিন্তু না। অচিরেই জানতে পারলুম, ঐ রক্তন চক্রবর্তী এমন
 একজন মহিলা অস্ত্র রঞ্জিত করা ছলেন, যে রক্তের ধারে কাছে ঘেঁষতে পারেনি
 কুনাল ডাক্তার। আমি ব্লাড-সাম্পল নিয়ে এলুম। বারে বারে পরীক্ষা করে
 দেখলুম, সে নির্দোষ। তার লিউকেমিয়া হয়নি। কিছুদিন চেঁচিয়ে থাকলে
 —কলকাতার এই দূষিত আবহাওয়া থেকে মুক্তি পেয়ে কোন খোলামেলা
 আবহাওয়ার...

অতসী বাধা দিয়ে বলে, সু মুন, তুমি ওর নেগেটিভ রিপোর্ট পেরেছিলে?

বাহ্যাবোধে কুনাল সে প্রশ্নের জবাব না দিয়ে এক নিঃশ্বাসে বলে চলে,

—কিন্তু বাড়ির দলিল আর বন্ধকী তমসুকটা এই মওকায় আমাকে হাতাতে
 হবে। এ ছাড়া অস্বীকার করব না—যে লোকটা হাত সাক্ষাই করে এতদিন
 আমার রক্ত চুষেছে তার উপর হাতসাক্ষাই করেই প্রতিশোধ নেবার একটা
 উদগ্র বাসনা ছিল আমার। তৃতীয়ত, বুড়ো ভামটার ঘাড় ভেঙে যদি ঐ বেকার
 পাগল কবিটার একটা উপকার করা যায়—সেটাই বা মন্দ কা? একটা
 ‘অ্যাকিউট কেস অব লিউকেমিয়ার’ লাইড নিয়ে পি, এন্ড ০০৩, রক্তন চক্রবর্তীর
 নামে চিহ্নিত করে রিপোর্ট তৈরী করলুম। খামের উপরেও লিখলুম রক্তনের
 নাম। বড়শির মাথায় ঐ টোপটা গেঁথে দেয়ালে বন্ধ করে আমি ঘাপটি মেরে
 অপেক্ষা করতে থাকি। রাত দশটার ডিসপেন্সারি বন্ধ হবার মুখে পিশাচটা
 এস। এসে হাঁ করল। আমি রক্তনের নামটুকু মুছে কেলে ওর মুখ-গহ্বরকে

সাইডটা ফেলে দিলুম। ও কপাৎ করে গিলে ফেলল...শেরানে শেরানে কোলাহুলি! ছুজনেই জানি, পার্টনার ইন ক্রাইম সুযোগ পেলেই ডব্লু-ক্রশ করবে। ছুজনেই সতর্ক। পরস্পরের মৃত্যুবান নিজের আন্তর্য্যারে রাখতে চাইছি। ফলে করালী প্রথমেই সেই সাইডটা নিয়ে আর কোন একজন অথবা একাধিক স্পেশালিস্টকে দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে নিশ্চিত হয়ে নিল। সকলের প্রগ্নসিস্টাই হবহ মিলে গেল। এ রোগী তিন-চার মাসের মধ্যে শিঙেফুঁকে ন মনিকে পাইয়ে দেবে নগদ বিশ হাজার টাকা। হ্যা, লোভটা বাড়তে বাড়তে অকটা ঐ বিশ হাজারেই উঠেছিল। করালী বহান্নতা দেখিয়ে রক্তনের গবোখারিণীর প্রতি করুণা প্রকাশ করল। পাঁচশ টাকা মাস মাহিনার রক্তনকে বহাল করল ম্যানেজার পদে। আর নেমকহারাম ছোকরা সেই সাঁওতালী গাঁয়ে গিয়ে দিনকে দিন তাগড়াই কৌৎকা হয়ে উঠতে শুরু করল! বেচারি করালীকিহর! সে অগ্নেও ভাবেনি, ছেলোটো বহাল তবিরতে বছরের পর বছর টিকে থাকবে, প্রৌঢ় হবে, বৃদ্ধ হবে, তবু মরবে না!.....একী? একী? অতসীর কী হল?

বন্দনা তার দিদির এলিয়ে পড়া দেহটা জড়িয়ে ধরে স্বামীকে ধমক দেয়, বদ-রসিকতা বহু রেখে একটু ওষুধ মধু দাও না বাপু!

—কিছু দরকার নেই! তোমার দিদি আনন্দে হার্টকেল করবে না। বাকিটা শোন : বুঝলে বন্দনা! তোমার দিদির বিশ্বাস—তিনি ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছেন শুধু পয়ের উপকার করতে! পয়ের জন্ত প্রাণ দিতে। তাই তাঁকে মিথ্যার কুহকে প্রলুব্ধ করেছিলুম একটি মৃত্যুপথযাত্রীর শেষের কটা দিন মধুর রসে ভরে দিতে। তার মানে আর এক জাতের টোপ। তোমার দিদিও এসেছিলেন আমার ল্যাবরেটোরিতে। সেদিনও আমি টোপ নিয়ে বলেছিলুম ছিপ হাতে। তিনি হাঁ করলেন; আমি তাঁর মুখবিরে ফেলে দিলুম পরোপকারীর ভূমিকার অবতীর্ণ হবার টোপটা। তিনিও কপাৎ করে গিলে ফেললেন!...কিন্তু ছিপে খেলিয়ে তোলা বড় সহজ নয়। ঐ পাগল কবিটা ব্যাগড়বাই শুরু করল। তোমার দিদির সঙ্গে তার কী নিয়ে মন কষাকষি বুঝে উঠতে পারি না—কিন্তু খবর পেলুম—ছুজনের পত্রালাপ বহু। মুখ দেখাদেখি নেই। সাঁওতালী গ্রামটার নামটাও চাই জানি না। অগত্যা ঠিকানা সংগ্রহের জন্ত গৌড়াতে হল বাঙাইআটি। লোক পাঠিয়ে রীতিমতো প্রোগ্রামী পরোয়ানার সাহায্যে আসামীকে ধরে এনেছি। আমার এজাহারের এখানেই সমাপ্তি। শুধু একটা করুণ অধ্যায় নিবেদন করার আছে। দিন-তিনেক আগে অল্লাহু গ্রহাচার্য-মশাই আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বলেন, বাবাজী, আমি আর কিছু চাই না—শুধু বুঝিয়ে বল দিকিন্, তুমি হাত-

দাঁকাইটা করলে কখন ? আমি বিনয়ে বসলিও হয়ে বলেছিলুম, এটা কী বলছেন কগালীকাকা ! হি হি হি । হাতগাফাই কেন হবে ? ডাক্তার মাঝেই তো কুল করে । আমি একা তো নই । তিন তিনজন ডাক্তার একই ভুল কেন করবে বলুন ? এ অলৌকিক ঘটনার একমাত্র ব্যাখ্যা—বঘটন আজও ঘটে । আপনি-আমি তো নিমিত্ত মাত্র । এ শুধু ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা ।

অতমী আর বন্দনা দুজনেই বিলম্বিত করে হেসে গুঠে ।

কুনাল হাত দুটি ঘোড় করে বলে, আমার এম্বাহার শেষ হয়েছে হুজুরাহন । এবার বলুন, কী শাস্তি আমার প্রাপ্য ?

অতমী হাতপাখার বাঁট দিয়ে ওর পিঠে এক ঘা বসিয়ে দিয়ে বলে, এই শাস্তি । এবার বল তো ডাক্তার-মাছেব—ঐ ঘুরন্ত মাহুটটাকে এখনই টেনে তোলো কি ঠিক হবে ।

কুনাল এক বিষয় জিব বার করে বসলে, সর্বনাশ ! ককণো নয় । মাঝরাতে কাম-পোজের কগীর ঘুম ভাঙতে হবে—ওর কানে কানে শোনাতে হবে কাম-মোহিতের গুহ-বার্তা । ধীরে ধীরে, নইয়ে, নইয়ে-বসিয়ে-বসিয়ে । বজনের ঐ মৃত্যুর সঙ্গে পালাকবার কবিতাটা এখনও শেষ হয়নি তো । হঠাৎ এই দুঃসংবাদটা শুনে অসমাপ্ত কবিতার দুঃখে বজনে হার্টকেল করতে পারে ।

অতমীর বার বারে চোখে জল আনছে । দুঃসই অবাব জোগাচ্ছে না তার মুখে । বন্দনা তার দিহিকে মদ্য দিতে এগিয়ে আসে । বলে, ‘বজনে’ কী ? তোমার বড় ভায়রা নয় ? ‘বড়দা’ বলবে ।

—মে হালুয়া । অতমী আমার চেয়ে পাঁচ বছরের ছোট । ও ছোকরা আবার অতমীর চেয়ে ..

—ববরদার । দিহির নাম ধরে ডাকবার হক আছে তোমার । আমি কিছু মনে করব না । যেহেতু এককালে তুমি তার সঙ্গে প্রেম-দ্রোম করেছ, কিন্তু আমাইবাবুকে ককণো ‘ছোকরা ছোকরা’ বলবে না বলছি ।

এবার অতমীর হাতের তালপাখার বাঁড়টা পড়ল তার ছোটখুকির পিঠে ।

—